অন্য কোন খানে

॥ অন্য কোন খানে ॥

সৌরীন সেন

প্রথম প্রকাশ : মহালয়া ১৩৬৬

প্রকাশ করেছেন :
সুধীর মুখার্জী
রাইটার্স সিণ্ডিকেট
৮৭, ধর্মতলা ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১৩

ছেপেছেন :
জি. পি. সরাফ্
দি অশোক প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
১৭।১, বিন্দু পালিত লেন
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদপট এঁকেছেন :
বিভূতি সেনগুপ্ত
৭২।১, কলেজ ষ্ট্রীট
কলিকাতা

বেঁধেছেন :
ন্যাশোনাল কমার্শিয়াল সিণ্ডিকেট
৯৩।১ এম বৈঠকখানা রোড
কলিকাতা

মূল্য : পাঁচ টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা

নাটকীয়ভাবে কুণাল সেনের সঙ্গে আমার পরিচয়। মরসুমের সময়। ম্যাল রোড জমজমাট। একটা বেঞ্চ দখল ক'রে কোণা মেরে ব'সে আছি। পাশে দুই জর্মন ভদ্রলোক নিজেদের মধ্যে দুর্বোধ ভাষায় হাসাহাসি করছেন। ধূসর দিন। কুয়াসায় সম্পূর্ণ ঢাকা পড়ে আছে লেবঙ্গ পার্ক।

হঠাৎ অপরিচিত একটি কণ্ঠস্বরে চমকে উঠলাম। দুরন্ত এক প্রতিবাদের ভঙ্গিতে দুই জর্মন ভদ্রলোকের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সুদর্শন এক বাঙ্গালী যুবক। অনর্গল হুড়হুড় ক'রে জর্মন ভাষায় তাদেরকে যেন শাসাচ্ছেন। এক বর্ণও মাথাতে নিল না, শুধু বুঝলাম একটা অপ্রীতিকর কিছু ঘটতে যাচ্ছে।

লাফিয়ে উঠলাম একরকম। পথচারী কয়েকজন দাঁড়িয়ে গেছেন। বাঙ্গালী তরুণের দিকে হাঁ হাঁ ক'রে ছুটে গেলাম। কিন্তু তিনি ভ্রূক্ষেপেও আনলেন না আমাকে। দুই চোখ রক্তবর্ণ বুকটা উঠছে—পড়ছে।

ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরেজীতে একজন জর্মন জানালেন আমাকে: ভারতীয়দের সম্পর্কে আমরা বিরুদ্ধ-সমালোচনা কিছু করিনি। হাতী, সাপ-কোপ আর ম্যালেরিয়া নিয়ে কথা বলেছি শুধু!

—এক্কেরে সানচুর কইর‍্যা ফ্যালামু। আমাকে একরকম সরিয়ে দিয়ে বাঙ্গালী তরুণ আবার রুখে যেতে চাইলেন।

অনেক কষ্টে এই তরুণকে আমি সেদিন সংযত করেছিলাম।

এই আমার প্রথম আলাপ কুণাল সেনের সঙ্গে। দীর্ঘ গড়ন। মাথার চুল কোঁকড়ানো। কপালে সামান্য কয়েকটি বসন্তের দাগ। কণ্ঠস্বর শ্রুতিমধুর। কথায় কথা ওঠে। বললাম: উঠেছেন কোথায়?

—মাউণ্ট এভারেস্ট-এ। আপনি কাল এসেছেন দার্জিলিং-এ আমি জানি। পাশের কামরাতেই তো আছেন আপনি।

—হ্যাঁ, বারো নম্বরে।

'করেন কি' কথাটা ভদ্রভাষায় জানতে চেয়েছি। হেসে বলেছেন: মিস্ত্রী।

—কিসের ?

—এক্স-রে মেশিনের।

তারপর একদিন নয়, দুদিন নয়—প্রত্যহ। দুরন্ত জমে গেল ভদ্রলোকের সঙ্গে। ম্যাল রোড আর ক্যালকাটা রোডে ঘুরতে ঘুরতে, জলা-পাহাড়ে পাক খেতে খেতে কুণাল সেন তার জার্মানি ভ্রমণের কাহিনী বর্ণনা ক'রেছেন। অনেকের ঠোঁটে ইয়োরোপ ভ্রমণের বিস্তর কাহিনী শুনেছি, কিন্তু কুণাল সেনের অভিজ্ঞতা আমাকে স্পর্শ করে। ওর দৃষ্টিকোণ আমাকে আকৃষ্ট করে। বাচনভঙ্গি সম্পূর্ণ মুগ্ধ করে আমাকে।

হেসে হেসে বললেন সেদিন: লিখতে জানলে আমার অভিজ্ঞতার কথা কাগজে লিখে জানাতাম। আপনার তো স্তার আসে-টাসে! লিখুন না।

কথা রেখেছি। কুণাল সেনের অনুরোধে কিছু কিছু অংশ বাদ দিতে হলো। বাকি সব কিছুই আজ আমি প্রকাশ ক'রে দিলাম।

সৌরীন সেন

২৯।১, পণ্ডিতিয়া রোড।
কলিকাতা-২৯

উৎসর্গ

শ্রীজগদীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

শ্রীমতী মণিকা চক্রবর্ত্তী

॥ এই লেখকের অন্য বই ॥

চেনা মুখ

●আলবেয়ার কাম্যু, কাম্যু কেমন লাগে আপনার? কৌতূহলের পাতলা হাসির রেশ ভেঙে পড়ে ঠোঁটের কোণে। কোলের বাতিটি নিভিয়ে প্রশ্ন ক'রলেন সহযাত্রী।

কিছুমাত্র অস্বস্তি নয়। অপ্রস্তুত-ও হইনি কণামাত্র। চোরের গরু চুরি করিনি, ভয় কিসের? সহজ সরল স্বীকৃতি, তবু চেষ্টাকৃত সঙ্কোচের ভাণ আমার কণ্ঠে। ব'ললাম ঃ দেখুন নোবেল পুরস্কার পাবার আগে কাম্যুর নাম কখনও শুনিনি। আজ পর্যন্ত তাঁর কোনও বই আমার পড়া হয়নি।

সুন্দর মুখশ্রীতে খুশির হাসি ছড়িয়ে পড়ে। কিছুটা ঝুঁকে প'ড়ে বলেন ঃ আপনি খুব সুন্দর কথা ব'লতে পারেন। নোবেল লরিয়েট হবার আগে কাম্যুর নাম শোনেননি। বেশ বলেছেন কথাটা। সামান্য একটির ইংরেজি তর্জমা ছাড়া আমারও কাম্যুর কিছু পড়া নেই।

গণনায় আমার খুব একটা ভুল হয়নি। তবে সঠিক আন্দাজ ক'রতে না পারলেও বর্মা-শেল্ বা স্টান্‌ভ্যাকের ন'কর্ত্তা ইনি নন, এ কথা আমি ব'লবোই। রুরকেল্লার ব্লাষ্ট ফার্নেসের গড়ন দেবার লোকও নন ইনি। ট্যুরিষ্ট? উহুঁ! এমন কি বোহিমিয়ান নরেন মিত্তিরের অতি আধুনিক কোনও ইংরিজি সুলভ সংস্করণ মনে করবারও যথেষ্ট কারণ নেই।

কথা অনেক হ'য়েছে। নানা প্রসঙ্গ-ই উঠেছে। ধারের আসনটি আমি স্বেচ্ছায় ছেড়ে দেওয়াতে খুশী হ'য়েছেন যতটা লজ্জিত হ'য়েছেন তার অনেক বেশী।

আমি অবাক হ'য়েছি ওঁকে কবিতা প'ড়তে দেখে। আমার আঁটো-মাপের স্বল্প পরিধির জীবনে কোনও সাহেবকে আমি কবিতা প'ড়তে দেখিনি। ক্লাইভ ষ্ট্রীটের রাঙামূলো বা রেলওয়ের সবুজ নিশানওয়ালা ছাড়া তেমন সাহেব আর আমি দেখেছি কোথায়?

যাত্রীদের দু'ভাগে ভাগ করা হ'য়েছে। দুটি ট্যুরিস্ট কামরা। আর দুটি প্রথম শ্রেণী। ট্যুরিস্ট কামরায় ঘেঁষাঘেঁষি, জায়গা কম। পহেলা নম্বরে শুধু হাত পা খেলিয়ে বসবার নয়, পিঠের খিলেন আলগা ক'রলে টানটান হ'য়ে শুয়েও পড়া যায় অক্লেশে।

'লাইফ্-জ্যাকেট্' নিয়ে সুন্দরী এয়ার হোস্টেসের কসরৎ শেষ হ'য়েছে বহু আগেই। কিছুটা যেন ঝিম ধ'রেছে চারদিকে। আমার ঘড়িতে রাত আট-টা। বাইরে জমাট অন্ধকার। সান্টাক্রুজ থেকে বেইরুট। মধ্যে কোনও জায়গাতেই থামা নেই।

মাটি থেকে আঠারো হাজার ফিট ওপর দিয়ে ছুটে চ'লেছি অন্ধকার আকাশের বুক চিরে। বাইরের ঠাণ্ডা তাপমান যন্ত্রের পাঁচ ডিগ্রী নীচে।

সিটে ব'সে এত কিছু বোঝবার কিছুমাত্র উপায় নেই। এক হাজার, আট হাজার বা আঠারো হাজারের পার্থক্য বোঝা ভার। গ্রাউণ্ড স্পীড্ আড়াই'শো মাইল, শুধু শুনলামই। অনুভব করা গেল না কিছুই।

এমন কি শীত সম্পর্কেও হতাশ হ'তে হ'লো। কিছুমাত্র ভুল শুনিনি। তাপমান যন্ত্রের পাঁচ ডিগ্রীর নীচের শীত কতটা কন্ কন্ করে?

এয়ার হোস্টেস পানীয় বিতরণ ক'রে চ'লেছেন। প্রফেশনাল হাসি টেনে যাত্রীদের হাতে তুলে ধ'রছেন স্ফটিকের ছোট বড় পাত্রাধার। একে লোভনীয় দুর্মূল্য পানীয়, তারপর সুন্দরীর অতি সহজ আপ্যায়ন। প্রত্যাখ্যানের প্রশ্নই ওঠে না। শুধু তাই নয়, পানীয় বা সিগারেটের আলাদা দাম কবুল করবার দরকার হয় না এখানে। ভদ্রতা বাঁচিয়ে যে কোনও পরিমান পান করা চলে অক্লেশে।

আমার পাশের সহযাত্রী ভদ্রলোক এ ব্যাপারে কেমন যেন মৌন রইলেন। নির্লিপ্ত হেসে শুধু এয়ার হোস্টেসকে ধন্যবাদ জানান।

হাঁ হাঁ ক'রে উঠলাম আমি। বললাম: কিছু একটা নিন।

পূর্বের নির্লিপ্ত হাসি টেনে বললেন ঃ ধন্যবাদ!

--নরম কিছু একটা দিক আপনাকে!

--কিছু না, কিছু না। মাথা নেড়ে এড়িয়ে গেলেন ভদ্রলোক।

দমে গেলাম। বড় একটা চুম্বক দিয়ে লাট্টুর মত ঝিম ধ'রে ব'সে রইলাম।

পশ্চিমের কায়দা কানুন আমার কিছুমাত্র সড়গড় নয়। কিসে যে পানের থেকে চূন খসে, আমি জানি না। শুনেছি অপরিচিত কোনও পুরুষ নাচের উঠোনে কোনও সুন্দরীর কটিতট বেষ্টন ক'রে যদি নাচতে চায়, তবে সে নাকি আপত্তি করে না। হাটে-বাজারে একগাদা লোকের মাঝখানে দীর্ঘস্থায়ী চুম্বন নেহাৎই নাকি ডালভাত। কিন্তু রেস্তরাঁয় বা ট্রেনের কামরায় যদি অপরিচিত কাউকে প্রশ্ন করা হয়, মহাশয়ের কি করা হয়? আপনার নামটি জানতে পারি কি? ব্যস, আর রক্ষে নেই। বুঝতে হবে ম্যানার্সের শেষ সীমারেখা তোপ দেগে উড়িয়ে দেওয়া হ'য়েছে। মেয়েদের স্নানের ঘরেও নাকি ভুল ক'রে ঢুকে পড়লে এতটা অপ্রস্তুত হবার আশঙ্কা নেই।

এসব আমরা জানিনা। এত কায়দাকানুন রপ্তকরা আমাদের কোষ্ঠীতে লেখেনি। অপরিচিত কারো সঙ্গে আলাপ জমাতে হ'লে ময়েশ্চার বা হিউমিডিটি-র প্রসঙ্গ তুলতে হয় না। দরকার পড়ে না মীটিয়রলজি অফিসের মুণ্ডপাত করবার। সম্পূর্ণ অপরিচিত কাউকে আমাদের দেশে হামেশাই প্রশ্ন করা চলে ঃ আপনার দেশ? কত মাইনে? বছরে ক'টা বোনাস? এতেই আমরা অভ্যস্ত। কিন্তু এ দেশে যেটা স্বাভাবিক, ও দেশে সেটা একান্তই ব্যতিক্রম।

আমার সহযাত্রী ভদ্রলোক কিন্তু দেখলাম কিছুটা স্বতন্ত্র প্রকৃতির মানুষ। ওঁর এটিকেট্ আর ম্যানার্স, দেখলাম সে রকম সঙ্গীন উঁচিয়ে নেই। ভদ্রলোকের সম্পর্কে আমার অবশ্য কৌতূহল যথেষ্ট। আমার প্রসঙ্গে ওঁর দেখলাম আগ্রহ আছে।

একহারা গড়নের ছিপছিপে চেহারা। বুদ্ধিদীপ্ত তীক্ষ্ণ চোখ। সুন্দর মুখশ্রী। থুতনির সামনের দিকটা কিছুটা নোয়ানো। স্বর্ণাভ চুলগুলি কাৎ ক'রে আঁচড়ানো।

আপন মনেই ব'লে চলেন ভদ্রলোক: সকাল সকাল পৌঁছে যাবেন জুরিখ। কপাল জোর থাকলে কোনও সুইস্ বিমানে ঘণ্টা-খানেকের মধ্যেই পৌঁছোতে পারবেন মিউনিক-এ। জর্মন জানেন আপনি?

—কাজ চালাতে পারি কোনও রকমে।

—আমার দৌড় বেইরুট।

ভদ্রলোকের নাম উইলিয়ম অরপেন। লণ্ডনের এক সংবাদপত্রের রিপোর্টার। কর্মস্থল বেইরুট। মধ্য প্রাচ্যের সংবাদ আহরণের তাগিদে আরব রাষ্ট্রগুলির ওপর অহরহ ঘুরে বেড়ান। জরুরী নির্দেশ পেয়ে ভারতে গিয়েছিলেন—জম্মু ও কাশ্মীরে—। বম্বেতেও ছিলেন হপ্তাখানেক। এখন ফিরে চ'লেছেন বেইরুট।

অতিশয় চাপা দেখলাম এক জায়গায়। জার্নালিজম্ হয়তো পেশা, কিন্তু রাজনীতি যে কিছুটা নেশাও তাতে সন্দেহ আছে ব'লে মনে হ'লো না। সে প্রসঙ্গ কিন্তু সম্পূর্ণ এড়িয়েই যেতে চাইলেন।

আমি কিছুটা নাছোড়বান্দা। প্রশ্ন করি, মধ্যপ্রাচ্যের পলিটিক্যাল ভ্যাকুয়াম আইজেনহাওয়ার যে ভাবে ভরাট ক'রতে চাইছেন, সে সম্পর্কে আপনার মতামত কি?

হেসে একরকম উড়িয়েই দিতে চাইলেন। শুধু বললেন: আমার মতামতের আর কি দাম বলুন! তবে লেবানন্ বেশ খুশীই হ'য়েছে দেখলাম। কিন্তু সিরিয়া বা ডামাস্কাসের রেডিও খোলবার উপায় নেই। সর্বত্র হাঁ হাঁ ক'রে উঠছে।

আমি রাজনীতির ছাত্র নই। কিছুমাত্র আগ্রহও নেই তাতে। তবে এটুকু বুঝি, এই তামাম চত্বরে আজ এক নতুনের দুরন্ত আহ্বান এসেছে। মানুষ সেখানে চঞ্চল। চিত্ত তাদের আজ বিক্ষিপ্ত।

কায়রোর শতাব্দীর কবরখানার মধ্য থেকে নবজন্ম আজ দুরন্ত আবেগে থরথর ক'রে কাঁপছে। সিরিয়া আজ সরে দাঁড়িয়ে নেই। মোরব্বায় ভুলবে না আজ মরক্কো। কোন মিষ্টি কথাতে জড়িয়ে নেই আজ জর্ডন। আঁঠি সার খাঁটি খেজুর গাছ কতটা ছায়া বিতরণ ক'রবে বাগদাদে ?

এই মহাশক্তির উৎস কোথায় ?

শতসহস্র জীবন আজ প্রাণচঞ্চল হ'য়ে উঠেছে কিসের জোরে ! বারমুডা ? শ্রীনেহেরু ক'রেছেন কি ? কেউ বলেন, 'ডিসকভারী অব ইণ্ডিয়া'—'ফাইভ-ইয়ার-প্ল্যান' বলেন কেউ।

কিন্তু আমি জানি 'পঞ্চশীলা'।

এয়ার ইণ্ডিয়া ইণ্টারন্যাশনালের বাহাদুরী আছে। ভারতীয় খাদ্যকে পরিপূর্ণ ইণ্টারন্যাশনাল করবার চেষ্টা হ'য়েছে। কোলের ওপর ট্রে নিয়ে এয়ার হোস্টেস এগিয়ে এলেন। মশলাপাতিতে বড়সড় একটি কাটলেট্। কড়াইশুঁটি আর আলুসেদ্ধ। সেই সঙ্গে একপাত্র টমেটোর রস। সাদা ধব্ধবে অল্প সরু চালের ভাত সুন্দর ক'রে প্লেটে সাজানো। কোনে অল্প একটু আমের আচার।

এক চামচ ভাত মুখে তুলে উইলিয়ম বলেন : ঝালটা রপ্ত ক'রতে পারলে মশলাপাতিতে রান্না বেশ ভালোই লাগে। নানা দেশ ঘুরে ঘুরে আমার কিছুটা ধাতস্থ-ও হ'য়েছে। বম্বেতে আমি ভারতীয় খানা খেয়েছি। ভালোই লেগেছে আমার। ইয়োরোপে মশলা জন্মায় না। লঙ্কা আমাদের দেশের টেবিলে নিষিদ্ধ। জর্মনিতে তো কথাই নেই, নুনকেই ওরা মশলা ব'লে জানে।

উইলিয়মের কথায় হাসি পেল। ব'লতে ইচ্ছে করে, সাহেব, তুমি ফরিদপুরের লোক নও। ভারতীয় রান্নার পহেলা নম্বরের হদিশ পেতে হ'লে যে তোমাকে খানখানাপুরে আসতেই হবে। বম্বের তাজে কুমিল্লার আকতার বা এক গোয়ানীজের হাতের ভারতীয় রান্নাই শুধু খেয়েছো তুমি। রসনার তৃপ্তির জন্যে পদ্মা পেরিয়ে আসতে হবে

তোমাকে কষ্ট ক'রে। পলানির মা-র খোঁজ করতে হবে বামুন পাড়ায়। তাঁর হাতের সর্ষে বাটা ইলিশ মাছের ঝোল, ইয়োরোপায় তিন কোর্সের ডিনারকে একাই মহড়া নিতে পারে।

কিসের 'ইতালিয়ান রিসোট্টো'! পলানির মা-র দেখা পেলে জানি পালাতে সে পথ পাবে না। উল্টো মুখো ম্যারাথন দৌড় সুরু হ'য়ে যাবে। তুলনা কার সঙ্গে? 'হাঙ্গেরিয়ান গুলাশ'? ব'লতে চান বলুন। শুনতেও মন্দ লাগে না। কিন্তু তুলনাটা ছেলে মানুষী হ'লো না?

আমি জোর গলায় ব'লতে পারি, খোদ ভিয়েনার 'স্নিৎসেল' সর্ষে বাটা ইলিশ মাছের ঝোলের কাছেও নিষ্প্রভ।

ভোজন পর্ব শেষ হ'লো। একটা সিগারেট শেষ ক'রে ফিরে এলাম নিজের জায়গায়। বিমানের একটানা শব্দ। শত শত মাইল পিছনে ফেলে কত নগর শহর দুপাশে রেখে দুর্জয় বেগে ছুটে চলেছে সে ক্লান্তিহীন।

কেবিনে কেবিনে কিসের যেন আলোড়ন প'ড়ে গেল। বেশ কিছু সময় লাগলো ধাতস্থ হ'তে। বুঝলাম প্রাক্-শয়ন পর্ব চলেছে এখন। পোষাক বদল হচ্ছে। সূতীর পোষাকে হাত পড়েছে সবার।

তবু পরিস্কার হ'লো না ব্যাপারটা। ভিতরে যেটুকু ঠাণ্ডা, তাতে কোটের ওপর একটি ওভারকোট হ'লেই ভালো হয়। জানুয়ারীর দার্জিলিং নাই বা হ'লো! পৌষমাসের ধানবাদের শেষরাত্রের ঠাণ্ডার চেয়ে কেবিনের অবস্থা কিছুমাত্র সহিষ্ণু নয়। সূতীর পোষাকে কুলোবে কেন?

কুলোলো-ও না। সবাই দেখছি হিড় হিড় ক'রে কম্বল টেনে বার ক'রছে। পা থেকে মাথা পর্যন্ত জড়িয়ে ব'সছে জুত হ'য়ে। তা'হলে এত কসরৎ ক'রে ধড়াচূড়ো খুলে বসবার দরকার কি?

বুঝতে হয়, এটা অভ্যাস। কিন্তু একি দেখছি। চক্রাবক্রা ডোরা কাটা এক ঢিলে পোষাক বাগিয়ে প'রেছেন পাঞ্জাবী মহিলা। বেশ বদল হ'য়েছে সঙ্গের ভদ্রলোকের। শুকনো চোখে এপাশে

ওপাশে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে নিয়ে এগিয়ে এলেন ভদ্রমহিলা। 'টয়লেট্ রুমে' ঢুকে প'ড়লেন তারপর। 'ভেকেন্ট' গেল নিভে। জ্ব'লতে থাকলো 'এনগেজড্'।

কেবিনের উজ্জ্বল আলো বদলে গেল। হালকা নরম নীল আলোতে ভ'রে উঠলো চারদিক। চোখ বুঁজেছেন কেউ। টান্‌টান হ'য়ে শুয়ে পড়েছেন কেউবা। সামনের এক প্রবীন ভদ্রলোক কোলের কাছে 'রিডিং লাইট' জ্বেলে বই খুলে ব'সেছেন।

কিছুতেই যেন আমার শানাচ্ছিল না। একটা কিছু পেলে ভালো হতো মনে হচ্ছিল। কি ভেবে কড়া ধাতের এক পাত্র চেয়ে বসলাম। নরম এক টুকরো হেসে এয়ার হোস্টেস্ চ'লে গেলেন।

চোখাচোখি হ'তেই উইলিয়ম হাসলেন। দলে টানবার চেষ্টা দেখি বৃথা। আমাকে বাধা দিয়ে বলেনঃ বুঝেছি, আপনি সঙ্গ চাইছেন। কিন্তু এ অনুরোধ না ক'রলেই আমি খুশী হবো। ড্রিঙ্কস্-র ভয়ে অপরিচিত পরিবেশে ডিনার বা সন্ধ্যের নিমন্ত্রণই আমি ছেড়ে দিয়েছি আজকাল। আমাকে মাপ করবেন।

আমি কিছুটা গুটিয়ে গেলাম। কিছুটা যেন অন্যমনস্ক হ'য়ে গেলেন উইলিয়ম। এয়ার হোস্টেস্ এক পাত্র দিয়ে গেলেন আমার হাতে।

কৌতূহল হ'লো। উইলিয়মকে প্রশ্ন করি ঃ ড্রিঙ্কস্ ছেড়েছেন কেন ? বারণ করেছে ডাক্তার ?

বেশ কিছু সময় লাগলো জবাব আসতে। কিছুটা যেন অপ্রস্তুত হ'য়ে গেলেন আমার কথায়। ধীরে মুখটি তুলে বলেনঃ শরীরের অজুহাত আমি দেব না। এমনি এমনিই ছেড়ে দিয়েছি।

কিছুটা যেন জবাবদিহির সুর ছিল উইলিয়মের কণ্ঠে।

আমি প্রসঙ্গ পরিবর্ত্তন করতে চেয়েছি। কিন্তু উইলিয়মই থামলেন না। আমাকে সমুখ করে ঘুরে বসলেন কিছুটা। বললেনঃ আমাদের দেশে মদের অতি সহজ প্রচলন আছে। শীতের দেশ!

ইয়োরোপের বহু জায়গায় জলের বদলে লোকে 'বীয়ার' খায়! বুঝেছি, আপনার কিছুটা খটকা লেগেছে মনে। ড্রিঙ্কস্ ছাড়বার পেছনে হয়তো খুব একটা যুক্তি নেই। কিন্তু আমি কেমন যেন আর সাহস পাইনে।

সহজ ক'রতে গিয়ে হেসে বলি ঃ নাটুকে গন্ধ পাচ্ছি!

সহজ কিন্তু হ'ল না। থমথমে এক ধূসর মেঘ যেন উইলিয়মের সারা মুখটিতে নেমে এলো। কণ্ঠস্বর আর্দ্র হ'য়ে উঠ্‌লো মুহূর্তে। ম্লান এক টুকরো হাসি পাতলা ঠোঁটে মুহূর্তের জন্যে খেলে গেল। বললেন ঃ একেবারেই। প্রায়শ্চিত্ত করছি এখন। সে অনেক কথা। হয়তো সে কাহিনী শুনতে আপনার কিছুমাত্র ভালো লাগবে না।

জবাবে বলেছি ঃ আমার অন্যায় কৌতূহল আপনাকে বিব্রত ক'রেছে। মাফ করবেন, শুধু কথার খাতিরে কথা বলেছি!

আমাকে থামিয়ে দিলেন উইলিয়ম। নীচু পর্দায় বললেন ঃ আপনার কিছুমাত্র দোষ নেই। এরকম প্রশ্ন আপনার মনে আসা স্বাভাবিক। আসবেই। পুরো ঘটনাটি না শুনলে আমার বক্তব্য স্পষ্ট হবে না। আপনার সহজ লাগবেনা কিছুতেই।

উইলিয়মকে আমি অতিশয় চাপা ও সংযত চরিত্রের মানুষ মনে ক'রেছিলাম। অতি সাধারণ এক প্রসঙ্গে কেমন যেন ভাবপ্রবণ হয়ে প'ড়লেন। তুচ্ছ কথার খেই ধরে মন উধাও হ'য়ে গেল। জীবনের এক গোপন বিচিত্র কাহিনী উদ্‌ঘাটিত করে দিলেন উইলিয়ম--

উইলিয়ম অরপেন, --আইরিশ। বাবা চাকরী নিয়ে এসেছিলেন লণ্ডনে। থাকতেন হ্যামারস্মিথের এক ফ্ল্যাটে। বিখ্যাত এক ব্যাঙ্কের দাপুটে চাকরীতে তিনি বহাল ছিলেন। গোঁড়া ক্যাথলিক।

ইংরেজী উচ্চারণে উইলিয়মের একটি বিশেষ টান ছিল। জড়তাও ছিল সেই সঙ্গে। স্কুলে তাই প্রথমে সে ছিল আড়ষ্ট। ঢ্যাঙ্গা চকোলেট্‌খোর এক ছেলের তাড়নায় নতুন পৃথিবীতে সে যখন কিছুটা সঙ্কুচিত, টমসনের সঙ্গে আলাপ হ'লো উইলিয়মের।

ধনীর ছেলে টমসন্। বাবার ছিল প্রেস। হ্যামারস্মিথের পুরোনো বাসিন্দা।

অতি অল্পদিনে সামান্য আলাপ থেকে দুজনের মধ্যে নিবিড় একটা প্রীতির সম্পর্ক গ'ড়ে উঠলো। বন্ধুত্ব জমে ওঠে প্রগাঢ় হ'য়ে। ক্লাসের পর নিভৃতে ব'সে দুজনের কত কথার যে হ'তো আদান প্রদান! উইলিয়মের ছিল পড়ার বাতিক। টমসন্ তার দোসর। বাবার চোখে ধুলো দিয়ে টমসনের বাড়ীতে ছুটির দিনে সারা দুপুর কাটিয়ে যেত উইলিয়ম। ডি. এইচ. লরেন্সের বই সেই বয়সেই তারা গিলে খেয়েছে।

তারপর কলেজ লণ্ডন স্কুল অফ ইকনমিক্স্। টমসনের একমাত্র ভবিষ্যত স্বপ্ন, সে সাংবাদিক হবে। উইলিয়মের সুন্দর লেখার হাত। ঠিক করে, দুজনে মিলে বার ক'রবে একটা সাপ্তাহিক। টমসনের বাবার প্রেসই ভরসাস্থল।

সময় আর সময়। কলেজের দিনগুলিও ফুরিয়ে গেল। টমসন্ বলেঃ মিউজিয়মে শুধু বই পড়ছো, আর সিনেমা থিয়েটার দেখে বেড়াচ্ছো সারাদিন। কিন্তু আমাদের কাগজ সম্পর্কে কিছু ভাবছো উইলিয়ম ?

উইলিয়ম বলেঃ বিশুদ্ধ সাহিত্যচর্চা। তবে সাপ্তাহিক আমরা দুজনে পেরে উঠবো না। মাসিক-ই ক'রতে হবে আমাদের। বড়দিনে কাগজের হবে প্রথম উদ্বোধন।

টমসন বলেঃ তুমি বাগিয়ে ধর কলম। আমি নিলাম ম্যানেজারী। বাবার প্রেস হাতানোর ভারটাও আমিই নিলাম।

কিন্তু উইলিয়মের কলম বাগিয়ে ধরা হ'লো না। বাবার প্রেস হাতানোর সময়ও পেল না টমসন। রাইফেল নিয়ে শত-সহস্র সৈনিকের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ওদের চেপে ব'সতে হ'লো জাহাজে।

তারপর সে এক বিচিত্র জীবন কাহিনী। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দিনের পর দিন দেশে বিদেশে ঘুরতে হ'য়েছে তাদের।

বেশ কিছুদিন পর। অনেক বিপদ কাটিয়ে সিঙ্গাপুরের কাছে পাহাড়ের সামান্য এক টিপির দখল নিতে গিয়ে মারাত্মক আঘাত পেলো টমসন। সামরিক হাসপাতালে দ্রুত তাকে অপসারণ করা হ'লো। বিহ্বল উইলিয়ম ভাবতে সময় পেল না। সপ্তাহখানেকের মধ্যেই তাকে নতুন এক অজানা পথের আহ্বানে সিঙ্গাপুরের রণাঙ্গন ছাড়তে হ'লো।

বোম্বাই জাহাজ খালি হ'য়ে গেল খিদিরপুরে। কিছু গেল আসাম। মাণপুরে কিছুটা। যে কোনও জায়গায়, যে কোনও মুহূর্তে রওনা হবার অপেক্ষায় এক বিরাট দলের সঙ্গে উইলিয়ম থেকে যায় কলকাতায়।

মাসখানেক পর টমসনের নিজের হাতে লেখা চিঠি উইলিয়মের হাতে আসে। সুস্থ আছে। সেরে উঠছে সে।

টমসন হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেল মাস চারেক পর। সে খবর উইলিয়মের কাছে যখন পৌঁছলো তখন সে ইম্ফলে। শত্রুপক্ষ দ্রুত পিছু হ'টছে তখন। একটানা বাহাত্তর ঘণ্টা মেশিনগান চালানোর পর উইলিয়ম কলম খুলে ব'সলো। টমসনকে জানালো ঃ আমি হলফ ক'রে বলতে পারি সামনের শীতের আগেই আমরা হ্যামারস্মিথে ফিরে যেতে পারবো। শত্রুপক্ষ সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হ'চ্ছে এখানে! ইত্যাদি…।

অনুমান মিথ্যে হয়নি উইলিয়মের। ফেব্রুয়ারী মাসে ইয়াল্টা কনফারেন্স। মে মাসে রাশিয়ার বার্লিন অধিকার। অগষ্টের প্রথম সপ্তাহেই নাটকীয় ভাবে হিরোসিমা আর নাগাশাকি'র ধ্বংস স্তূপের মধ্যে ভয়ঙ্কর মহাযুদ্ধের যবনিকা।

টমসন যেদিন বাড়ি ফিরলো তার দু'সপ্তাহ পর এলো উইলিয়ম। ক্লান্ত দেহ। অবসন্ন মন। সারা ইয়োরোপে শ্রান্তি।

অতি উৎসাহী টমসন বলে ঃ এবার আমাদের কাগজের কথাটা ভেবে দেখতে হয় উইলিয়ম।

উইলিয়ম জবাব দিল : কলমের কালি গেছে শুকিয়ে। বারুদের বোটকা গন্ধ এখনও যেন লেগে র'য়েছে হাতে। সবুর কর, সব হবে।

সবুর সইলো টমসনের। সব কিন্তু হ'লো না। তবে সে দোষ উইলিয়মের নয়। কাগজের বড় দুর্দিন। শুধু অগ্নিমূল্য নয়, জোগাড় করাও দুষ্কর হ'লো বাজারে। তাছাড়া নতুন কাগজ বার করবার বাধাও ছিল প্রচুর।

এক দৈনিকে সাংবাদিকের কাজ নিল টমসন। দিনের বেশীর ভাগ সময় মিউজিয়মের বইয়ের মধ্যে ডুবে থাকতো উইলিয়ম। মঞ্চ ও পর্দ্দার সমালোচনার কাজ একটা হাতে এলো। ক্লেন্‌ডুড্‌নো-র এক সাপ্তাহিক কাগজের লণ্ডন প্রতিনিধির কাজও ঠিক সেই সময়ই জোগাড় হ'লো।

টমসন নির্জ্জলা সাংবাদিক। উইলিয়ম হ'লো সমালোচক। কয়েক বছরের মধ্যেই যথেষ্ট সুনাম অর্জন ক'রল দুজনেই। উইলিয়মের সামান্য কলমের আঁচড়ে বহু অভিনেতার চোখের সামনে রঙ্গমঞ্চের দুয়ার বন্ধ হয়। আবার তারই কিছুটা পক্ষপাতিত্বে কোনও অভিনেত্রী প্রমোশন পান 'টি ভি' থেকে পর্দাতে।

একদিন সন্ধ্যে বেলা। প্রেসের জরুরী তাড়নায় উইলিয়ম তার লেখাটি তাড়াহুড়ো করে শেষ ক'রেছে, ঠিক সেই সময়েই এলো ডায়না রো। 'টি. ভি'তে সুন্দর অভিনয় দেখে জোর কদমে কলম ছুটিয়েছিল উইলিয়ম তার কাগজে। তাই কৃতজ্ঞতা জানাতে এসেছিল ডায়না সেই সন্ধ্যেতে।

আনাড়ী উইলিয়ম আপ্যায়নে ব্যস্ত হ'য়ে পড়ে। ঝুঁকে প'ড়ে বিনয়ের হাসি টেনে ব'ললো : শ্যাম্পেন না শেরী?

খুশীর হাসি ভরিয়ে তুলেছে ডায়না। মাথা নেড়ে জবাব দিয়েছে : কিছু না।

—এক পাত্র কোনও কিছু?

—না!

—এক পেয়ালা কফি-ও চলবে না আপনার ?

—প্রয়োজন নেই।

—তাহ'লে ?

—আপনার সঙ্গে ব'সে গল্প ক'রতে পারলেই আমি খুশী হবো।

আচমকা এক নাড়া খেয়ে কাঁচাঘুম যেন উইলিয়মের ভেঙে গেল। কথাবার্ত্তায়, চালচলনে এত মাধুর্য উইলিয়মের চোখে পড়েনি কখনও। কাজের কথা অতি সামান্যই। অনেক কথা, আরও অনেক কিছুর হিজিবিজি। তুরন্ত ভালো লেগে গেল ডায়নাকে তার। সারা দেহে ও মনে সুরবাহারের তরঙ্গের মত এক মিঠে হিল্লোল কেঁপে কেঁপে দূরে মিলিয়ে গেল। ডায়না শুধু সুন্দরী নয়—অপরূপ।

সব কিছু ভুল-ভাল হ'য়ে গেল। গোলমাল লেগে গেল সব তাতেই। মিউজিয়মে আনাগোনা স্তিমিত হ'লো। যথাসময়ে লেখা পৌঁছলো না প্রেসে। হ্যামারস্মিথের ফ্ল্যাটে টমসন এসে ফিরে গেছে অনেকবার। ডায়নার ডিনার খেয়ে গল্পে সল্পে বাড়ী ফিরতে রাত হ'য়ে যায় উইলিয়মের। পথে শুধু ভেবেছে, বড়দিনে ডায়নাকে নিয়ে কোথায় বেড়াতে যাবে সে! ব্ল্যাকপুলে না স্কারবারায় ?

উইলিয়ম একদিন টমসনকে বলে: ডায়না নিতান্তই প্রতিভা। আজ হয়তো সে অনাদৃত। কিন্তু ভাবীকালের সে এক তুরন্ত জিজ্ঞাসা। দায়িত্ব তার শুধু একার নয়। ঝুঁকি তাকেও কিছু নিতে হবে। টমসনকে-ও হ'তে হবে ঢাকের কাঠি। তার কাগজেও যেন ডায়নার জন্যে জায়গা থাকে।

টমসন রসিকতা ক'রে ব'লেছে ডায়নাকে: আপনার খাতিরে পুরো এক কলম জায়গা খালি রাখবো কাগজে। দরকার হ'লে আপনার জন্যে চায়ের প্যাকিং বাস্কের ওপর দাঁড়িয়ে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করতে পারি হাইড পার্কে।

ঠিক সেইদিনই জরুরী তার পেয়ে উইলিয়ম দেশের বাড়িতে চ'লে গেল। ইতিমধ্যে ব্যাঙ্কের চাকরীতে পেনশন নিয়ে পিতা চ'লে

গেছেন দেশে। ঘোড়ার মুখে লাগাম্ লাগাতে গিয়ে গোঁড়া ক্যাথলিক পিতা মারাত্মক আঘাত পেয়েছেন। যাবার সময় ডায়নার সঙ্গে দেখা ক'রে যাওয়াও সম্ভব হয়নি উইলিয়মের।

ফিরতে কিছু দেরীই হ'য়েছিল তার। প্রায় মাস শেষ ক'রে উইলিয়ম লণ্ডনে ফিরে এলো।

খুব সহজ কথাই হচ্ছিল সেদিন। বাইরে ছিল দুর্দিন। প্রচণ্ড বর্ষা যাচ্ছে শহরে। কি কথার প্রসঙ্গে ডায়না বলে: 'টি. ভি'তে অভিনয় আমি ছেড়ে দিয়েছি।

বিস্মিত উইলিয়ম প্রশ্ন করে: কেন?

কয়েক মুহূর্ত চুপ ক'রে রইলো ডায়না। সুন্দর হেসে জবাব দিল তারপর: টমসনের পছন্দ নয়।

অতি দুর্মূল্য পানীয় বিস্বাদে ভ'রে ওঠে। সহজ আলাপের মধ্যে তুচ্ছ এই কথাটি আচমকা এক ঝড়ো বাতাসের মত যেন সব কিছু এলোমেলো ক'রে দিল। নাচের ছন্দ কেটে গেল। একই কথা বার বার উইলিয়মের মাথায় পাক খেয়ে ঘুরে মরে: টমসনের পছন্দ নয়।

পরদিন উইলিয়ম টমসনের কাছে জানতে চেয়েছে: 'টি. ভি'তে যেতে বারণ ক'রেছ তুমি ডায়নাকে?

এক কথায় জবাব আসেনি টমসনের। কিছুটা যেন অপ্রস্তুত। কিছুটা যেন লজ্জিত-ও। বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ ব'সে থাকা। তারপর ব'লেছে: আমি বারণ করেছি ডায়নাকে। তুমি আমার অকৃত্রিম বন্ধু। শুনে খুশী হবে, ডায়নাকে আমি ভালোবাসি। এই বিরল প্রতিভা আবিষ্কার করেছো তুমি। তোমার কাছে আমি ঋণী থাকলাম উইলিয়ম।

তছনছ হ'য়ে ফিরে এসেছে উইলিয়ম। নিজের মনের কথা কাকে ব'লবে সে। দুঃসহ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে পথে পথে ঘুরেছে। টমসনকে তার কি বলবার আছে? কি দোষ দেবে ডায়নাকে?

ডায়না তো কোনও দিন তাকে আশার বাণী শোনায়নি। সে নিজেই হ'য়েছে বেহিসাবী। চতুর মেয়ে ডায়না। মিষ্টি কথাতে, সহজ ব্যবহারে, তার বেহিসাবী দুর্বলতাকে সে এড়িয়েই গেছে। নাচের উঠোনেই কি ডায়নার যত রাজ্যের গল্প মনে প'ড়তো?

নিজেকে সংযত ক'রেছে উইলিয়ম। সহজ হ'তে চেষ্টা ক'রেছে। কিসের অভিমান! অভিযোগ তার কার কাছে? পূর্বের মত স্বাভাবিক ভাবে টমসনের কাছে ছুটে গেছে। সেই কথা, সেই মামুলী প্রসঙ্গ। কিন্তু বন্ধুত্বের একটি তার যেন কোথায় হারিয়ে গেছে। খেই পায় না উইলিয়ম।

কিছুদিন পর, পর পর দুটি ঘটনা ঘ'টলো। টমসন আর ডায়নার বিয়ে হ'লো। তারপর পুরো এক মাসও ঘুরলো না। কোরিয়ার এক ইংরিজি সংবাদপত্রের সম্পাদকের কাজ নিয়ে সিওল চলে গেল টমসন।

ডায়না গেল সঙ্গে।

কাজের মধ্যে ডুবে যেতে চাইলো উইলিয়ম। কিন্তু সেই স্যাঁত সেঁতে লণ্ডন শহর, সেই রেস্তরাঁ আর হ্যামারস্মিথের ফ্ল্যাট; কেমন যেন হাঁপিয়ে উঠ্‌তে লাগলো। বৃটিশ মিউজিয়মের কেতাবও তার মনকে যেন শাসনে আনতে পারে না।

বেশ কিছুদিন গেল এইভাবেই। নিতান্ত গায়ে প'ড়ে একেবারে জানান না দিয়ে উইলিয়মের কাছে বিখ্যাত এক সংবাদপত্রের ভ্রাম্যমান রিপোর্টারের চাকরীর প্রস্তাব আসে একদিন। চুক্তিপত্র না দেখেই একরকম রাজি হ'য়ে গেল উইলিয়ম। তিন জায়গায় তিনটি চাকরী। বন, বেইরুট আর পিকিং। বেইরুট-ই বেছে নিলো উইলিয়াম।

সিওল থেকে তিন পাতার দীর্ঘ চিঠি এলো টমসনের। বহু কথা, বহু প্রশ্ন ও উচ্ছ্বাসে ভরা অতি সুন্দর টমসনের পত্রটি কেমন যেন মুগ্ধ করে। একথা সে কথার পর দুঃখ ক'রেছে টমসন: বিশুদ্ধ সাহিত্য চর্চ্চার দিক থেকে ভেবে দেখতে গেলে আমাদের হ্যামারস্মিথের বাড়িই

প্রকৃত তীর্থক্ষেত্র। রাজনীতির নানান চুলো-চুলিতে প্রাণ অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠছে। পলিটিক্যাল বদনামীদের মন রাখতে রাখতে নিজের স্বকীয় সত্তা দেউলে হ'তে ব'সেছে। তোমার নতুন কাজ কেমন লাগছে? মনে হয় খুব অপছন্দের নয়··· ইত্যাদি।

উইলিয়ম জবাব পাঠালেঃ তুমি প'ড়েছো ৩৮' প্যারালালের ফেরে। আর আমি তামাম চত্বরে শুধু দৌড়ে বেড়াচ্ছি। পলিটিক্যাল চুলো-চুলি এখানেই বা কম কিসে? এখন ভাবছি পিকিং বা বন'ই আমার ছিল ভালো।

দুরন্ত বেগে সময় ছুটে চলে। ঘটনা ঘটে অনেক। অঘটনও কিছু কম ঘটে না। উইলিয়মের পত্র টমসন ঠিক সময়ে পায়। জবাব পাঠাতে টমসনও কিছুমাত্র দেরী ক'রে না। দীর্ঘ চার বছর পার হ'য়ে গেল এই ভাবেই।

একটানা একঘেঁয়ে জীবন। কেমন যেন ক্লান্তিকর। তবু নতুন দেশের নতুন মানুষের ভীড়ে আর তাজ্জব সব খবরের মধ্যে উইলিয়ম বোধ হয় নতুনত্বের কিছু স্বাদ পায়।

উইলিয়ম রাত্রে ব'সে একদিন টমসনকে লিখতে ব'সলেঃ কাল সকালে বান্দুং যাচ্ছি। এ অঞ্চলে হৈ হৈ, রৈ রৈ পড়ে গেছে। 'সিডো'র খুঁটির জোর কতটা শক্ত এবার বোঝা যাবে। পিকিং-য়ের খুব হাত আছে ব'লে মনে হচ্ছে না। এদেশের নেতাগুলো যখন তখন দিল্লী দৌড়োচ্ছে। শ্রীজওহরলাল নেহরু সম্পর্কে তোমার মতামত কি? বান্দুং থেকে লিখবো তোমাকে ইত্যাদি।

পরদিন জাকার্ত্তা। সেখান থেকে আধা ঘণ্টায় বান্দুং।

দিন দশেক মরবার ফুরসুৎ ছিল না। গোগ্রাসে সংবাদ আহরণ ক'রেছে। দেশ বিদেশের নেতাদের মুখের খবরের পেছনে ছুটেছে হন্যে হ'য়ে।

রাত্রে নিজের হোটেলে ফিরে উইলিয়ম এক তার পেলো।

টমসনের নিমন্ত্রণ ঃ বান্দুং শেষ ক'রে তুমি সিওলে এসো। হপ্তাখানেক এখানে কাটিয়ে গেলে আমাদের ত্বজনের খুব ভালো লাগবে। তুমি ক্লান্ত। বিশ্রামেরও দরকার তোমার। তুমি এসো।

মনস্থির ক'রতে অবশ্য খুব একটা সময় লাগেনি! দ্বিধা তার হয়েছিলো। ত্বদণ্ড ভাবতে হয়েছে তাকে। টমসন তার শ্রেষ্ঠ বন্ধু। কিন্তু ডায়না কি পূর্বের মত সহজ হ'তে পারবে?

হাতের কাজ সেরে নিতে সপ্তাহখানেক সময় লাগলো। ছুটিও সংগ্রহ হ'লো অক্লেশে।

নতুন দেশের নতুন কিছু সওদা ক'রলে। কি ভেবে নিজের আন্দাজে ডায়নার জন্যে কিনে বসলে 'সারং-কেবায়া'—ইন্দোনেশিয়ান মেয়েদের অতি প্রচলিত পোষাক। ওড়নার মত একফালি বিচিত্রিত 'স্ল্যানডাং'ও দোকানদার গছিয়ে দিলে উইলিয়মকে।

তারপর সোজা সিওল।

টমসনের কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হয়নি। কিছুমাত্র বদলায়নি ডায়না। চেহারার অবশ্য কিছু পরিবর্ত্তন হ'য়েছে ঠিকই। দেহটি আগের মত একহারা নয়—ভরা ভরা। চোখের চঞ্চল চাউনীতে নেমে এসেছে স্নিগ্ধ গভীর দৃষ্টি।

টমসন বলে ঃ ' বান্দুং থেকে ফিরেছো তুমি, সঙ্গে এনেছো কি?

জবাব দিয়েছে উইলিয়ম ঃ 'সীংম্যান রী'র জমির ওপর দাঁড়িয়েই আমি হেঁকে ব'লতে পারি শ্রীনেহরু'র তুলনা নেই। এই মহান মানুষটি আমাকে মুগ্ধ করেছেন! তোমার জন্যে তাই সঙ্গে এনেছি 'পঞ্চশীলা'। ডায়নার হাতে কাগজের মোড়ক তুলে দিয়ে হেসে ব'লেছে ঃ এটি এনেছি তোমার জন্যে।

গল্প! গল্প! গল্প! দিনরাত খালি গল্প! কত কথা জমা হ'য়েছে ত্বজনের। ডায়নার কি নিখুঁত আপ্যায়ন। টমসনের অকৃত্রিম ভালোবাসায় অভিভূত হ'য়ে পড়ে উইলিয়ম।

পাহাড়ের উপর বাড়িটি শুধু সুন্দর নয়—নয়নাভিরাম। সাজানো

বাগান। টেনিস খেলবার সবুজ কার্পেটের মত এক ফালি জমি। তাকে ঘিরে ফুল বাগান। কোরিয়ার সাবেকী ঢঙ্গে বাড়ির ছাত ভারি ইঁটে-রঙ্গের টালিতে কাৎ ক'রে সুন্দর ভাবে বসানো। বারান্দা থেকে শহরের অনেকটা নজরে আসে।

বাড়িটি সম্পূর্ণ টমসনের নিজের নয়। কাগজের সঙ্গে যুক্ত আরও দুটি পরিবার বাস করেন এখানে।

দিন দুই অতি সুন্দর ভাবে কেটে গেল। সকালে কোরিয়ান খানা। হ্যান নদীর দিকে বেড়ানো। দুপুরে বান্দুংয়ের গল্প, সিওলের 'টাগ্ অফ ওয়ার'। সন্ধ্যায় 'ভিক্টরী ডান্স হলে' অতি সুন্দর পানীয়। ডায়নার নিজের হাতের অতি সুন্দর ডিনার। গভীর রাত পর্যন্ত হ'তো পলিটিক্সের মুণ্ডপাত।

কি যেন একটা ছিল তার পরদিন। কয়েকজনকে ডেকেছিলো টমসন। আমন্ত্রণ নেহাৎই ছিল পানীয় ঘটিত।

ফল বাগানে বেতের চেয়ার সাজানো হয়েছিলো সুন্দর ক'রে। আকাশ ছিল পরিস্কার! ঝির ঝিরে বাতাস ছিল বাইরে।

অতি সুন্দর পোষাক পরেছিলো ডায়না। চমৎকার মানিয়েছিল তাকে 'সারং—কেবায়া'য়। অতিথি আপ্যায়নে ব্যস্ত ডায়নার অস্থির সুডৌল দুই হাতের ওপর মিহি বিচিত্রিত 'স্যানডাং'। ঠোঁটের নরম হাসিটি ডায়নাকে আরও সুন্দর ক'রে তুলেছিলো।

গল্পেসল্পে বড় সুন্দর জমেছিলো সে সন্ধ্যা। উইলিয়াম এক টেবিলে। তার উল্টোমুখো বসেছিল ডায়না। ডাইনে ছিল টমসন। বাঁয়ে মিঃ কিম্। মিঃ কিম্ স্থানীয় এক দৈনিকের সম্পাদক। দক্ষিণ কোরিয়ার সাংবাদিক জগতের এক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি।

সময় গড়িয়ে গেল অনেকটা। বিচিত্র বর্ণের নানা লোভনায় পানীয়। অগোছালো বহু কথার হিজিবিজি। দায়িত্বহীন বাজে কথাই বেশী। পলিটিক্সের খই ফুটতে থাকে এক টেবিলে। আর এক টেবিলে সোপেনহাওয়ার থেকে আইজেনহাওয়ার। প্রসঙ্গ উঠেছে

প্যাভলভে, পিকাসোতে হ'য়েছে শেষ। উইলিয়মের কিন্তু ভালোই লাগছিলো বেহিসাবী এই হালকা পরিবেশে।

এমন সময় বিরাট একটি গাড়ী এসে থামে। একরকম দৌড়োতে দৌড়োতে এসে হাজির হন একজন। জরুরী বার্ত্তা বহন ক'রে এনেছেন তিনি। সাঁংম্যান রী জরুরী এক প্রেস কনফারেন্স ডেকেছেন। রণকৌশলে দক্ষ এক মার্কিন এসেছেন আজ। পূর্ব কোরিয়াকে চুর ক'রে দেবার নতুন পরিকল্পনা নাকি তিনি নিয়ে এসেছেন। এক মুহূর্ত সময় নষ্ট করাও নাকি বোকামো হবে।

টমসনের সঙ্গে তাড়াহুড়ো ক'রে প্রায় সকলেই রওনা হ'য়ে গেল। উইলিয়মের বাঁয়ে মিঃ কিম্। ওঁর হ'য়ে অন্য একজন গাড়ীতে গিয়ে উঠলেন। একমাত্র মিঃ কিম্'ই র'য়ে গেলেন। উল্টোদিকে ডায়না।

টেবিলে চাপড় মেরে বললেন মিঃ কিম্ ঃ কী-মির-সেনের শক্তিটি আজ কম নয়। চার বছর আগে থেকেই একথা আমি আমার কাগজে লিখেছি বহুবার। নিজের স্বার্থের খাতিরে মার্কিনের আজ সমস্ত শক্তি নিয়ে এগিয়ে আসা দরকার।

নীরব শ্রোতা হিসাবে উইলিয়মের সুনাম ছিলো। চুপচাপ সে মিঃ কিমের কথা শুনে যাচ্ছিল। সায়ও দিচ্ছিল কখনও কখনও।

কথার হয়তো শেষ নেই কিন্তু পানীয়ের শেষ নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু সে পাত্র আবার ভ'রে উঠতে কতক্ষণ ?

ডায়নাকে দেখতে দেখতে আনমনা হ'য়ে যায় উইলিয়ম। সুন্দর মুখশ্রী ঘিরে এক অবসাদ যেন ভাড় ক'রে আছে। কেমন যেন শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সামনে। কি দেখছে, কি ভাবছে ডায়না ?

ডায়না যখন ঘরে গেল পা তখন তার কাঁপছিল। হঠাৎ খেয়াল হ'লো উইলিয়মের, সেও ঠিক নেই।

কি পানীয় কি পরিমাণ পান করা হ'য়েছিল উইলিয়মের মনে নেই। কিন্তু মিঃ কিম্‌কে যখন ধরাধরি ক'রে ড্রাইভার গাড়ীতে নিয়ে তুললো তখন রাত গভীর।

চুপচাপ! অন্ধকার। পোর্টিকোতে নরম একটা আলো। উইলিয়ম উঠতে গিয়ে ট'লে গেল। টেবিলে মাথা রেখে কিছুক্ষণ চেয়ারেই ব'সে থাকা। ধীরে অতি সাবধানে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে আসা তারপর।

কোথায় পা প'ড়ছে কিছুই যেন খেয়াল নেই। শূন্য গহ্বরে যেন ক্রমাগত সে পদক্ষেপ ক'রে চ'লেছে। সিঁড়ির বাঁকে আছাড় খেতে খেতে বেঁচে গেল কোনও রকমে।

চোরের মত পা টিপে টিপে তার ঘরে এসে ঢোকে। অবসন্ন ভারী দেহটা কোনও রকমে বিছানায় এনে ফেলে।

কিসের এক ঝনঝনানিতে ঘুম ছুটে গেল উইলিয়মের। চোখ খুলে দেখে দিনের আলোতে সারা ঘর ভ'রে উঠেছে। সামনে দাঁড়িয়ে কোরিয়ান এক মেয়ে। বাঁহাতে ট্রের এক প্রান্ত ধরা, মেঝেতে চায়ের যাবতীয় কিছু বিক্ষিপ্ত। চূর্ণ হ'য়ে গেছে সবকিছু। মেয়েটির চোখে যেন দারুণ এক বিস্ময়। পাথরের মত দাঁড়িয়ে আছে।

দু' একটি মুখ জানালায় এসে উঁকি দিল। কেমন যেন একটু অবাকই লাগলো উইলিয়মের। কি দেখছে তারা তার দিকে অমন ক'রে?

বিছানা ছেড়ে উঠতে গিয়ে নজরে প'ড়লো। নিজের চোখকেই যেন বিশ্বাস করতে পারে না। বিস্ময়ের শেষ সীমায় যেন পৌঁছে গেছে। তার বিছানায় ডায়না? পরণে রাত্রের সেই 'সারং-কেবায়া'। নরম দু'বাহুতে তার জানু বেষ্টন ক'রে আছে! কার ঘরে, কোথায় এসেছে সে?

জানালা থেকে দুটি মুখ সরে গেল। চাপা বিস্ময়োক্তির সঙ্গে উঠে দাঁড়ালে উইলিয়ম। ডায়নাও সেই মুহূর্তে জেগে উঠলো। এক কাতরোক্তি ক'রে উঠলো উইলিয়মকে দেখে।

পাগলের মত টলতে টলতে ঘর ছেড়ে চ'লে আসছিল উইলিয়ম।

দরজার সামনে টমসন। মাথা নত ক'রে উইলিয়ম চ'লে গেল পাশের ঘরে। সেই ঘর, যেখানে তার থাকার ব্যবস্থা হ'য়েছে।

উইলিয়ম বোঝাতে পারেনি টমসনকে। রাত্রে সে দরজা ভুল ক'রেছিল। হুইস্কীর ঝাঁজালো উগ্রতায় নিজের সম্বিত সে হারিয়েছিল নিঃশেষ ক'রে। ডায়নাও যে প্রকৃতিস্থ ছিল না একথা বোঝাতে পারেনি উইলিয়ম। টমসন স্তব্ধ। চোখে তার মৃত মানুষের দৃষ্টি।

ঝগড়া নয়। চেঁচামিচি নয়। অপ্রীতিকর কোনও কিছুই ঘটে নি। কোনও কথাই বলেনি টমসন। কিন্তু দুরন্ত এই সন্দেহের নিরসন হবে কিসে? যুক্তি দিয়ে কি বোঝাবে উইলিয়ম?

রিক্ত উইলিয়ম সেইদিনই সিওল ছেড়ে চ'লে এলো। পরাজিত, বিধ্বস্ত সৈনিকের মত নয়। অন্ধকার হাতড়ানো চোরের মত।

মাসখানেক পর উইলিয়মের কাছে সংবাদ এলো, টমসনের সঙ্গে ডায়নার বিবাহ-বিচ্ছেদ হ'য়ে গেছে। তারপর আর কোনও সংবাদই উইলিয়মের জানা নেই।

উইলিয়মের কাহিনী শেষ হ'লো।

কেমন যেন তন্ময় হ'য়ে গিয়েছিলাম। ধাতস্থ হ'তে কিছুক্ষণ সময় লাগলো। কোনও কথাই আমার ঠোঁটে আসেনি। স্তব্ধ হয়ে অনেকক্ষণ শুধু তাকিয়ে থাকি। ম্লান হাসির ক্ষীণ রেশ উইলিয়মের ঠোঁটে ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল।

বললেন: কেন যেন সেই থেকে ড্রিঙ্কস-এ আমার বড় ভয়। অতি দুর্মূল্য পানীয়েও আজ আমার মন বিস্বাদে ভ'রে ওঠে। মদ আমি আর স্পর্শ করিনা মিঃ সেন।

বিমানের একটানা যান্ত্রিক শব্দের পরিবর্তন হ'লো। এবার সে মাটি স্পর্শ ক'রবে। পাক খেয়ে নেমে এলো অনেকটা

উইলিয়ম বলেন: বেইরুট।

সিঁড়ি বেয়ে উইলিয়মের সঙ্গে নেমে এলাম। বিমানঘাঁটীর জনশূন্য বিরাট বাড়িটি আলোয় ঝলমল ক'রছে।

ট্রানজিট্ কাউন্টারে সুন্দরী এক লেবানিজ তরুণীর হাতে আমার ছাড়পত্র জমা দিয়ে দুজনে বাড়িটির মধ্যে এসে ঢুকি।

নরম নরম দেখলাম উইলিয়মকে। সুন্দর বুদ্ধিদীপ্ত চোখদুটিতে ক্লান্তি। দৃষ্টিতে কেমন এক রিক্ততা।

জানি, উইলিয়ম একজন উচ্চমঞ্চের সাংবাদিক। কূটনৈতিক অলিগলিতে ফাটকা হয়তো তিনি ভালোই খেলেন। সংবাদ পরিবেশনের অতি সুন্দর কায়দাও ক'রেছেন রপ্ত। রোমাঞ্চকর সব খবরের সন্ধানে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে ছুটে বেড়াবেন। আজ এই দেশে, কাল হয়তো দেখা যাবে অন্য কোনোখানে। জীবনে যশ বা ঐশ্বর্য্যের কোনও অকুলানই হয়তো হবে না।

কিন্তু শান্তি? অপ্রস্তুত এই মানুষটি সে রিক্ততা ঢাকবেন কি দিয়ে। নাটকে সংশোধন চলে অক্লেশে—কিন্তু জীবনে? অতি প্রিয়জনের বিয়োগব্যথা ভোলা যায়। ব্যর্থ প্রেমের হতাশায় হয়তো কিছু সময় লাগে। কিন্তু উইলিয়ম নিজের কাছে নিজেই যে পহেলা নম্বর প্রতারক। সে প্রতারণার মাশুল তাকে সারা জীবন গুণে যেতে হবেই। সিওলের সেই সকাল, টমসনের চোখের শূন্য জিজ্ঞাসা তার ভোলা মুস্কিল। ভোলা মুস্কিল সকালের বিছানার ডায়নাকে। পরনে যার 'সারং-কেবায়া'।

জুরিখ্! প্যারী! লণ্ডন!

চারদিকের নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে মেয়েলী কণ্ঠ কানে এলো। ম্লান এক টুকরো হেসে মাথা নত ক'রে করমর্দন ক'রলেন উইলিয়াম: দীর্ঘপথ, বড় সুন্দর এলাম আপনার সঙ্গে। যাত্রা আপনার শুভ হোক।

বিদায় নিয়ে চ'লে গেলেন উইলিয়াম।

সুন্দরী তরুণী ছাড়পত্র ফিরিয়ে দিলেন। এক রকম জনশূন্য বিমান ঘাঁটীতে আলো আঁধারের মধ্যে যমদূতের মত দাঁড়িয়ে আছে বিমানটি।

সিঁড়ি বেয়ে উঠতে গিয়ে নজরে পড়লো।। বিমানঘাঁটির গায়ে বড় বড় অক্ষরে লেখা আছে—'ওয়েলকাম টু লেবানন'।

এরকম আমন্ত্রনে আমরা অভ্যস্ত নই। এরূপ কোনও কিছুই চোখে পড়েনি সাণ্টাক্রুজ্ বা দমদমে। সে স্থান দখল করেছে—বর্মা-শেল্! সেখানে দেওয়াল জুড়ে আছে 'কে. এল. এম' বা 'এয়ার ফ্রান্স'।

ব্যবহারিক সৌজন্যের বড় পরোয়া করি না আমরা। 'থ্যাঙ্ক ইউ'-য়ের লাগসই কোনও বাংলা শব্দ আছে ব'লে আমার জানা নেই। অনেক হাতড়ে খুঁজে পাওয়া যায় 'ধন্যবাদ'। কিন্তু পরিপূর্ণ পরিপূরক হলো কি? এ যেন কেমন, 'সেক্সে'র বাংলা 'যোনি'র মত শোনায়।

আবার যাত্রা স্থরু। এবার সোজা জুরিখ। আমার ঘড়ি যে সময় দিচ্ছে তাতে ভৈরোঁ ধরাও চলেনা। কলকাতায় হাইকোর্টের ট্রাম খুলে গেছে অনেকক্ষণ। কর্পোরেশনের গঙ্গাজল ছিটোনো হয়েছে পথে পথে। তাজা গরম কাগজ সাইকেলের হাতলে বসিয়ে চারদিকে ছড়িয়ে যাচ্ছে হকারে। ড্যালহৌসী-গামী ডেলি প্যাসেঞ্জারের স্নান-পর্ব শেষ হয়েছে দূরগাঁয়ে। বাসি জিলিপি আর সিঙ্গাড়ার লোভে ট্রাম লাইনের তারে ব'সে সতৃষ্ণ নয়নে দ্বারিক ঘোষের অতি পরিচিত চেনা মুখের অপেক্ষায় সারবন্দী কাকের দল তারস্বরে তাদের ব্যস্ততা জানান দিচ্ছে। পুবের ঘোলাটে আকাশ হ'য়ে উঠছে রক্তিম।

কিন্তু এখানে অবস্থা ভিন্নরূপ। যতদূর দৃষ্টি চলে চারদিকে শুধু অন্ধকার। খেয়াল হ'লো প্রাকৃতিক ভূগোলের ফেরে প'ড়ে আকাশের এ অবস্থা হয়েছে। সূর্যকে পেছনে ফেলে অনেক পশ্চিমে এগিয়ে গেছি। ভোরের এখনও অনেক দেরী এখানে।

ঘুমিয়েই পড়েছিলাম ক্লান্ত হয়ে। চোখ খুলে দেখি 'টয়লেট রুমে'র দখল নিয়ে রীতিমত ব্যস্ততা স্থরু হ'য়েছে চারদিকে। পুরুষের

চেয়ে ডবল সময় লাগছে মেয়েদের। তবু তো দাড়ি কামানো নেই। গাল কামানো হয়তো নেই কিন্তু গাল বানানো আছে। ঠোঁট আছে। গোঁফ নেই কিন্তু ভ্রূ আছে। ওজন নেই, ফাউ আছে।

মেয়েদের মধ্যেও আবার ব্যতিক্রম দেখলাম। সুন্দরী ইংরেজ তরুণীর যেখানে লাগলো ছ'মিনিট, প্রৌঢ়া ফরাসী মহিলার সেখানে তেরো মিনিট। গেলেন কাঁচামাল, ফিরে এলেন যেন রঙ্গীন মোড়কে মহার্ঘ এক 'ফিনিশ্‌ড্‌ প্রডাক্ট্‌'। ঝাড়া সতেরো মিনিটের মাথায় বেরিয়ে এলেন পাঞ্জাবী ললনা। হোসিয়ারী দোকানের সমস্ত কলাকৌশলকে আঁকড়ে ধরায় সুন্দরীর অপগত যৌবন বড় বেয়াড়া ভাবে উদ্ধত। তাতে জোর অবশ্য আছে—জলুস নেই। আঁটো বটে —খাটো নয়।

প্রাতরাশে পাঞ্জাবী ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হ'লো। সামান্য আলাপেই বুঝলাম ইনি বিপজ্জনক সাহেব। প্যারীতে চ'লেছেন। মাতুলালয়ে চলেছেন ভাগ্না জামাই।

মাতুলকে না চিনতে পারায় যেন কিছুটা অবাকই হন ভদ্রলোক। এমন বিস্ময়ে ভেঙ্গে প'ড়লেন যেন সারা জীবনের সমস্ত শিক্ষা দীক্ষাই আমার ব্যর্থ হ'য়ে গেছে। বম্বেতে আমার হামেশাই যাতায়াত, তবে মাতুলকে না চিনতে পারার কোনও কারণই যেন থাকতে পারে না।

এবড়ো খেবড়ো ভ্রূ ভেঙ্গে পড়লো ভদ্রলোকের। হেসে বলেন: হাউ ফানি! ইউ ডোণ্ট নো মাই আংকল। হি ইজ এ গ্রেট ম্যান অব বম্বে।

আরও শুনলাম সমুদ্র থেকে গেঁথে তোলা সতেরোটি বাড়ির মালিক এই যোগীন্দ্র সিং। বিশেষ একটি মার্কিণ মোটর গাড়ীর একমাত্র এজেন্ট। পাঠানকোট থেকে জম্মুতে তারই বাস নাকি আনাগোনা করে রাত্রিদিন।

কিছুটা যেন পরিষ্কার হ'লো ব্যাপারটা। একে 'গ্রেট', তারপর আবার বম্বের। তবু ভয়ে ভয়েই বলতে হয়: পারহ্যাপস্‌ ইউ আর

মিসটেকেন্‌······ইউ মিন ইয়োর আংকল ইজ এ 'বিগ' ম্যান আই প্রিজিউম ?

উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলেন ভদ্রলোক। সম্পূর্ণ বোকা বানালেন যেন। বললেন শেষেঃ ম্যাটারস্‌ লিটল্‌······বিগ মেন্‌ আর অলওয়েজ গ্রেট মেন্‌।

শুনতে হয়তো খারাপ। কিন্তু তাহা সত্য কথা। আমাদের দেশে যোগীন্দ্র সিং-দেরই তো দিন আজ। এক দৌড়ে চেম্বার অব কমার্স, ত্বহাতে টাকা ছিটিয়ে লোকসভার আসন আঁকড়ে ধরা।
ত্বদিনেই যোগীন্দ্র সিং'য়ের হয়তো 'প্ল্যানিং কমিশনে' হাত পৌঁছোবে। 'উপ' কথাটা হয়তো খারাপ কিন্তু "উপমন্ত্রী" খারাপ কিসে। যোগীন্দ্র সিং 'বিগ্‌' ম্যান্‌ তাই প্রতিপদে 'গ্রেট্‌নেস্‌' দেখা যাবেই।

জুরিখে আসা গেল। শুধু শীত নয়, বর্ষাও নেমেছে সেই সঙ্গে। মনে বল নিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসি। ভেবেছিলাম নির্ঘাত জমে যাব ঠাণ্ডাতে। বাঙালী মানুষ--ষাঁড়ের ডালনায় অভ্যস্ত নই। আকাশ অসহিষ্ণু! পুঞ্জ পুঞ্জ জল ভরা মেঘ। হিমেল কন কনে ঠাণ্ডা বাতাস। কিন্তু মর্মান্তিক কিছু মনে হ'লো না। শীতের শেষরাতে বহরমপুর স্টেশন থেকে সাইকেল রিক্সায় লালদীঘি যেতে যেন কিছু বেশীই কাতর ক'রেছিল আমাকে। ইয়োরোপের শীত সম্পর্কে যেন কিছু অতিভঙ্গিই আছে আমাদের দেশে।

দরজার সামনে এসে দেখি মাটিতে দাঁড়িয়ে লাল ছাতার স্তূপ হাতে নিয়ে ত্বপাশে ত্বই সুন্দরী। যাত্রীদের হাতে হাতে তুলে দিচ্ছে ছাতা। লালছাতার এক সুন্দর প্রসেশন্‌ যেন এগিয়ে চ'লেছে সামনে।

একজন খর্বকায় ভদ্রলোক তারস্বরে চীৎকার করছেনঃ হের জেন্‌! হের জেন্‌!

সুইট্‌জারল্যাণ্ডে প্রধানতঃ ত্বটি ভাষা। পুবে জর্মন, পশ্চিমে ফ্রেঞ্চ। জুরিখে জর্মন, জীনিভায় ফ্রেঞ্চ। এখানে চক্রবর্ত্তী হয়

সাক্রাবাটি, মিঃ দত্ত এদের ঠোঁটে দাঁড়ায় হের ড্যুত্। ঠিক সেই খাতিরেই আমি রূপান্তরিত হ'য়েছি হের জেনে।

নিজের উপস্থিতি হাত তুলে জানান দিলাম। আমার গায়ের চামড়ার হাল দেখে সাদা ইংরেজীতে কথা বললেন ভদ্রলোক। একটি খাম হাতে তুলে দিয়ে বিদায় নিলেন। 'এয়ার ইণ্ডিয়া'র জুরিখ অফিস লিখেছেন, আমার মিউনিকের প্যাসেজ আছে বিকেলের প্লেনে। চিঠির সঙ্গে পিনে লটকানো টিকিট—'বানহোফে' ব্যবস্থা থাকবে লাঞ্চের।

কিন্তু বুকিং অফিস আমাকে হতাশ করলে। ঠাঁই নেই! বিকেলের বিমানে কোনও জায়গা নেই। কাল সকালের আগে কিছু করাই তাঁদের সম্ভব নয়। তবে এক্ষুনি একটি বিমান যাবে মিউনিকেই। আপত্তি না থাকলে তাতে স্থান ক'রে দেওয়া অসম্ভব নয়।

চুপ্‌সে যাওয়া বেলুন যেন হাওয়ায় ভ'রে ওঠে। এই মুহূর্তে জুরিখের নেশা আমার নেই। হেঁকে জানান দিলাম ঃ কুচপরোয়া নেহি, উসিমে দিজিয়ে।

জুরিখ থেকে মিউনিক। ঘণ্টাখানেকের পথ। কলকাতা থেকে বাগডোগরা নয়—বালুর ঘাট। পরতে পরতে মেঘ। মাথার ওপর সূর্য কোথায় ?- পায়ের তলায় আল্‌প্‌সের চিহ্নমাত্র নেই।

ছিপছিপে, লম্বাটে এক সুইশ তরুনী অতি সুন্দর দেহবিভ্রমে সামনে পেছনে ঘুরছেন। ভারসাম্য বজায় রেখে কফি তুলে দিচ্ছেন হাতে হাতে।

মিউনিকের আকাশও সহিষ্ণু নয়। এখানেও বৃষ্টি আর লালছাতা। সেই সঙ্গে শুল্ক বিভাগ।

আপত্তিকর কিছু না থাকলেও শুল্ক বিভাগ সম্পর্কে কেন জানি না আমার মারাত্মক এক ভীতি ছিল। এখন দেখলাম আমার ভয় সম্পূর্ণ অমূলক। আমার স্যুটকেশ দেখলাম তছনছ হ'লো না। চোখেও

কোনও বাজপাখীর দৃষ্টি নেই। কি পরিমান কি মুদ্রা আমার পকেটে আছে শুধু প্রশ্ন করলেন। ব্যাগ খুলে যাচাই করবার কোনও প্রয়োজনই বোধ করলেন না কেউ।

দু'মিনিটেই কার্য সমাধা হলো। 'গুটেন্‌টাক' 'ভিডারজেহেন' বলে-টলে ছেড়ে দিলেন।

হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম যেন। বিমানঘাঁটীর টেলিফোন হাতের কাছেই পাওয়া গেল। অফিসের ঠিকানা খুঁজে পেতেও দেরী হ'লো না। তারস্বরে জানান দিলাম ঃ অয়ময়ং ভো!

জবাব এলো ঃ তিষ্ঠ ক্ষনকাল!

মিনিট পনেরো'র মধ্যেই এক ভদ্রলোক সুন্দর এক 'ওপেল ক্যাপিটেন' নিয়ে হাজির হ'লেন। ধবধবে দাঁতে হাসির ঝিলিক লাগিয়ে আমায় অভ্যর্থনা ক'রে বললেন ঃ শীঘ্রই গাড়ীতে চাপুন, ট্রেনের আর বিলম্ব নেই হের জেন।

এক হাতে আমার ভারী সুটকেশটি স্বচ্ছন্দে গাড়ীতে তুলে নিলেন।

সারা পথ আপন মনেই বক বক ক'রে গেলেন ভদ্রলোক ঃ মিউনিকে শীত নেই...ডিরেক্টর গেছেন শিকাগো। আমার পৌছোনোর সংবাদ নিউরেমবার্গের অফিসকে জানান হ'য়েছে। ইত্যাদি।

রেলওয়ে স্টেশন!

কুলি কাপাটির বালাই নেই স্টেশনে। আমার বিশাল সুটকেশটি একাই টেনে নিয়ে চললেন ভদ্রলোক। 'করেন কি' 'করেন কি' বলে হাঁ হাঁ ক'রে উঠলাম আমি। কিন্তু ভদ্রলোক গ্রাহ্য করলেন না আমার কথা। একটি প্রথম শ্রেনীর টিকিট কিনে একরকম টানতে টানতে নিয়ে চলেন আমাকে।

শীতের দেশ। তবু স্টেশনের মাথার ওপর কোনও ছাত নেই। যথেষ্ট পরিষ্কার। অতিশয় পরিচ্ছন্ন। হাওড়া স্টেশনের মত নয়—বম্বের ভি.টি.র সঙ্গে হয়তো কিছু তুলনা মেলে।

ফেরিওয়ালার উৎপাত নেই স্টেশনে। 'চা-গ্রাম', 'চাই পান', বা 'সিক্রেট' ধ্বনি কানে এল না।

ভদ্রলোক অভয় দেন আমাকে। ফকফকে সাদা দাঁতে হেসে বলেন : কারখানার গাড়ী আপনাকে নিতে আসবে স্টেশনে!

গাড়ী ছেড়ে দেবার সময় হ'লো। হাত নেড়ে বিদায় জানালেন আমাকে।

কৃতজ্ঞতায় নুয়ে আসে মাথা। মুখে বলি : ফিলেন ডাঙ্ক্।

সুন্দর হাসি ভেঙ্গে পড়েছে ভদ্রলোকের ঠোঁটে। মনে হ'লো কত দীর্ঘদিনের চেনা। কতকালের প'রিচয় আমার সঙ্গে।

দুলে উঠলো ট্রেন। আমার আর একবার : ফিলেনডাঙ্ক্! ভদ্রলোকের আর এক পশলা : গুটে রাইজে!

বৈদ্যুতিক ট্রেন। কামরার একধার দিয়ে করিডোর। পাশাপাশি অনেক কামরা। একটি কামরায় ছ'জনের বসবার ব্যবস্থা। তিনজন ক'রে মুখোমুখি।

আমার কামরায় এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক। সঙ্গে তাঁর স্ত্রী। করি-ডোরের মধ্যে দিয়ে ফেরিওয়ালারা ট্রলি ঠেলে নিয়ে চ'লেছে। কফি, রুটি, মাখন আর চকোলেট! এমন কি কোকা কোলা-ও।

সিগারেট ধরিয়ে জুত হ'য়ে ব'সতে গিয়ে বাধা পেলাম। কামরার এক প্রান্তের দেওয়ালে চোখ প'ড়তেই গোটা গোটা অক্ষর নজরে প'ড়লো : 'নিষ্ট রাউখেন'! অর্থাৎ ধূমপান নিষেধ!

এ রকম নির্দেশ আমার দেশেও। ট্রেনে নয় কলকাতার ট্রামে-বাসেই। ট্রেনের কামরায় বাধ্যতামূলক অনুশাসন আমার চোখে প'ড়েছে ব'লে মনে হ'লো না।

সিগারেট আবার কেসে ফিরিয়ে নিলাম। বেশ ঠাণ্ডা বাতাস। টিপ্ টিপ্ বৃষ্টি প'ড়ছে বাইরে।

নীচু পর্দ্দায় বৃদ্ধ ভদ্রলোক স্ত্রীর সঙ্গে কি এক বিশেষ আলোচনায় ডুবে গেলেন। আমিও ক্লান্ত। মাথাটা ভারি মনে হচ্ছে। আকাশের

একটানা যান্ত্রিক আওয়াজ যেন কানে এখনও লেগে আছে। সারা দেহে এক অবসাদ নেমে আসে।

নিউরেমবার্গ!

সামনের বৃদ্ধ ভদ্রলোক সস্ত্রীক জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে আমার জন্যে ব্যস্ত হ'য়ে উঠলেন। সুটকেশের বহর দেখে চেঁচিয়ে ডাকতে সুরু করলেন : গেপেক্‌ট্রেগার! গেপেক্‌ট্রেগার!

কিন্তু কোথায় কুলি। সারা চত্বরে গে-পেক্‌ট্রেগারের চিহ্নমাত্র নেই।

লজ্জিত হ'তে হয় আমাকে। হেসে বলি : আমার সুটকেশ আমি নিজেই বহন করবো। আপনারা ব্যস্ত হচ্ছেন শুধু শুধু।

কিন্তু কে কার কথা শোনে। জানালা দিয়ে ঝুঁকে প'ড়ে বাঁ হাতে চশমা ঠিক ক'রতে ক'রতে হেঁকে চললেন ভদ্রলোক : গেপেক্‌ট্রেগার!

একজন জুটলো অবশেষে। আমার আগা পাস্তালা দেখে নিল আগন্তুক। গলার স্বর গম্ভীর। কিছুটা নির্লিপ্ত কণ্ঠে জানালো : আইনে মার্ক সোয়ানসিক্।

বলে কি? সে যে প্রায় দেড়টাকার ধাক্কা।

কিন্তু এটা হাওড়া নয়—নিউরেমবার্গ। বাঙালা দেশ নয়—জর্মনি। খুশী হ'তে চেষ্টা করি : তথাস্তু!

সাধে কি নিজের মাল নিজে বয় এদেশে।

আসন ছেড়ে উঠতে গিয়ে নজরে প'ড়লো। আমার ঠিক পেছনেই ছোট একটি কেবিন। এতক্ষন নজরেই আসেনি জায়গাটা। এক-মুখো পাল্লাটা খোলা। কি ভেবে সেটি সামনে টানতেই সজোরে সশব্দে এসে বন্ধ হ'য়ে গেল। পাল্লায় লেখা নির্দেশ দেখে বেকুব বনতে হ'লো। ধূমপানের আলাদা কামরার কথা ভাবতেই পারিনি আমি।

কালো রঙে গোটা গোটা হরফে লেখা : রাউখেন্।

পাওসিওন !

রাস্তার কোল ঘেঁষে আড়াইতলা বাড়ি। টালির হেলানো ছাদ। দোতলার বারান্দায় দাঁড়ালে নিউরেমবার্গ শহরের অনেকটা চোখে পড়ে। দূরে ফুয়ের্থ—কারখানার চিমনির ধোঁয়ার বাদামী রেশ।

এখানকার কারখানার বড়কর্ত্তার সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল আগে থেকেই। আলাপ হ'য়েছিল কলকাতাতে। ছ'একটি বিভাগে টাকা আমদানী রপ্তানীর ঘোরতর অসামঞ্জস্য লক্ষ্য ক'রে ছাঁটাইয়ের খড়্গ উঁচিয়ে কিছুদিন আগে কলকাতা আর বম্বে ঘুরে গেছেন।

অতিশয় সদালাপী। হাসি হাসি মুখখানি দেখে কিছুটা বোকা বোকা ভালো মানুষ মনে হ'য়েছিল। অমায়িক সন্দেহ নেই, কিন্তু বুদ্ধি যেন দেখলাম গিজগিজ ক'রছে মাথাতে। চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলেন। কারো সম্পর্কে ওনার মনে যখন সর্বনাশের আড়বাঁশী বেজে ওঠে, নতুন ওঠা পৌষমাসের নলেন গুড়ের হাসি তখন ঠোঁটে কিন্তু লেগেই থাকে।

মোটা মাইনের বুকটান করা মাথাভারী লোকগুলো দেখলাম নাড়াখেলো বেশী। আশাতীত রকমের অদলবদল করলেন নিজের ইচ্ছে মত।

দিল্লীর সরকারী দপ্তরখানায় পাঞ্জাবীদের অখণ্ড প্রতাপ লক্ষ্য ক'রে বুঝলেন, কাজ হাসিল ক'রতে হ'লে সাদা চামড়ায় কুলোবে না। এঞ্জিনীয়ারের যোগ্যতার চেয়ে রাজনৈতিক দক্ষতার এখানে প্রয়োজন। বড়দিনের ভেটের টুকরীতে হবে না কিছুতেই। পালাপার্বনে তাদের সঙ্গে নাচানাচি করতে হবে। ওড়নাওয়ালীর সোফার হাতলে ব'সে তাস বাছাবাছিতে সাহায্য ক'রতে হবে। 'অশোক হোটেলে'র করিডরে বেমক্কা দেখা হ'য়ে যাবার 'সিচুয়েশন' তৈরী করতে হবে হপ্তা ধরে।

সাদা চামড়া নির্বাসিত হ'লেন টোকিও'তে। এক গুরুদয়াল সিং গ্রেবাল সমাসীন হ'লেন সে আসনে।

আমাকে ডেকে কিছুমাত্র ভনিতা না ক'রে একটা ফিন্‌ফিনে টাইপ করা কাগজে চোখ রেখে সোজা প্রশ্ন করলেন : আপনি নাকি অন্যত্র চাকরীর চেষ্টা করছেন ?

তৈরী হ'য়েই গিয়েছিলাম। জবাবে বলেছি : সম্পূর্ণ সত্যি কথা। অফিসকে জানিয়েই সব করেছি। অমুক অফিস আমাকে চাইছে। তমুক কোম্পানী আমার এত দর দিচ্ছে, ইত্যাদি।

গুম হ'য়ে রইলেন কিছুক্ষন। তারপর বলেন : সামনের শীতেই আপনাকে আমরা জর্মনিতে পাঠাবো।

সামান্য হেসে বলেছি : তাতে আমার সুরাহা কতটা ?

জবাব এলো : কোম্পানীর স্বার্থও আপনার দেখা দরকার।

দ্রুত জবাব আমার ঠোঁটে এসেছে : কোম্পানীর স্বার্থ আমি দেখে থাকি। আর ঠিক সেই খাতিরেই সামনের শীতে জর্মনি যাবার ইচ্ছে আমার নেই। শীতের শেষেই বছরের সবচেয়ে বেশী কাজের তাড়া। কোম্পানীর স্বার্থের খাতিরেই আপনাকে এ কথা ভেবে দেখতে বলবো।

আমার কথাটা যেন ঠিক গিলতে পারলেন না ভদ্রলোক। কলকাতার অফিসের বড় সাহেব ছিলেন ধারের কাছেই। তার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাতেই তিনি বললেন : মিঃ সেন ঠিকই বলেছেন। সরকারি হিসেবে বছরের সুরু এদেশে এপ্রিলে--মার্চে শেষ। এ দেশের সরকারই আমাদের সবচেয়ে বড় খরিদ্দার। জানুয়ারী থেকে মার্চেই তাদের কেনাকাটার ধূম। শীতকালে মিঃ সেনকে ভারতের বাইরে পাঠানো ঠিক হবে না।

আমার আগাপাস্তলা এক নজর ক্ষিপ্রতার সঙ্গে দেখে নিলেন ভদ্রলোক। তারপর সামান্য হাসি হেসে বললেন : আপনার কথা আমার মনে থাকবে। আমাকে ভাবতে দিন। চট ক'রে আপনি কিছু না ক'রে ব'সলে আমি খুশী হবো।

পরদিন আবার ডাক প'ড়লো। বললেন ঃ আপনি জর্মন জানেন?

জবাব দিয়েছি ঃ সামান্যই। কাজ চালাতে পারি! ঝগড়া ক'রতে পারি না।

উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলেন ভদ্রলোক। একেবারে হো হো ক'রে। বললেন ঃ আমার সঙ্গে তর্ক ক'রবেন আপনি? আপনার সাহস তো কম নয়!

হেসেছি আমিও। তবে আমার হাসি ঠোঁটের। আর ওনার হাসি গলার।

হাসি সামলে বললেন ঃ আপনার কাজের খুব একটা অসুবিধা না হ'লে দয়া ক'রে সঙ্গে আসবেন আমার? 'কালকুটা-টা দেখতে চাই।

ভদ্রলোককে সারাদিন ধ'রে কলকাতা দেখালাম সেদিন। কালীঘাট থেকে সুরু। কেওড়াতলা শ্মশান ঘাট, পরেশনাথের মন্দির, আলিপুরের কেতাব মহল আর জন্তু জানোয়ার। দিন শেষ হ'লো শিবপুর বাগানে।

'গ্রেট ইস্টার্ণে' নামিয়ে দিয়েই চলে আসছিলাম। কোটের আস্তিন ধ'রে বললেন ঃ পালাবেন না! আসুন আমার সঙ্গে।

কামরায় এসে রিসিভার হাতে তুলে দিয়ে বললেন ঃ আপনার বাড়িতে ফোন করুন। জানিয়ে দিন ডিনার আপনি আমার এখানেই সেরে যাবেন।

অনেক গল্প করলেন আমার সঙ্গে। তবে অফিস বা কারখানা সম্পর্কে কোনও কথা নয়। আজেবাজে বেহিসাবী দেশ-বিদেশের নানা কথা।

রাত করেই বাড়ি ফিরেছি সেদিন। পরদিন উনি চলে গেলেন বম্বেতে।

এদেশে এসে আমার অবশ্য জলে পড়বার কথা নয়। তবে ওনার কিছুটা পক্ষপাতিত্বে আমার সুরাহা হ'য়েছে অনেক। অবশ্য দেখা হ'লে সহস্র যোজন দূরে রেখেই কথা বলতেন। তবে এটুকু বুঝেছি মশলা

বর্জিত আহার ছাড়া আমার অন্য কোনও কিছুতে সামান্য অসুবিধেও তিনি হ'তে দেবেন না। এখানে আমি ভালোই আছি।

পাঙসিওন ঠিক হোটেল নয়, মেস-ও নয়। অনেকটা যেন বোর্ডিং হাউসের রকমফের। তবে কলকাতার 'মহামায়া বোর্ডিং হাউসে'র সঙ্গে এর তুলনাই চলে না।

এখানে গভীর রাতে কারো সুগন্ধি তেল মাথায় মাখবার জন্যে জেগে বসে নেই কোনও অবিনাশবাবু। স্ত্রীর পত্র অন্য কারো বাগিয়ে পড়ে ফেলবার আশঙ্কা নেই। সুযোগ বুঝে তেতালার চিলে কোঠায় উড়িয়া ঠাকুরের কাছে বড় মাছের টুকরো পাতে দেবার গোপন অনুরোধ জানাবার প্রশ্নই ওঠে না।

এ কোনও কিছুর সুযোগ নেই পাঙসিওনে। লাঞ্চ বা ডিনারের নাম গন্ধ নেই। ব্রেক্‌ফাস্টের চিহ্নমাত্র নেই এখানে।

মাঝারী গড়নের ঘর। পরিষ্কার ঝকঝকে। প্রয়োজনীয় আসবাব আছে ঘরে। মেঝেতে কার্পেট আছে। বিছানাও। লেপে তূলো ভরা নয় নরম পালকের পুর দেওয়া।

পাঙসিওনে গৃহকর্তা নেই—গৃহকর্ত্রী আছেন।

মাঝবয়সী এক বিধবা মহিলা সব কিছুর মালিক। সকলের সুখ সুবিধের ওপর কড়া নজর। কোনও কিছু বলবার আগেই হাতের কাছে। কোনও কিছু ভাববার আগেই উপস্থিত।

মুস্কিল হয়েছে রসনা নিয়ে। আমরা যেমন চা খাই এরা দেখলাম কফিতেই অভ্যস্ত হয়েছে বেশী। চা বানানোর ছিরি দেখলে পায়ের তলা থেকে মাথা পর্যন্ত রি রি ক'রে ওঠে। কলকাতা হ'লে কিছু একটা করা যেত, কিন্তু চল্লিশ ফেনিগ্‌ দাম কবুল ক'রে রেস্তরাঁ ছেড়ে মানে মানে সরে পড়া ছাড়া উপায় নেই এখানে।

সকালে তাই কফিই মেনে নিয়েছি। সেই সঙ্গে মাখন বা জ্যাম মাখানো ব্রোয়েট্‌চেন্‌। সোজা কারখানা। দুপুরের লাঞ্চ স্নিৎসেল্‌ আর আলু। সেইসঙ্গে প্রচুর পরিমানে স্যালাড। প্রয়োজনে আরও

এক প্লেট ফিফারলিঙ্গেন্। রাত্রে কিছুটা সিঙ্কেন, সেই সঙ্গে ব্রোয়েট্-চেন্। কচি বীয়ার দিয়েই ক'রতে হয় দিন শেষ।

স্বাদ বলে কোনও পদার্থ নেই স্নিৎসেলে। ঝালের নাম গন্ধ নেই। মাংসের কাটলেটে পেঁয়াজ নেই। পেঁয়াজ ছাড়া মাংসের কোনও কিছু ভাবতেই পারি না আমরা। এ যেন রবিশঙ্করের সেতার আছে—অনিবার্য কারণে কেরামৎউল্লা অনুপস্থিত। ভোর বেলাতে ভৈরোঁ না থাকলে কি যায়-আসে। কিন্তু ভৈরোঁতে যদি ভোর না থাকে, তাহ'লে?

শনিবার। ছুটির দিন ছিল আজ। অফুরন্ত অবসর। শুয়ে ব'সে দিন গেছে। বই প'ড়ে বা না প'ড়ে সারাটা দিন গড়িয়ে গেল। সন্ধ্যেতে এক চক্কর ঘুরে আসবো ভাবছিলাম কিন্তু এসে হাজির হ'লেন হের টলার।

অল্পদিনেই বেশ জমে উঠেছে ভদ্রলোকের সঙ্গে। রেস্তরাঁর সামান্য পরিচয় বেয়ে অতি সহজ ভাবেই তিনি এসে উঠেছেন আমার কামরায়।

আমার কোনও কাজে লাগলে নিতান্তই খুশী হন ভদ্রলোক। তাঁর পরামর্শ না নিয়ে কিছু কেনাকাটা ক'রলে দেখলাম খুশী হন না। 'ঠাণ্ডা ডিনার' ছুঁতে আমাকে পই পই ক'রে বারণ ক'রেছেন। ব'লেছেন, আমার নাকি একেবারেই অভ্যাস নেই। বেমক্কা অসুখে প'ড়ে যাব। শুক্রবার ছাড়া মাছ খেতে বারণ ক'রে বলেছেন, ক্যাথলিক্রা শুক্রবার মাংস খায় না। তাই এখানকার হাটে, বাজারে, হোটলে বা রেস্তরাঁয় ঐ একদিনই নাকি তাজা মাছ পাওয়া যায়। ঐদিনই শুধু বাসির ভয় নেই।

হের টলার প্রৌঢ়। ভারী গড়নের চেহারা। মাথায় টাক অনেকখানি। হাসতে পারেন খুব। খাটতে পারেন অসুরের মতন।

হের টলার এখানকার স্থানীয় লোক নন। ফ্রাঙ্ক্ফুটের দক্ষিনে হানাউ-য়ের অধিবাসী। চাকরীর খাতিরে আসতে হয়েছে ফুয়েৰ্থে। কর্মস্থল গ্রুণ্ডিগের কারখানা।

ওঁর মুখে গ্রুণ্ডিগের গল্প শুনে আমি তাজ্জব বনে গেছি।

লড়াইয়ের আগে গ্রুণ্ডিগ রেডিও মেরামত ক'রতেন। ভালো কাজের খাতিরে পরিচিত পরিবেশে সুনামই ছিল তাঁর।

হঠাৎ একদিন ডাক এলো। রেডিও-র যন্ত্রপাতি ফেলে গ্রুণ্ডিগ গেলেন যুদ্ধে। কোথায় ঘুরেছেন তিনি ? প্যারী, ইউক্রেন না গ্রীসে ! সঠিক তথ্য আমার শোনা নেই। কিন্তু দিন যায়। ভয়াবহ যুদ্ধের শেষে গ্রুণ্ডিগ ফিরে এলেন দেশে।

রণক্লান্ত সৈনিক দেশে ফিরে এলেন। চারিদিক শুধু হতাশা। শুধু প্রশ্ন। উত্তর নেই কোথাও ! নতুন মানুষের ভীড়ে চেনা মুখ সব হারিয়ে গেছে। মানুষ আছে, ঘর নেই। ঘর যেখানে বা আছে, জীবনের চিহ্নমাত্র নেই সেখানে।

কিছুদিন যেন বোবায় পেয়েছিলো গ্রুণ্ডিগের। তারপর নতুন ক'রে রেডিও-র তার হাতে তুলে নিলেন।

বহুদিনের অবহেলায় যন্ত্রপাতিগুলো শুধু গোলমাল করে না, নিজের আঙুলগুলোর ওপর কেমন যেন সন্দেহ হয়। মাথাটাও যেন আগের মত খোলতাই হয় না। তবে হাতের কাজের মানুষ। আঙুল গুলো শাসনে তাকে আনতেই হয়। মাথা কাজ না ক'রলে চ'লবে কেন ?

দিন যায়। শীত আসে। বছর ঘুরে আসে এমনি ক'রে।

কোন ওদিকে তাকানোর সময় ছিল না গ্রুণ্ডিগের। ক্লান্তিহীন একটানা পরিশ্রম ক'রে গেছেন অদম্য এক উৎসাহে।

রেডিও-র সেট্ বিক্রী হ'তে লাগলো। লোকের মুখে গ্রুণ্ডিগের কাজের প্রশংসা শোনা গেল। উদয়াস্ত পরিশ্রম ক'রেও খদ্দের সামাল দেওয়া দুষ্কর হ'য়ে উঠলো। দরকার প'ড়লো সহকারীর। তাতেও কুলোলো না। রাখতে হ'লো কিছু কর্মচারী। বাঁধা মাইনেতে মেকানিক কয়েকটি বহাল করা হ'লো।

গ্রুণ্ডিগের নাম ছড়িয়ে প'ড়লো চারদিকে। নিয়োগ করতে হয়

কয়েকজন এঞ্জিনীয়ার। নতুন প্রচেষ্টা স্থুরু হলো তখন থেকেই। টেপ্ রেকর্ডার বানানো স্থুরু হ'লো। হাত প'ড়লো টি. ভি সেটে।

উন্নতির সোপানে সোপানে এগিয়ে গেলেন গ্রুণ্ডিগ্। সৌভাগ্যের দরজা তখন পরিপূর্ণ উন্মুক্ত। অর্থ, যশ আর প্রতিপত্তি এই মানুষটিকে যেন ক-বছরে দুর্ব্বার বেগে ধাওয়া করে নিয়ে গেছে।

গ্রুণ্ডিগের কারখানার টেপ্ রেকর্ডার আজ শুধু জর্মনির নয়, দেশে বিদেশের দোকানে দোকানে অক্লেশে জায়গা ক'রে নিয়েছে। দুর্ধর্ষ ইংরেজ ও আমেরিকান কোম্পানীরা গ্রুণ্ডিগের কারখানাকে ভয় পায়। পৃথিবীর দোকানে পশারে গ্রুণ্ডিগ-কে তারা এক শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে জানে। গ্রুণ্ডিগের টেপ রেকর্ডার ধর্মতলার 'সি. সি. সাহা'র দোকানে দেখে এসেছি এই সেদিন।

আজও গ্রুণ্ডিগ কারখানায় আসেন। কাজ দেখেন। দরকার পড়লে হাত-ও লাগান। দেশ বিদেশের বহু ছাত্র তাঁর কারখানায় আজ শিখতে আসে।

কার সঙ্গে তুলনা দেব গ্রুণ্ডিগের? ডালমিয়া না মুন্দ্রা? এ রকম কোনও চরিত্রের সন্ধান আমার দেশে পাওয়া দুষ্কর।

আমার দেশে আজ শুধু ফাটকা আর কালোবাজার। সেখানে বাণিজ্য নেই, কারবার আছে। লাভ নেই, মুনাফা আছে। ব্যাবসাতে কোনও দরকারই নেই গণিতের। বেসাতিতে আজ প্রয়োজন শুধু গণিকার।

তবে আমার মনে হয় গ্রুণ্ডিগ কোনও বিচ্ছিন্ন চরিত্র নয়। এ জাতের ধারাই এই। এরূপ বহু চরিত্র টুকরো টুকরো হ'য়ে ছড়িয়ে আছে এদেশের নানাস্থানে। ধ্বসে পড়া একটি দেশ, পরাজিত এক জাতি তা না হ'লে এত শীঘ্রই আবার মাথা তুলে দাঁড়াতে শিখছে কি ক'রে?

অন্য দেশের, অন্য ধাতুর মানুষ আমি। গ্রুণ্ডিগের জীবন কাহিনীতে আমার তাজ্জব হওয়া অবশ্য দোষের নয়।

যুদ্ধে যাননি হের টলার।

অবাকই হ'য়েছিলাম প্রথমে। পরে শুনলাম ছোট বেলায় এক দুর্ঘটনায় মাথায় আঘাত পান। যুদ্ধের সুরুতেও তিনি ছিলেন রোগশয্যায়। তার সুযোগ নিয়ে সৈন্যদলে ভার্ত্তি হওয়া থেকে রেহাই পেয়েছিলেন। হানাউতেই নিজের বাড়িতে যুদ্ধের ভয়ঙ্কর দিনগুলো কাটিয়ে দিয়েছিলেন। দুবার তাঁকে গেষ্টাপো ধ'রে নিয়ে গিয়েছিলো। কোনও কিছু না পাওয়ায় ছাড়া পেয়েছেন দুবারই।

যুদ্ধের শেষের দিকে সকলেই আতঙ্কে অধীর। একদিকে মার্কিন ও ইংরেজ বাহিনী। অন্যদিকে রুশ সৈন্য জর্মনির দিকে ঢুকে প'ড়ছে। প্রত্যহ সাইরেন। সারারাত একটানা বোমাবর্ষন।

হানাউ-য়ের ছোট্ট জর্মন সৈন্য বাহিনীর কর্তাকে জিজ্ঞাসা ক'রলেন হের টলার ঃ আর কতদূর ?

জবাব এলো ঃ অনেকদূর !

রাতে যথারীতি বাড়ির নীচে 'সেলারে' বিছানা ক'রে সকলে ঘুমোবার চেষ্টা ক'রছিলেন। গভীর রাতে কি জানি কেন ঘুম ভেঙ্গে যায়। দরজা খুলে ওপরে উঠে এসে রাস্তায় বেরুলেন তিনি।

চারিদিক নিস্তব্ধ। দুর্ভেদ্য অন্ধকারে নিজের হাত পর্যন্ত দেখা যায় না। হঠাৎ শোনা গেল বোমারু বিমানের অতি পরিচিত গোঙানী। কিন্তু আশ্চর্য, সেদিন হানাউ শহরে সাইরেন ধ্বনি বাজলো না। নিশ্চিন্ত ঘুমে সাধারণ মানুষে জানতে পারলে না কি ক'রে কখন তাদের নিয়ে অতলে তলিয়ে গেল তাদের বাড়ি ঘর।

টলার ছুটতে ছুটতে আশ্রয় নিলেন সেলারে। জাগিয়ে দিলেন সকলকে। তিনি আর তাঁর স্ত্রী বাচ্চা ছেলেমেয়েকে বুকে আঁকড়ে ধ'রে মৃত্যুর অপেক্ষা ক'রতে লাগলেন। মুহুর্মুহুঃ বিস্ফোরণ! তারপরই অজস্র ইঁট কাঠ আর পাথরের শব্দ। তাণ্ডব চ'ললো অনেকক্ষন।

তারপর কোনও এক সময়ে বন্ধ হ'য়ে গেল বিস্ফোরণ। পায়ের

নীচের মাটি আর তখন দুলছে না। কিন্তু বাইরে আওয়াজ আছে একটানা। যেন তুফান চ'লেছে বাইরে। টলার কোনও রকমে দরজা খুলে বেরুলেন পথে।

বাড়ির অর্ধেকটা ধ্বসে গেছে। বাকিটা দাউ দাউ ক'রে জ্বলছে। জ্বলছে গোটা হানাউ। চারিদিক আলোয় আলোময়।

কাঠ পুড়ছে আর ফাটছে। জ্বলতে জ্বলতে ধ্বসে প'ড়ছে বাড়িগুলো। আর সমস্ত শব্দ, বিস্ফোরণ ছাপিয়ে উঠছে শিশু আর মায়েদের কান্না। আহতের আর্ত্তনাদ।

চারদিক থেকে হাওয়া ছুটে আসছে আগুনের দিকে। উড়ছে ঘরের চাল, চেয়ার টেবিলের টুকরো। জামা কাপড় আর বিছানা টুকরো টুকরো হ'য়ে ঝড়ের মুখে উড়ে বেড়াচ্ছে।

পথ অবরুদ্ধ! ভয়ঙ্কর।

টলার বুঝলেন, এ নরককুণ্ডে বাঁচবার একমাত্র জায়গা হানাউ-য়ের পার্ক। একমাত্র খোলা জায়গা যেখানে আগুন লাগবার ভয় নেই।

এক এক ক'রে টলার আশী বছরের বৃদ্ধা মাকে, স্ত্রী ও ছেলে মেয়েদের ব'য়ে নিয়ে পার্কে পৌঁছোলেন। মৃত ও অর্ধমৃত প্রিয়জনের দেহ বহন ক'রে আনছেন অন্যরা।

হের টলার হেসে বলেন: ভগবান বিশ্বাস কর হের জেন? আমি করি—গোঁড়া রোমান ক্যাথলিক আমি। শুনেছি, বিপদে প'ড়লে মানুষ ভগবানকে ডাকে। বলে, হে ভগবান! রক্ষা কর! কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যেও আমি ভগবানকে স্মরণ ক'রেছি বলে মনে পড়ে না। শুধু মনে হয়েছে, এতো হবেই। যেদিন জর্মনি সারা পৃথিবীর বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষনা ক'রেছে, সেদিনই আমি জানি তার পরিনতি।

পঁচিশে মার্চ বোধ হয় হানাউ দখল ক'রলে আমেরিকান সৈন্যেরা। দখল ঠিক নয়। কারণ একটি জর্মন সেনাও সেদিন হানাউতে উপস্থিত ছিল না।

আমি বললাম: তারপর!

প্রৌঢ় হের টলার ম্লান হাসেন। বলেন: সব কিছু গিয়েছিল আমার নিঃশেষ হ'য়ে। ঘর নেই, বাড়ি নেই! এক টুকরো রুটীরও কোন হদিস নেই। বাঁচবার কিছুমাত্র ইচ্ছা ছিল না আমার। ধ্বংস স্তূপ আর ধ্বংস স্তূপ। রিক্ত মানুষের একই প্রশ্ন—খাবো কি? কোনও কিছুই মাথায় আসতো না তখন। তবু বাঁচতে হয়।

কয়েক মুহূর্ত থামলেন। সুরু করলেন আবার: অনেক ক্ষোভে ব'লেছিলাম স্ত্রীকে, কিছুমাত্র দরকার নেই ঘরবাড়ির। এ সবের কোনও মূল্যই নেই জীবনে। যুদ্ধ শেষ হবার অনেক বছর পরেও তাই আমাদের ঘরের জানলায় মলিন কাপড়ের পর্দ্দা, ভাড়া করা আধপোড়া খাট, বার্নিস ওঠা টেবিল চেয়ার! কিন্তু মানুষের মন অদ্ভুত। আমার স্ত্রী একদিন বলে: এ'রকম ক'রে জীবন চলে না। মানুষ এভাবে বাঁচতে পারে না। নতুন ক'রে আমাদের আবার ক'রতে হবে সব কিছু।

তারপর সাশ্রয় শুরু হ'লো। খাওয়ার খরচ কেটে কুটে পয়সা জমানো চ'ললো। উদয়াস্ত খাটতে হ'লো নতুন ক'রে সব গড়ে তুলতে গিয়ে। আজ শুধু আমার বাড়ি নয়, নতুন নতুন বাড়িতে ভরে গেছে হানাউ। আগের হানাউকে চেনাই যায় না আজ। কি দুঃস্বপ্ন, কি দুর্দিন গেছে, আজ ভাবলে আমার গা শিউরে ওঠে হের জেন!

কথায় কথায় রাত হ'য়েছিল বেশ। হের টলারকে সিঁড়ির বাঁক পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এলাম।

বাইরে বেশ ঠাণ্ডা। পথে লোকজন সামান্যই। আকাশ পরিষ্কার। বারান্দায় এসে দাঁড়াই। দু'হাত কোটের পকেটে, ঘাড় কিছু নোয়ানো। হের টলার পুবমুখো তাঁর গাড়ীর দিকে দ্রুত হেঁটে চলেছেন।

শহরের অনেকটা আদল আসে বারান্দা থেকে।

নিউরেমবার্গ ও ফুয়ের্থ মিলিয়ে যেন লক্ষ্ণৌ। বেনারস নয়!

শহর ছড়িয়ে নেই এলাহাবাদের মত। যুদ্ধের পর ধ্বংসস্তূপের মধ্য থেকে নতুন ভাবে গড়ে উঠেছে বাড়ি। গড়ে উঠেছে বিধ্বস্ত জনপদ। ঢেলে সাজাতে হয়েছে কলকারখানা।

তবু পুরাতন নির্মূল হয়নি এখানে। প্রাচীন বহু খাড়াই গির্জা এখনও শহরের চারদিকে ছড়িয়ে আছে। সেকালের প্রাসাদ আছে বহু। বোমায় ক্ষতিগ্রস্ত ড্যুরেরে-র বাড়ি আজও মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে।

হঠাৎ গজিয়ে ওঠা শহর নয় নিউরেমবার্গ। বহু পুরাতন কথা, বহু সেকেলে কাহিনী ভরাট হয়ে আছে এখানে।

ভৌগোলিক আদলখানি বাণিজ্যের সহায়ক ছিল। তীর্থস্থান ছিল এ-শহর আগে থেকেই। তবে রাজারাজড়ার চোখ প'ড়েছে দ্বিতীয় ফ্রেড্রিকের আমল থেকে। তার হাতে শহর গড়ন পেল নতুন ক'রে। চালু হলো নতুন আইন। স্বকীয় মুদ্রার প্রচলন হ'লো। চার্লসের আমলে নিউরেমবার্গের কৌলীন্য যেন আরও বৃদ্ধি পেলো।

শিল্প ও বিজ্ঞানে নিউরেমবার্গের মৌলিকতা কম কিসে? ঘড়ির জন্ম এখানেই। মার্টিনের হাতের তৈরী প্রথম পৃথিবীর গোলক এখনও মিউজিয়মে রাখা আছে। এই নিউরেমবার্গের কোনও এক স্থানে লবসিঙার তৈরী ক'রেছেন এয়ারগান।

বিশ্ববিখ্যাত শিল্পী ড্যুরেরে-র জন্মস্থান এই নিউরেমবার্গ। ক্রাফট্ জড় পাথরের মধ্য থেকে ছেনি আর বাটালির সাহায্যে কুঁদে বার করেন দুরন্ত ভাস্কর্য। ব্রোঞ্জ পেটারের হাতে নতুন গড়ন পেল। সঙ্গীত খুঁজে পেয়েছে তার নতুন সুর।

এই ভাবেই এগিয়ে চ'লেছিল অনেকদিন। কোনও নতুন কোনও মানুষ এ শহরের উন্নতি ঠেকাতে পারেনি।

তারপর আচমকা এক নাড়া পেয়ে এই সুন্দর শহর একদিন হঠাৎ কেঁপে উঠলো।

এলো যুদ্ধ। দেশ অবরুদ্ধ হ'লো। অস্ট্রিয়া ও ফ্রান্সের হাতে

প'ড়ে দেশের সমৃদ্ধি খান খান হ'য়ে ভেঙ্গে প'ড়লো। নেপোলিয়ন আড্ডা গাড়লেন ব্যাভেরিয়ায়। ঋণী হ'তে হ'লো লক্ষ লক্ষ ফ্লোরিণে। আকস্মিক এক প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড়ে কেঁপে উঠেছে নিউরেমবার্গ।

তারপর আধুনিক ইতিহাস। ইতিহাসও ঠিক নয় সেদিনের কাহিনী।

হিটলার ক্ষমতা হাতে নিয়ে গোটা জর্মনি ঢেলে সাজাতে স্বুরু ক'রলেন। মিউনিক তাঁর প্রধান ঘাঁটি, নিউরেমবার্গ তারপরেই। নাৎসীদলের অধিবেশন হ'য়েছে এখানে অনেকবার। জর্মনির জনসাধারণকে তিনভাগে ভাগ ক'রে 'নিউরেমবার্গ আইন' চালু করা হ'য়েছিল। নিউরেমবার্গের প্রতিটি হোটেল, রেস্তরাঁ ও কলকারখানায় নাজী দল, উপদল টুকরো টুকরো হ'য়ে ছড়িয়ে গিয়েছিল। সেদিন এই শহরের সে অন্যরূপ।

এই সেই নিউরেমবার্গ যেখানে জীবিত নাৎসী নেতাদের বিচার হয়েছিল। পৃথিবীর অশান্তি ও মানুষের তুরন্ত অপচয়ের পহেলা নম্বর আসামী গোয়েরিং-য়ের ফাঁসির হুকুম হয় এখানেই। ডানজিগ্ ও 'পোলিশ করিডোরে-র অন্যতম নেতা, কীটপতঙ্গের মত নিরীহ ইহুদীদের বিষাক্ত গ্যাসে হত্যা করবার মহাদায়িত্ব ছিল রিবেনট্রপের। তার বিচার হয়েছিল এখানে। আর কাইটেল্? একটি নাৎসীর মৃত্যু সংবাদ যিনি বরদাস্ত করতে পারতেন একশত কমিউনিষ্টের জীবনের বিনিময়ে, সেই অন্যতম নেতার ফাঁসীর হুকুম হয় এই নিউরেমবার্গে। রজেনবার্গ, ভ্‌ন. প্যাপেন, ফ্রাঙ্ক ও আরও অনেকর বিচার হয় এই শহরে।

এই শহরের কোনও এক প্রায়ান্ধকার কক্ষে গোয়েরিং তার ব্যাভেরিয়ান পাইপ ঠোঁটে নিয়ে সমস্ত অপরাধ ফিউরেরের কাঁধে চাপাতে চেষ্টা ক'রেছেন! ক্রোধে অন্ধ বৃদ্ধ ভন্ প্যাপেন ছুটে এসে টুঁটি চেপে ধ'রেছেন গোয়েরিং-য়ের। জানালা দিয়ে নিউরেমবার্গের ধ্বংসস্তূপের দিকে আঙুল তুলে চেঁচিয়ে উঠেছিলেন: বল! তুমি এই সব সর্বনাশের জন্য দায়ী নও। সারা পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন তুমি নির্মূল করোনি, বল?

লাঞ্চরুমের আর এক প্রান্তে অট্টহাসিতে সচকিত ক'রে তুলেছেন আর একজন। ফিউরেরের একনিষ্ঠ সাধক —হের হেস্।

অতর্কিতে অস্ট্রিয়া ও পোল্যাণ্ডের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে দেশের সুন্দর সবুজ জীবনে ইনিই টেনে এনেছিলেন ভয়ঙ্কর সর্বনাশ। নির্বিচারে শিশু হত্যা আর মায়েদের জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। বনের নেকড়ে বিস্মিত হ'য়েছিল। চেঙ্গিস্, তুমি কি অবাক হওনি? হের হেস্ তোমাকে বিস্মিত করেনি?

ইতিহাসের কি নির্মম পরিহাস। প্রাণ ভয়ে ভীত হেস্ উন্মাদ। ধূসর বর্ণের কোট গায়ে দিয়ে ঘরের আর এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে কাইটেল! করিডোরের জোরালো আলোয় তার নিজের ছায়া প'ড়েছে দেওয়াল জুড়ে। মৃত্যু ভয়ে সারা দেহ থর থর ক'রে কাঁপছে। নাড়া খেয়ে খেয়ে বিশাল সেই ছায়ামূর্ত্তিটি যেন এগিয়ে আসছে।

পাইপের তামাক সম্পূর্ণ ছাই হয়ে গেছে গর্তে। ঠোঁট থেকে নামিয়ে সেটি টেবিলে রাখেন। প্রশ্নবোধক চিহ্নের ঢঙে গড়া দুর্মূল্য জড় ব্যাভেরিয়ান পাইপটি কেমন যেন সজীব হ'য়ে ওঠে। গোটা দুনিয়ার জ্বলন্ত জিজ্ঞাসা যেন পাইপটির মধ্যে থেকে গোয়েরিং-য়ের সমস্ত দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলছে। শত সহস্র কণ্ঠে যেন আওয়াজ উঠছে: জবাব দাও।

দুরন্ত এক প্রস্তুতিতে ভারী চোয়াল এঁটে আসে। মেঝেতে আছড়ে ফেলেন পাইপটি। টুকরো টুকরো হ'য়ে ছড়িয়ে প'ড়লো চারদিকে।

ধীরে সামনের জানালাটি বন্ধ ক'রে দিলেন। চুপচাপ ব'সে থাকা কিছুক্ষণ। সামরিক পোষাকের গোপন গহ্বর থেকে কালকূট এক বিষ টেনে নেওয়া তারপর। নিজের বিষে নিজেই সেদিন নিলিয়ে উঠলেন গোয়েরিং।

বাইরে পোড়া বীভৎস শহর। উলঙ্গ, ক্ষুধার্ত্ত শিশু মাকে খুঁজছে। পরাজিত, বিধ্বস্ত নিউরেমবার্গ।

মৃতধ্বংসস্তূপের মধ্যে থেকে আবার জীবন যেন প্রাণ চাঞ্চল্যে মূর্ত হ'য়ে উঠেছে। ধ্বংসস্তূপের স্বাক্ষর আজ সহসা চোখে পড়ে না। নতুন নতুন বাড়ি। অতি সুন্দর সাজানো পথ। গির্জার খাড়াই চূড়ো! আকাশ ছোঁয়া কারখানার চিমনীতে চারদিক ঠাসা।

উছল হাসির উচ্ছ্বাসে, মানুষের মর্মস্পর্শী কান্না আর হাহাকার আজ এখানে সম্পূর্ণ বিস্মৃত।

আলোতে ঝলমল ক'রছে গোটা শহর। প্রবল শীতেও যেন হাসছে নিউরেমবার্গ।

পথে পথে ঘুরছিলাম। রাস্তার তু'পাশে সারি সারি দোকান। হরেক রকম জিনিস। লোভনীয় পোষাক অতি সুন্দর ভাবে সাজানো। ছুটির সন্ধ্যা। পথে তাই ভীড় বেশী। হিসাবে ছিল অল্প কিছু সওদা সেরে এক চক্কর ঘুরে সোজা ঘরে ফিরবো।

বাঁকের মুখেই তুটি পরিচিত মুখ চোখে প'ড়লো। কাঁচের বিরাট শো-কেসের মধ্যে সাজানো পণ্যসামগ্রী হাঁ ক'রে গিলছেন মনে হ'লো।

ইয়োরোপের অন্যত্র ঠিক কি অবস্থা আমার জানা নেই, শুনেছি লণ্ডন শহরে বা প্যারীর পথে ঘাটে ভারতীয়দের সাক্ষাৎ মেলে অতি সহজেই। কিন্তু এখানে এসে কদাচিৎ পরিচিত মুখের দর্শন মিলেছে।

কাছাকাছি হ'তেই পায়ের গতি কমিয়ে দিলাম। তুজনে দেখলাম খুব হাসাহাসি ক'রছেন আপন মনে। কথা বলছেন বাঙলায় নয়— হিন্দীতে।

চোখাচোখি হ'তে হেসে বললাম : আপনারা এখানে এসেছেন কতদিন? খুশীর সঙ্গে বেশ কিছুটা উচ্ছ্বাসের আধিক্য ছিল আমার কথাতে।

কেমন যেন গুটিয়ে গেলেন। পরস্পর চোখ ঠারাঠুরি হ'লো। হাসিভরা মুখ তুটি গম্ভীর হ'য়ে এলো মুহূর্তে।

ছিপছিপে, লম্বাটে ফর্সা ভদ্রলোকটি কাঁধের ক্যামেরাটি হাতে নিয়ে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে নিলেন আমার দিকে। উত্তর দিলেন তারপর : ঘুরতে ঘুরতে এসে প'ড়েছি।

— এখানে আছেন কোথায়?

— গ্রাণ্ডে! কাল সকালেই অবশ্য চ'লে যাব বনে্!

— ইয়োরোপ ঘুরতে বেরিয়েছেন বুঝি?

— কিছুটা!

— পশ্চিম জর্মনি কেমন দেখছেন?

— মন্দ কি!

আমার কৌতূহল ও উচ্ছ্বাস ভদ্রলোকের উত্তরের কায়দায় প'ড়ে

বার বার বাধা পেলো। আমার প্রসঙ্গে আগ্রহ তো দূরের কথা, সামান্য রকম কৌতূহলের-ও চিহ্নমাত্র নেই।

সঙ্গের মোটা ভদ্রলোকটি প্রশ্ন ক'রলেন: এঞ্জিনীয়ারিং প'ড়তে এসেছেন এখানে? গভর্ণমেণ্ট স্কলার্‌শিপ্ পেয়েছেন বুঝি? হামবুর্গে কিছু ভারতীয় ছাত্র দেখলাম। আমরা এসেছি ট্রেড ডেলিগেশনে।

আমার মুখের দিকে তাকিয়ে কথা নয়। দূরের কোনও কিছু বোধহয় লক্ষ্য ক'রছিলেন ভদ্রলোক। বেশ একটা পিঠ চাপড়ানোর সুর ছিল কথাতে।

জবাবে জানালাম: গভার্ণমেণ্ট স্কলার্‌শিপ্ আমার মত অভাগার জন্যে নয়। হামবুর্গের ভারতীয় ছাত্রদের হদিশও আমার জানা নেই। ট্রেড ডেলিগেশনে এসেছেন আপনারা। কিসের ডেলিগেশন?

লম্বা, ফর্সা ভদ্রলোকটি এক রাশ ধোঁয়া ছেড়ে গম্ভীর গলায় বললেন: গভর্ণমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া।

মুহূর্তমাত্র। নাক উঁচু করা ব্যাপার। বুঝলাম, আর আগানো সম্ভব নয়। আমার আগ্রহপূর্ণ কৌতূহল এনাদের নির্লিপ্ত জবাবের কাছে অতিমাত্রায় সঙ্কুচিত। কালো চামড়া, একই দেশের মানুষ। কিন্তু তফাত বিস্তর। 'ভেরী ইম্‌পর্ট্যাণ্ট্ পারসন' হয়তো নন কিন্তু পহেলা নম্বরের 'হাই গভর্ণমেণ্ট অফিশিয়াল' তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই।

এখন সাফল্যের সঙ্গে পশ্চাৎ-অপসরণ ছাড়া উপায় নেই। কেমন যেন ভ্যাবাচাকা খেয়ে খেই খুঁজতে থাকি।

মোটা ভদ্রলোকই ধরিয়ে দিলেন। ঘড়ি দেখে ব্যস্ততার সঙ্গে পাশের ভদ্রলোকটির কনুই স্পর্শ ক'রে কি যেন বললেন। দুজনে প্রায় একসঙ্গে আমার দিকে ফিরে তাকালেন। ভাবটা এই, এবার আমার পথ ছাড়া উচিত। হাতে তাঁদের সময় কম।

পথ ছেড়ে দাঁড়াই। বিদায় নিয়ে লজ্জিত মুখে নিজের রাস্তা ধরি। অতি দুঃখেও কেন জানি হাসি পায়।

কয়েক মুহূর্ত। অতি সামান্য ঘটনা। কি দোষ দেবো। কার বিরুদ্ধে, কিসের অভিযোগ আমার ?

বুঝি এনারা কাছে থেকেও বহু দূরের মানুষ। এনারা ভারতের, তবু ভারতীয় নন। শ্রীনেহেরু দিবারাত্রি চেঁচালে হবে কি ! ইংরেজের এক অদ্ভুত সৃষ্টি আমাদের দেশের 'হাই গভর্ণমেন্ট্ অফিশ্যাল' ! এক তাজ্জব জাত সৃষ্টি ক'রে গেছেন এ দেশের কিছু মানুষকে নিয়ে। 'অন হিজ ম্যাজেস্টিস্ সার্ভিস্' সম্পূর্ণ গ্রাস ক'রেছে এনাদের। অশোকস্তম্ভের সীলমোহর বড় বেশী মজার লাগে। এনাদের কারো কারো মতে 'অ্যাডাল্ট্ ফ্র্যাঞ্চাইজ্' আমাদের দেশে নিতান্তই নাকি বাড়াবাড়ি। ভোট দেওয়া তো দূরের কথা, ভোটার লিস্টে বাড়ির আয়ার সঙ্গে এক পাতাতে নাম থাকলে এনারা খুশী হবেন কি ক'রে।

আরও শতখানেক বছর আমাদের ইংরেজের কাছে মানুষ হওয়া উচিত ছিল, প্রকাশ্য দিবালোকে এ কথা এঁরাই জোর গলায় জানান দিয়ে থাকেন। 'রেফিউজী'রা এঁদের চোখে 'পলিটিক্যাল সিফিলিস্'। আর কমিউনিস্ট ? দরকার আছে। দেশে ওদের-ও নাকি থাকবার দরকার আছে। আমেরিকা তা নাহলে গ্রাহ্যে আনবে না আমাদের। রাশিয়া ? সে তো ইয়োরোপের বিহার।

এঁরাই দেশের কর্ণধার। সাধারণ মানুষের ভরসাস্থল। বাণিজ্য প্রতিনিধি হিসাবে আজ এসেছেন এদেশে। কাল হয়তো প্রমোশন হবে আরও উচ্চপদে।

মিণ্টু···উ···উ···উ···।

পথে থমকে দাঁড়াতে হলো। পিছনে ফিরে কাউকে দেখলাম না। আমার বাড়ির অতি আটপৌরে নাম ধ'রে এখানেই বা ডাকবে কে। তবু কয়েকবার এদিক সেদিকে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলাম। কাউকেই দেখলাম না। এতটা ভুল হবে ?

এবার কিছুটা কাছাকাছি! ডাকটা অনেক স্পষ্ট। রাস্তার অপর প্রান্ত থেকে দেখলাম একরকম দৌড়োতে দৌড়োতে আসছে আমাদের পালোয়ান।

নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারি না। স্বপ্ন দেখছি নাকি। পালোয়ান এখানে এসেছে কবে। থ হ'য়ে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইলাম।

পালোয়ান আমাকে এক রকম ছু'হাতে জড়িয়ে ধ'রলে। আনন্দে ও প্রচণ্ড কৌতুহলে প্রশ্ন করি ঃ তুমি এখানে?

পালোয়ানের প্রাণখোলা সেই হাসি। তার আনন্দের আতিশয্যের বহর দেখে পথচারী ছু'একজন দাঁড়িয়ে গেল।

পালোয়ানের নামের সঙ্গে চেহারা ও আকৃতিগত কোনও মিল নেই। দোহারা গড়নের অতি সাধারণ চেহারা। মুখশ্রী মন্দ নয়। বরং সেদিক দিয়ে বিচার ক'রলে তার নাম 'পল্টু' বা 'পচা' হ'লেও ক্ষতি ছিল না।

পালোয়ান আমার বন্ধু। আমার দাদারও। এঞ্জিনীয়ারিং কলেজে সে ছিল প্রথমে আমার দাদার সহপাঠী। কিন্তু উপর্যুপরি ক'বার পরীক্ষা দিয়ে ও না দিয়ে একদিন দেখি ক্লাসে আমার পাশেই জায়গা ক'রে নিয়েছে। আমি অপ্রস্তুত হয়েছি। কিন্তু সঙ্কোচের ভাবটা ছুদিনেই কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হ'য়েছে অতি সহজেই।

আমি পালোয়ানকে পছন্দ করি। ধনীর ছেলের অতি সাধারণ গুণ 'দেমাক'। সে সবের বালাই নেই পালোয়ানের। কোনও কথা গোপন করতে জানে না। হিসাব ক'রে কথা ব'লতে শেখেনি! যখন যেটা ব'লতে ভালো লাগে, যে কাজে মজা লাগে বিন্দুমাত্র চিন্তা না ক'রে তাতে হাত দিতে ওর বাধে না।

অসাধ্যসাধন করবার কৌশলও তার নখদর্পণে। রাশিয়ান ব্যালের টিকিট সম্পূর্ণ নিঃশেষিত। 'অ্যামিউজ্‌মেণ্ট্ ট্যাক্স কমিশনার পর্যন্ত একটি টিকিটের জন্যে ফোন ক'রে ব্যর্থ হ'য়েছেন। সেখানে

পালোয়ান কাউন্টারের ভেতর থেকে পাঁচ টাকার রাশি রাশি টিকিট বার করে আনতে পারে অক্লেশে।

'ওথেলো' হচ্ছে নিউ এম্পায়ারে। বহু লোক টিকিট না পেয়ে ফিরে গেলেন। নাটক সুরু হবার সামান্য কয়েক মুহূর্ত আগে কার থলে থেকে 'ওথেলো'র টিকিট সে সংগ্রহ ক'রে আনলে তার হদিশ পাওয়া অসম্ভব।

কপর্দক আগাম কবুল না ক'রেও রোমহর্ষক গাইয়ে বাজিয়েদের সঙ্গীতের আসরে এক কথায় পালোয়ান নিয়ে আসতে পারে স্বচ্ছন্দে।

স্কুলের সহপাঠী এসে ধরেছে। অমুকবাবুর অফিসে লোক নেবে, তমুক বাবুকে দিয়ে একটা ফোন করাতে পারলে কাজ হয়। পরদিনই মেসোমশায়, মেসোমশায় ব'লে তমুকবাবুর বাড়ীতে হাজির হ'লো পালোয়ান। ফোন নয়, গাড়ীতে চাপিয়ে ধ'রে নিয়ে গেল অমুকবাবুর অফিসে। সহপাঠীর কাজ হাসিল ক'রেই ফিরেছে পালোয়ান সেদিন।

পাড়ার মেয়েদের ইনসাল্ট্? নাওয়া খাওয়া নেই পালোয়ানের। গাড়ী নিয়ে সারাদিন বাড়ী আর লালবাজার ক'রে বেড়ালো।

পাড়ার সেলুন উঠে গেল। চায়ের দোকানকে কেন্দ্র ক'রে দিবারাত্রি ট্রাউজার্সের সঙ্গে কোলাপুরী স্যাণ্ডাল পরা 'ইউ'য়ের ঢঙে ঘাড় ছাঁটা, হিন্দী ছবির জারক রসে জারিত তরুণ বৃন্দ উধাও হ'লো।

মজা হ'য়েছিল অজিতের বোনের বিয়েতে। বিয়ের পর বরবধূ যাবে ধানবাদে। পালোয়ান তার ডজ্ নিয়ে এলো হাওড়াতে পৌঁছোতে। রেড রোডে চাকা ফেঁসে গেল। প্রবল বৃষ্টি। চারপাশে কোথাও ট্যাক্সির নামগন্ধ নেই। উৎকণ্ঠিত নতুন জামাই অসহায়ের মত বলে ঃ আজ বৌভাত, সবাই অপেক্ষা ক'রছেন।

সেই জলঝড়ের মধ্যেই চাকা পাল্টানো হ'লো। কিন্তু ট্রেণ ধরা গেল না। অজিত ব'লেছে ঃ আমি একটা 'টেলি' ক'রে আসি। জানিয়ে আসি এরা রাত্রে পৌঁছোবে।

ম্লান একটু হেসেছে পালোয়ান। তারপর অজিতকে ব'লেছেঃ লোকে অপালাকে দেখতে আসবে! বৌ দেখতে চাইবে সবাই। তোর মত সবাই পানতুয়া গিলতে আসে না।

গাড়ী ঘুরিয়ে উঁচু পথ বেয়ে রাস্তা নিলো পালোয়ান। তারপর গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধ'রলে।

হাওড়া থেকে ধানবাদ। অনেকটা পথ। সারা পথ রবীন্দ্র সঙ্গীতের ছড়াছড়ি হ'লো। পানাগড়ের কাছে গাড়ীর সামনে এক 'ওরাঁও' মেয়েকে পাশ কাটিয়ে গেয়ে উঠলো পালোয়ানঃ কালো? তা সে যতই কালো হোক্…! ইত্যাদি।

ধানবাদে বিকেল বিকেল পৌঁছন গেল। বরবধূ নিয়ে সবাই যখন ব্যস্ত, ইশারায় আমাকে বাইরে ডেকে আনে পালোয়ান।

হেসে ব'ললেঃ পোস্ট অফিস কতদূর? চ' মাকে একটা টেলি বা ফোন ক'রে আসি। বাড়ি থেকে তোর বাড়িতে জানিয়ে দেবে। আজ রাত্রে ফেরা অসম্ভব। ডায়নামো চার্জ দিচ্ছে না, আর্মেচার জ্বলে গেছে—কাল সকালে ওটা পাল্টে নিয়েই রওনা দিতে হবে। চা খেয়েছিস তুই?

সাক্ষাতের প্রথম ধাক্কা সামলে উঠে পালোয়ান স্বাভাবিক সুরে বল্লেঃ মাস দুই হ'লো হামবুর্গে এসেছি। টাটায় থাকতে 'বর্মা-মাইন্‌সে'র বড়খোকাদার মুখে শুনলাম তুই নাকি আমেরিকা যাচ্ছিস। বড় খোকাদাকে চিনলি তো? হীতুর দাদা। বাড়িতে গেলেই তোর সামনে খলিল জেব্রানের বই খুলে ব'সতেন। সত্যি, তোকে যে আজ এখানে দেখবো কল্পনাও ক'রতে পারিনি। আর কেউ কোনও খবর দেবে না। আমি আর কাঁহাতক এখান থেকে চেঁচাতে পারি বল।

কথায় কথায় পথের বাঁকের এক রেস্তরাঁয় এসে ঢুকি। দু'হাতে টেবিলের দুই প্রান্ত ধ'রে সামনে কিছুটা ঝুঁকে প'ড়ে পালোয়ান বল্লেঃ কি খাবি বল।

—কিছু না। শুধু বিয়ার নাও! তোমার হাতে কাজ নেই তো?

—কাজ, কাজ আর কি। দিন দশেকের জন্যে আমাকে মিউনিকে আসতে হ'য়েছে। ছুটি পেলাম, তাই বেড়াতে এসেছি এখানে। রাত্রের ট্রেনেই অবশ্য ফিরে যেতে হবে মিউনিকে। আচ্ছা মিণ্টু, তুই জর্মন জানিস না?

—মোটামুটি! কাজ চালাতে পারি, তর্ক ক'রতে পারি না।

তুই একের নম্বর বাঙ্গাল। বুদ্ধু আর কাকে বলে। তর্ক করবার দরকার কি। ঝগড়া কিসের? বলনা, বলনা, মেয়েদের সঙ্গে আলাপ করলি? শালা, আমি যা ঠেকে গেছি না, ইংরেজী ধুয়ে কি জল খাবো। এখানে তোমার বাঙ্গলা ও ইংরেজীর প্রায় একদর।

বিয়ার এলো। রেস্তরাঁ একরকম জমজমাট। সামনের একটি টেবিলও খালি নয়। কিন্তু কি পরিপূর্ণ নীরবতা। সামান্য টুং টাং আওয়াজ আর জুতোর শব্দ ছাড়া কোনও কিছু কানে আসে না। কথাও চ'লেছে টেবিলে টেবিলে। হাসাহাসিও বন্ধ নেই। কিন্তু ধীরে, নিচু পর্দ্দায়। পাশের টেবিলের কারো সামান্য রকম অসুবিধে ঘটে না।

আমাদের দেশের প্রথম শ্রেণীর হোটেল বা বারে-ও এ রকম নীরবতা বজায় থাকে কিনা সন্দেহ। সম্পূর্ণ উন্মুক্ত রেস্তরাঁ, এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত নজরে আসে। ছোট ঘর আছে, তবে পায়রার বাসা নেই। বন্ধ খোপে শাড়ীর খসখস শব্দ, কৃত্রিম রোষ বা ছলাকলা কানে আসে না। তোয়ালে কাঁধে নিয়ে টিপ্‌সের জন্যে হন্যে হ'য়ে ঘুরছে না ডজন খানেক 'বয়'।

বিদেশী হলে কেউ কেউ আড় চোখে তাকায়। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখেও। সে দৃষ্টিতে কৌতূহল সামান্যই। কালো চামড়া দেখে আঁসটে গন্ধের কথা মনে না প'ড়লেও, একটা যেন কিন্তু-কিন্তু ভাব থাকেই। ধলাতেও অবশ্য এদের খুব একটা বিকার নেই। বিদেশীরা সব সময়ই এদের চোখে 'আউস-ল্যাণ্ডার'। স্পানিশ ছেড়ে ডেনিশে

বিশেষ কোনও আকর্ষণ নেই। কিন্তু ফারাক থাকেই পল আর পালে-তে।

নৃত্যের নামে এদেশের জিম্‌ন্যাস্টিক্ আমরা যেমন ধাতস্থ ক'রতে পারি না, এদেশের সাংসারিক জীবনযাত্রাও আমাদের পক্ষে ঠিক গেলা সম্ভব নয়।

আমার এক সহকর্মীর মুখে অহরহ তার ফীয়াঁসীর গল্প শুনে থাকি। বিঠোফেনের 'হেভি মিউজিকে'র চেয়ে 'সুর্বাট বা ভাগ্‌নার তার ভালো লাগে, এ সংবাদও আমার কানে এসেছে। এমন কি দু-প্রস্থ 'ডবল প্যাপরিকা স্নেৎসেল' অনায়সেই আমাকে রপ্ত ক'রতে শুনে আমার স্বাস্থ্য সম্পর্কে তিনি উদ্‌বিগ্ন হ'য়ে আমার সহকর্মীকে পত্র লিখেছেন, এ খবরও আমি পেয়েছি। কিন্তু এখনও পর্যন্ত আমি জানি না ভদ্রলোকের মাতাপিতা জীবিত না মৃত। থাকলে আছেন কোথায় ?

পূজোর সময় বোনাসের কিছু অর্থ হাতে আসলে সিমলে বা মুসৌরি ভ্রমণের চেয়ে মাকে নিয়ে তীর্থস্থানে যাবার চিন্তাকেই আমরা প্রাধান্য দিই। অভাবের সংসার হ'লে সে টাকা বোনের বিয়েতে খরচ করবার জন্যে পোস্ট-অফিসের পাশ বইতে রেখে আসি। কিন্তু এরূপ অবস্থায় মা-বোনের কথা বাদই দিলাম, স্ত্রীকে নিয়ে শৈলশিখরে আরোহণের চেয়ে চোখ ধাঁধানো পর্দ্দা আর কার্পেটের কথাই এঁরা ভাবেন বেশী।

আমরা সংসার করি সকলে। এরা দুজনায় বাসা বাঁধে। আলাপিতার হাতে আমাদের নাকালের ভয়। এদের প্রধান আকর্ষণ তার কাঁকালের।

তবে এ শুধু এক তরফা নয়। মা-বাপও এখানে পুত্রের মুখ চেয়ে নেই। বুড়োর সঙ্গে বুড়িকেই টুক টুক ক'রে ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়। পুত্রবধূর কথা বাদই দিলাম, কন্যাকে নিয়েও সিনেমা বা অপেরা যাবার রেওয়াজ নেই আমাদের দেশের মত। এ শুধু

জর্মনিতে নয়, ইয়োরোপের সর্বত্রই নাকি এই নিয়ম। তবে এদেশে আরও স্পষ্ট।

অর্থনৈতিক কাঠামোই সামাজিক এই চরিত্রের গড়ন দিয়েছে। জোড়াতালি নেই কোথাও। পিতাপুত্রের সম্পর্ক যেটুকু সেটুকু বোধ হয় প্রাণের টানেই! মণিঅর্ডার বা ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স চালাচালির ফাঁস গেরোর তোয়াক্কা করে না কোনও তরফ-ই। তাই আমাদের চোখে সহজ নয়। অতি মাত্রায় বেখাপ্পা মনে হয়।

বাবার কৌটো থেকে জর্দ্দা নিয়ে তাঁর সামনে ব'সেই ঠোঁট লাল ক'রতে বাধা নেই, কিন্তু বাবার সামনে সিগারেট খাওয়ার কথা ভাবতে পারি না আমরা। প্রতি বছর সিংগল্ মশারী বগলে নিয়ে, দেওদার গাছের কাক বাঁচিয়ে, সেবাসদনের মেটার্‌নিটি ওয়ার্ডের দিকে হাঁ ক'রে চারটের ঘণ্টার অপেক্ষায় তাকিয়ে থাকি কমলালেবুর ঠোঙা হাতে নিয়ে, কিন্তু বাবার সামনে স্ত্রীকে 'ডলি' 'ডলি' ব'লে চীৎকার ক'রে ডাকলে তিনি অপ্রস্তুত হন। অসহিষ্ণুও কম হন না।

ভালোমন্দের প্রশ্ন নয়। পছন্দ অপছন্দের সমস্যা নয়। তবে যুক্তি দিয়ে বুঝতে গিয়ে যখন কোনও খেই খুঁজে পাইনে, তখন রাগ হয় না, বিরক্তিতে মন ভ'রে ওঠে। অবশ্য জগৎগুরুর 'রোল' নিয়ে আমি আসিনি—অ্যাজিটেটর-ও নই আমি। সে দায়িত্ব আমার নয়—অন্যের।

ত্ব'পাত্র বিয়ার নিয়ে বসা গেল। পালোয়ান বলে ঃ ওদিকে চেয়ে কি ভাবছিস বলতো? তুই লক্ষ্য ক'রেছিস কিনা জানি না, মেয়েদের সঙ্গে আলাপ হ'লে পরদিনই বিয়ে ক'রেছি কিনা জানতে চায় কেন বলতে পারিস? হাসছিস যে বড়!

কথাটা পালোয়ানের মনে ধ'রেছে বুঝলাম। আমাকেও কয়েক জায়গায় এ রকম বেমক্কা প্রশ্নের সামনে প'ড়তে হ'য়েছে। সর্বত্রই আমি হেঁকে জবাব দিয়েছি। ডাহা মিথ্যা কথা ঠোঁটে এসেছে চটপট। বলেছি, আমার প্রতীক্ষায় আছেন এক সুন্দরী সাত সমুদ্র তের

নদীর ওপারে। 'কালকুটা'তে ব'সে তিনি আমার কথা ভেবে হেসে কুটি কুটি হচ্ছেন অহরহ। ব্যাগ থেকে মন্দোদরী দেবীর ছবি টেনে নিয়ে কৌতূহলী চোখের সামনে মেলে ধ'রেছি। প্রকারান্তরে ব'লতে চেয়েছি : ঠাঁই নেই! দ্বিতীয়ার কোনও স্থান নেই আমার চিত্তে। অপরের আর জায়গা নেই আমার মনে।

এখানে কিছুটা পরিষ্কার আর সহজ ক'রে বলা দরকার। আদতে কলকাতায় আমার প্রতীক্ষায় কেউ নেই। আমার কথা ভেবে অহরহ হেসে কুটি কুটি হচ্ছেন না কোন সুন্দরীই। বেয়াড়া মেশিনের মতলব ধরা সোজা, কিন্তু মেয়েদের মনের হদিশ পাওয়া দুষ্কর।

শুধু যোগ্যতায় কুলোয় না। প্রেমে নাকি সময় লাগে। ধৈর্যও শুনি নাকি লাগে বিস্তর। পালোয়ানই ক্লাসে ব'লেছিল একদিন।

মেয়েদের সঙ্গে নাকি প্রেম ক'রতে হ'লে আগে কিছুকাল মাছ ধরায় হাত পাকাতে হয়। ওটাকে নাকি 'প্রোবেশন্যারি পিরিয়ড্' বলা যেতে পারে। তবে খেপলা জালে নয়। তাতে নাকি শুধু জল ঘোলাই হয়। জালের জাফরি দিয়ে যে কোনও ঝিল্লী চৌধুরী ঝঙ্কার তুলে উধাও হন। ডোমজুড়ের ছিপ ফেলে নয়, ব'সতে হবে চৌরঙ্গী পাড়ার হুইল্ নিয়ে। দৈনিক ঘণ্টা তিনেক ফাৎনার দিকে তাকিয়ে মড়ার মত প'ড়ে থাকতে হবে 'মনোহর দাসের তড়াগে'।

অভাগা যেদিকে চায় সাগর সেখানে সব সময়ই শুকিয়ে যায় না। এখানে এসে মেয়েদের সঙ্গে আলাপ হ'য়েছে। সামান্য পরিচয়, অল্প আলাপ আমার ভালোই লাগে।

পরিচয় বা আলাপ বেয়ে বন্ধুত্বের মধ্যে সেটি সীমাবদ্ধ থাকলে ক্ষতি ছিল না। কিন্তু দু'একজনের ভাবসাব দেখে ঘাবড়ে গেলাম। ঠোঁট দিয়ে বলার ভাষায় ভয় নেই। চোখ দিয়ে অলস কথার আভাস-ই আমাকে বিব্রত ক'রেছে।

কেমন যেন করে। থুতনী তুলে কেমন যেন 'উঁহু' 'উঁহু' ভাব। এক কথাই কয়েকবার বলা। শুধু তাকিয়ে থাকা—দেখা নয়। তুচ্ছ

এক অজুহাত নিয়ে আসা। আমি তো আর ন্যাকা নই। কিছুই বুঝি না, না!

ভদ্রতা বাঁচিয়ে সম্পূর্ণ গুটিয়েই নিয়েছি নিজেকে। এ দেশের মেয়েদের সঙ্গে বাক্যালাপ চলে—প্রেমালাপ অসম্ভব। রেস্তরাঁ আর হোটেলের টেবিলে বিহার হয়তো চলে কিন্তু আমার পক্ষে বিবাহের কথা চিন্তা করাও পাগলামো।

ইয়োরোপের এক দেশের ছেলে অন্য দেশের মেয়েকে বিয়ে ক'রে আনছে হামেশাই। মঁসিয়ে অমুকের সঙ্গে ফ্রলাইন তমুকের, হের ব্রাউনের সঙ্গে মিস জয়েসের আলাপ হচ্ছে প্রায়ই। প্রেম হচ্ছে বিস্তর। ঘর বাঁধছে তারা স্বচ্ছন্দে।

কিন্তু ফ্রাউ জেনকে নিয়ে আমি যাবো কোথায়? শাড়ী প'রতে পারলেই চলবে? বাঙ্গলা জানলেই হবে? ননদ বলে কাকে? ভাশুরের সঙ্গেই বা সম্পর্ক কিসের? সজনের ডাঁটা না চিবোলে ক্ষতি নেই। আলপনায় হাত না থাকলেও এমন কিছু যায় আসে না। কিন্তু সামান্য স্কুল মাষ্টারী নিয়ে বাবার প্রথম কলকাতা আসা, একগাদা কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে মায়ের সেদিনের মর্মান্তিক ক্লেশকর দিনগুলির কথা সে মেয়ে কতটা বুঝবে? বুলগানিনের ঠোঁটের 'জয়হিন্দ্' দূর থেকেই শুনতে ভালো। কিন্তু রুশ বুলবুলি ঘরে এনে এদেশের ক-জনায় খাজনা দিতে পেরেছেন ব'লতে পারেন?

আমার নিজের দেশের অবস্থাই কঠিন। কোনও মারাঠী মরদের সঙ্গে শ্যামবাজারের 'কোরেছ্যালো' মার্কা মেয়ের বিয়ে হ'লে কেমন হয়? পদ্মাপারের কালো হরিণ চোখের 'মাইয়্যা'র সঙ্গে পাঞ্জাবী শ্রীমান মালহোত্রের বিয়ে হ'লে অহোরাত্র তার কি ভাবে দিন কাটবে?

সামান্য মাথার চুলও নাকি হেলাফেলার জিনিষ নয়। কাব্যেও নাকি এর জায়গা আছে। ধ্বনিপ্রধান ছন্দে 'পঞ্চশরে দগ্ধ' করা হয়তো হবে না, কিন্তু উপমা অলঙ্কারে সে যে 'বিশ্বময় দিতেছে ছড়ায়ে'। চুল-কে নিয়ে বুদ্ধদেব বসুর সুন্দর একটি কবিতা আছে।

কিন্তু ভাগলপুরের এক হিন্দিভাষী, সাহিত্য রসিক ও কল্‌চরড্‌ পাত্র বিয়ের রাতে যদি বালিগঞ্জের অবসরপ্রাপ্ত সিভিল সার্জনের একমাত্র পোড়খাওয়া তনয়ার তেজালো সাম্পুতে ফাঁপানো নরম কেশরাশি দেখে তার আঞ্চলিক ভাষায় সেই কবিতাটীর তর্জমা বেমক্কা আওড়াতে থাকে তাহ'লে? সামান্য কেশদাম নিয়ে যে উদ্দাম কেশাকেশির আশঙ্কা থাকে তা ভাবলে শঙ্কিত হতে হয়।

আছে, আরও আছে। আমার বাঙলা দেশেই আছে।

সিউড়ীতে গিয়ে শাশুড়ীর হাতের মাছের টক আমার কি পরিমাণ শুড়শুড়ি দেবে ভাবতে পারি না। রসময়ীর রসালাপে আদিরসের হয়তো অকুলান হবে না। কিন্তু রসনা নিয়ে রসিকতায় শুধু করুণ রসেরই সৃষ্টি ক'রবে। আমি যে বাঙাল—আলুপোস্তোর কাঙাল নই! আমার বউ ব'লবে 'বটেক্‌', 'বটেক্‌' আর আমি বলবো—'আছিলো'। অমন বিয়ে না ক'রলেই হয়।

যা হোক, এদেশে এসে আমার নতুন অভিজ্ঞতার কথা কথাপ্রসঙ্গে জানিয়েছিলাম ভোলাকে। ফেরৎ ডাকেই ভোলার পত্র এলো। সঙ্গে একটি ছবি। একটি মেয়ের ছবি। একথা সেকথার পর লিখেছে ভোলা : ছবিটি তুমি যেখানে সেখানে দেখিয়ে বেড়াতে পারো। এই ছবিটির সঙ্গে যে কোনও সম্পর্ক পাতাতে তোমার মুখের কোনও আগলের দরকার নেই। দেখবে মেয়েরা পিছু নেবে না। তোমার জন্যে প্রাণনাথ বলে যদি বা কেউ উদ্‌বাহু হ'য়ে থাকেন, এ ছবি দেখলে দীননাথ ব'লে সরে প'ড়বেন।

সেই থেকেই ছবিটি আমি সঙ্গে রাখি। পকেটের ব্যাগে ভ'রে রাখি। ফটোগ্রাফারের হাত সুন্দর। আর মেয়েটির মুখশ্রীও অসুন্দর নয়। ছবির উল্টোপিঠের সাদা দিকটায় অনেক ভেবে চিন্তে লিখে রেখেছি—মন্দোদরী দেবী। প্রয়োজন মাফিক দেখাচ্ছি। বানিয়ে গল্প ক'রছি! কাজ হ'চ্ছে।

হোটেলে, রেস্তোরাঁয়, পথে, ষ্টেশনে অসংখ্য মেয়ে। সে পরিমাণ

মেয়ের মত ছেলে কই। মহাযুদ্ধের আবর্তে প'ড়ে লক্ষ লক্ষ যুবক প্রাণ হারিয়েছে। আহত হ'য়ে সারা জীবনের মত বিকলাঙ্গ হ'য়ে আছে অগুনতি।

এমন একটি পরিবার নেই যাদের কেউ না কেউ নিহত হয়নি যুদ্ধে। আহত বা পঙ্গু হ'য়ে নেই বাড়িতে।

কিন্তু মেয়েরা ক'রবে কি? তারা তো ঘর চায়। নীড় বাঁধতে চায় তারা। তাই ভদ্রঘরের সুদর্শনা শিক্ষিতা তরুণীরও চোখে সেই ভাবগর্ভ চাউনী। মোটামুটি দেখে পছন্দ হ'লে সুন্দর মিষ্টি হেসে প্রশ্ন করেঃ অল্প কিছু জর্মন বলতে পারেন আপনি? সে প্রশ্নে চাতুরী নেই। সে কণ্ঠে মতলব নেই। সস্তা আবেদন নেই সে চাউনীতে। ফ্লার্ট্ করবার তিলমাত্র ইঙ্গিত নেই তাতে।

আমার অভিজ্ঞতার কথা ব'লতেই পালোয়ানের হাত নাড়াতে বাধা পেলাম। কৃত্রিম রোষ প্রকাশ ক'রে বলেঃ খপ্ ক'রে তুই ব'লে দিলি এনগেজড্—কিস্স্যু শিখিসনি তুই। সত্যি কথা ব'লতে কি তোর ঐ 'গুডি গুডি' ভাবটা আমি বরদাস্ত ক'রতে পারি না একদম। আমি তো আর তোকে বিয়ে ক'রতে ব'লছি না।

হেসে বলিঃ বিয়ে ক'রবো না ব'লেই তো এগুতে ভরসা পেলাম না! একটি কোমল প্রাণ ভেঙ্গে রেখে যাবার মধ্যে আর যাই থাক বাহাদুরী নেই!

—তার মানে!

—অতি সহজ!

—এথিক্স্ কপচে মজা পাস। কিন্তু তোর মত জর্মনটা আমি যদি রপ্ত ক'রতে পারতাম না···!

কথার মাঝখানে থেমে পড়ে পালোয়ান। চতুর ছেলে। আভাস পেয়েছে এ প্রসঙ্গে আমার কিছুমাত্র আগ্রহ নেই। সহজ ক'রে নিতে গিয়ে এলোমেলো কথা বলে। জবাবদিহির ভঙ্গিতে হেসে বলেঃ আমি জানি, তুই খুব পিউরিটান্। কিন্তু আমাকেই বা

তুই কি ভাবিস বলতো! আমি সহজ, নরম্যাল, কিন্তু সস্তা নই মিণ্টু।

—আমি জানি।

—ছাই জানিস।

প্রসঙ্গ ঘোরাতে চেষ্টা করি। হেসে বলি ঃ নতুন ক্যামেরা কিনেছো দেখছি। ছোট ভাইটির জন্যে আমারও একটা নিতে হবে!

হৈ হৈ ক'রে উঠলো পালোয়ান। হাত পা নেড়ে বললে ঃ খবরদার যার তার কাছে যাসনে। তোরই তো জানবার কথা। এখানকার মজুমদার সাহেবের সঙ্গে আলাপ হ'য়েছে তোর? হয়নি, চ আমার সঙ্গে, করিয়ে দিচ্ছি। ভারতীয় দেখলে প্রচণ্ড খাতির করেন ভদ্রলোক। টোয়েন্টি পারসেণ্ট ডিসকাউণ্ট্ আমাকে সেধে দিলেন! রেড ফিল্টার্ আমাকে একটা নিতে হবে। পথে মোজা কিনবো, আর রুমাল। রেন্ কোট গায়ে দিয়ে ঘুরছিস যে বড়! ওভার কোট নেই তোর? মরবি, মরবি। ঠাণ্ডা লাগিয়ে মরবি। আমারটা নিবি? কলারটা পছন্দ হয় তোর?

—সামনের মাসেই আমি কিনে নেব। খুব একটা প্রয়োজনও বোধ করিনি এখনও।

—বড্ড বাজে বকিস তুই। আমারটা পছন্দ হ'লো না বুঝি। প্যারীতে বাবা বানিয়েছিলেন, আমার গায়ে ঠিক ফিট করে না। নে না, নে না! তোর গায়ে মনে হয় ঠিক ফিট ক'রবে।

বিয়ারের পাত্রাধার নিঃশেষিত হলো। কিন্তু পালোয়ানের অনেক কথাই বাকি রইলো। আমার অনেক কিছুই জানার ছিল। রেস্তরাঁ থেকে বেরিয়ে পথে নামি। আপন মনেই ব'লে চলে পালোয়ান ঃ তোকে দেখে আমার যে কি আনন্দ হচ্ছে। আয় না, আয় না। আমার ওখানে আয় না ছুটিতে।

বাইরে বেশ ঠাণ্ডা। সেই সঙ্গে হাওয়াও আছে বেশ। রাস্তার ছ'ধারের দোকানে বিরাট বিরাট শো কেশ। রেডি মেড কাপড়ের

দোকানগুলো অতি সুন্দরভাবে সাজানো। মানুষ প্রমাণ মডেলগুলোর দেহ ঘিরে নানা পোষাক। হরেক রকম জিনিস অতি মাত্রায় আকর্ষণীয়। চারিদিকে কাঁচ, ভেতরে আলো। এক একটা শো কেসে ডজন চার পাঁচ মডেল। কলকাতার কোনও দোকানের সঙ্গে তুলনাই চলে না। প্রকাণ্ড উঁচু উঁচু এক একটি ডিপার্টমেন্টাল স্টোরস্। সমস্ত কিছুই এখানে পাওয়া যায়। এক একটি দোকান যেন পুরো আমাদের নিউ মার্কেট। দোকানে ঢুকে শুধু জেনে নিতে হবে দোকানের কোন্ তলায়, কোন্ জায়গায় কি জিনিস পাওয়া যায়! লিফ্ট নেই। তাই ব'লে সিঁড়ি ভাঙবার প্রয়োজন নেই এখানে। চলন্ত রবারের সিঁড়ি সামনে চলেছে। তাতে উঠে দাঁড়ালেই পৌঁছোনো যাবে সেখানে। এরা একে বলে 'রোলট্রেপে', অর্থাৎ গড়ানো সিঁড়ি। ইংরেজিতে একেই বলে এস্ক্যালেটর্।

মোজা নিলে পালোয়ান। সেই সঙ্গে রুমাল। প্রায় আধ ডজন রুমাল আমার পকেটে ঢুকিয়ে দিয়ে বলে: তুই কিছুটা রাখ। সোবার্ কলার, কি বলিস?

কিন্তু আমার জবাবের দিকে কান আছে নাকি তার। বড় তড়বড় করে। এটা সেটা নিয়ে নাড়াচাড়া করে। ওটা সেটা দর দাম করে। আমাকে অতি সহজ ভাবে সুন্দরী ফেরকয়ফারিণ-এর সঙ্গে কথা ব'লতে দেখে কনুইতে ঠোকনা মেরে বলে: তুই মেরে দিলি মাইরী।

এক চক্করে নীচে নামা গেল। পথে বেরিয়ে পালোয়ান বলে: মজুমদার সাহেবের সঙ্গে আলাপ ক'রে রাখ। ক্যামেরা তোর সুবিধে মত কিনিস। এমন চমৎকার লোক, তোর খুব ভালোই লাগবে।

সত্যিই মিথ্যে বলেনি পালোয়ান। আমাদের দেখে ভদ্রলোক চেয়ার ছেড়ে এগিয়ে এলেন। অনেকটা লম্বা, প্রায় ছয় তিন বা ছয় চার। নিখুঁত সাহেব, শুধু মুখের আদলখানি বাঙ্গালীর। গায়ের রঙ

এর চেয়ে ফর্সা হ'লে ভারতীয় যে কোনও পুরুষের পক্ষে বাহুল্য হ'তো। মাথার চুল সাদা কালোতে মেশানো। এক টুকরো সুন্দর হাসি। শান্ত, নীরব আপ্যায়ন।

দোহারা চেহারার দোকান ঘর। সামনেটায় শো'কেস। ক্যামেরা ও তার সরঞ্জাম সুন্দর সাজিয়ে রাখা। কাউন্টারে একটি মেয়ে। ডাগর আঁখি। সোনালী চুল। মোমের মত আঙুলের ডগায় কালো একটি পেন্সিল। ক্যাশমেমো লিখছে খসখস ক'রে। সামনে দুজন ভদ্রলোক নতুন কেনা একটি ক্যামেরা নিয়ে নাড়াচাড়া ক'রছেন। দু'চার জন আরও খদ্দের আছে দোকানে।

ভদ্রলোক আমাদের ভেতরের ঘরে আহ্বান ক'রলেন। বাঁ দিকের দরজার ভারী পর্দ্দা সরিয়ে ভেতরে ঢুকলাম। অফিস অফিস গন্ধ পেলাম। এক টেবিলে ব'সে এক ভদ্রলোক কি সব কাগজপত্র নাড়া-চাড়ায় ব্যস্ত। টাইপ মেশিন সুমুখ ক'রে ব'সে আছেন আর একজন।

ঘরটি বেশ বড়। কোনের দিকে ছোট বড় গোল টেবিল ঘিরে অতি সুন্দর সোফাসেট। সেদিকটায় নরম আলো। লাল কার্পেটের ওপর বিরাট একটি এ্যালশেসিয়ান। সুমুখের দুই থাবার ওপর মুখ রেখে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সামনে।

ভদ্রলোকের ঠোঁটে অর্থপূর্ণ নীরব হাসি। ছোট্ট কোরে তাকানো। আপ্যায়ণে আন্তরিকতার এক আভাষ ছিল, ভাষা ছিল না। জুত হ'য়ে না বসা পর্যন্ত কোনও কথাই নয়।

আলাপ হ'লো। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অনেক প্রশ্ন। অনেক কৌতূহলের উত্তর দিতে হয়। কোথায় আছি, কোথায় কাজ। মেয়াদই বা কত দিনের। আরও বহু, নানা কিছু।

জানতে চাইলেন ঃ দেশ কোথায় আপনার ?

—পূর্ববঙ্গে—ফরিদপুর !

—আপনি দেখছি আমার দলের।

এক নজর পালোয়ানকে দেখে নিয়ে বলেন : আপনার বাড়ি—ব'লেছিলেন হুগলী ! আপনি হ'লেন পহেলা নম্বর ঘটি।

পালোয়ান হেসে বলে : মনে ক'রে রেখেছেন দেখছি ! এতকাল এদেশে থেকেও 'বাঙাল-ঘটি' আপনার মনে আছে তো বেশ।

মাথা নেড়ে বলেন : থাকবে না ! এখানেও খানিকটা ওসব আছে যে। তবে ইলিশ মাছ নিয়ে ভেঙানো নেই সত্যি, উচ্চারণ নিয়ে চটাচটি হয় না বটে ; কিন্তু ফুয়ের্থে গিয়ে তার নিন্দে করুন পথঘাটের !—সেখানকার যদি লোক হন আপনি, নিউরেমবার্গে এসে পুরোনো হোটেলের প্রতি সামান্য অবজ্ঞা দেখালে সকলে হাঁ হাঁ ক'রে ছুটে আসবে। ফুয়ের্থ পরিস্কার না নিউরেমবার্গ, এ নিয়ে তর্ক বাধলে একটা গোলমাল লেগে যেতে পারে জানেন ?

মজাই লাগলো শুনে। এসবে আমাদেরই একচেটিয়া অধিকার ব'লে জানতাম। কৌতূহলের সঙ্গে বললাম : তাই নাকি। মজার কিছু শুনলাম আপনার কাছে।

সোফার মধ্যে ডুবে গেলেন মজুমদার। বলেন : খুব ! এ নিয়ে চমৎকার এক গল্প শুনলাম সেদিন। এক বিখ্যাত কোম্পানীর ডিরেক্টর গেছেন নিউইয়র্ক। তিনি নিজে এক ব্যাভেরিয়ান। প্রয়োজনীয় খোঁজ পত্র করছেন যখন হঠাৎ তাঁর নজরে প'ড়লো স্থানীয় দুই জর্মন এঞ্জিনীয়ার কেউ কারো সঙ্গে কথা বলেন না। দু'জনকেই তিনি চেনেন। ভাল লোক ব'লেই জানেন তবে এদের মধ্যে বিরোধ কিসের ? পরে খেয়াল হ'লো ত্রুটি তার নিজেরই। গলদটা মৌলিক। একেবারে গোড়ার জিনিস। একজন এঞ্জিনীয়ার এসেছেন নিউরেমবার্গের পুরোনো ঘরানা থেকে, অপর জন ফুয়ের্থের।

প্রথমে অবশ্য বন্ধুত্ব ছিল বেশ। সৌহার্দ্যের বন্ধন ছিল দুজনার। কি সূত্রে দু'জায়গার কুলমর্যাদা নিয়ে তর্কের সূত্রপাত। মন কষাকষি সেই থেকেই। কৌলীন্যের দখল নিয়ে তিক্ততা এরকম দাঁড়ালো যে কথাই বন্ধ হ'য়ে গেল দুজনার। চতুর ডিরেক্টর

প্রমাদ গুনলেন। হামবুর্গে ফিরে এসে একজনকে চালান ক'রে দিলেন শিকাগো।

হাততালি দিয়ে উঠলো পালোয়ান। ভয়ানক খুশী সে! সোফার হাতের ওপর ভেঙে পড়ে বলেঃ এরা দেখছি আমাদেরও হার মানালো!

ছোট্ট করে তাকাল মজুমদার। বলেনঃ আপনি দেখছি মর‍্যাল্ সাপোর্ট্ পাচ্ছেন! সর্বত্র এসব কিছু না কিছু থাকেই! মুখে না বল্লেও উত্তর জর্মনির কুলীন সন্তান, 'হোয়ক্ ডয়েচে'র কৌলীণ্য যার ঠোঁটে, নাক তার কিছু উঁচু হবেই। হ্যানোফার বা হামবুর্গের ছেলে ব্যাভেরিয়ান কোনও তরুণীকে দেখে অতি সহজে উদ্‌বাহু হয়ে ওঠেন না।

আমাকে এক রকম থামিয়ে দিয়ে বলে চলেন আবারঃ তবে বাইরে থেকে চট্ করে এসব ধরা পড়ে না। 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই,' আমাদের দেশের কবির কথা। এদের চিন্তায় তার যথেষ্ট রকম ফের ঘটেছে। এরা জানে সবার উপরে জর্মনি সত্য, অন্য কিছু নয়। অতি সাধারণ কিছুকে, তুচ্ছ ঘটনাকে আমরা যে রকম বড় ক'রে দেখি, এদের সে সবে খুব ভ্রুক্ষেপ আছে ব'লে মনে হয় না। সাইকেলের সঙ্গে পথচারীর ধাক্কা লাগলে হাতাহাতির প্রয়োজন নেই। মোটার খারাপ হ'লে পেছনের অপরিচিত গাড়ী পাশে এসে না থামাটাই অস্বাভাবিক।

মজুমদারের কথা মিথ্যে নয়। সাইকেল দুর্ঘটনা চোখে পড়েনি। গাড়ী বিভ্রাটেও আমি পড়িনি। কিন্তু পথে ঘাটে ট্রাফিক পুলিশের অপ্রতুলতা দেখে অবাকই হয়েছি প্রথমে। কলকাতায় দেখেছি, দুপা এগুলেই পুলিশ। শুধু চৌরঙ্গীর ধারে কাছে নয়, ডিহি শ্রীরামপুরেও। 'নৃত্যেরই তালে তালে'র ভঙ্গিতে নয়, অনেকটা শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষ এক মুদ্রার গড়ন দিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে হাতছানি দিতে দেখেছি তাদের। কিন্তু এখানে সে দৃশ্য সহসা চোখে পড়ে না। 'ডিপার্টমেণ্টাল

স্টোরস-র সামনের চৌরাস্তায় এইমাত্র দেখে এলাম ট্রাফিক পুলিশ অনুপস্থিত।

তাই ব'লে মোটারের কি অভাব আছে এখানে? ট্রাফিকের কি কিছু কমতি আছে এদেশে! আসলে গোটা জিনিসটাই আমরা দেখি অন্য চোখে। আসল ছেড়ে নকলে আমাদের কৌতূহল। কারণ ছেড়ে অকারণেই আমাদের আগ্রহ বেশী।

অপরকে উপেক্ষা করবার অতি সনাতন মনোবৃত্তি আমাদের জন্মগত। মিটিয়ে নেওয়াটা আমরা জানি হেরে যাওয়ারই হেরফের। পরাজয়ের রকম ফের মাত্র। 'কম্‌প্রোমাইজ' মাথা নীচু ক'রে, বুক ফুলিয়ে নয়।

সামান্য ভ্রান্তিতে গাড়ী থেকে মুখ বার করে অতিসহজে কোন প্রৌঢ় ভদ্রলোক-কেও তার 'ড্রাইভিং লাইসেন্স'-র বয়স জিজ্ঞাসা করি। হাত পাকাতে লেকের নির্জন স্থান বেছে নেবার সুপরামর্শও দিয়ে থাকি। সামনে যদি পড়ে ৩৮'য়ের মরিস্‌ পেছনের ক্রাইস্‌লার তাকে গ্রাহ্যে আনবেন কি কোরে! টেক্কা দেওয়াতেই আমরা অভ্যস্ত; তাই বাহাদুরী নিশ্চয়ই আছে ওভারটেকে।

এখানে অবস্থা কিছুটা অন্য রকম। অপরকে জায়গা করে দিয়ে নিজেকে সামান্য অসুবিধায় পড়তে হ'লে অসহিষ্ণু হন না কেউ। এদের ধৈর্য আছে। এদিক দিয়ে সংযমীও। অন্যের সঙ্গে অপরের সম্পর্ক প্রতিযোগীর নয়—সহযোগীর। ট্রাফিক এখানে হট্টগোল পাকায় না। 'কে আগে যাব' নিয়ে গ'ড়ে উঠে না কোনও মর্মান্তিক অব্যবস্থা।

কফি খেলাম সুন্দর। সেই সঙ্গে দামী সিগারেটের আপ্যায়ন। পালোয়ান দেখলাম ঘড়ি দেখছে।

ক্যামেরার প্রসঙ্গ আর তোলা হয়নি। 'রেড ফিল্টার' একটা নিলে পালোয়ান। আমাদের সঙ্গে কথায় কথায় অনেকটা এগিয়ে দিলেন মজুমদার। হাত জোড় ক'রে মাথা নত ক'রে নমস্কার জানান।

দীর্ঘ গড়ন। সুন্দর পোষাক। কালো সুটের সঙ্গে মানিয়ে পরা টাই। স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে সহজ এক আকর্ষণ আছে।

পথে নেমে আক্ষেপ করছিল পালোয়ান। বলে: তোর সঙ্গে কাল দেখা হ'লে খুবই ভালো হতো। আয়না হামবুর্গে, আয় না!

তারপর রেল স্টেশন।

মিউনিকে যাবার শেষ গাড়ী। লোক আছে স্টেশনে, তবে ভীড় নেই।

প্রথম শ্রেণীর কামরাটি সম্পূর্ণ খালি পাওয়া গেল। জুত হয়ে বসে গায়ের ওভারকোটটি এক ঝটকায় খুলে ফেলে তার পকেটের জিনিস-গুলোর কিছু কোটের পকেটে পুরলে। বাকিটা রাখলে ট্রাউজারের পকেটে।

আদেশের সুরে বললে তারপর: তোর ঐ ধোকড়াটা খোল তো! ভেবেছিস আমি ভুলে গেছি, না? খামকা কতকগুলো খরচ করা বোকামো হবে। দেখি এটা তোর গায়ে কিরকম দাঁড়ায়!

বাধা দেওয়া অর্থহীন। পালোয়ানকে আমি খুব চিনি। রেন্ কোট-টা খুলে ফেললাম্। ওভারকোটটা গায়ে তুলি।

আনন্দ হ'লে পালোয়ান হাততালি দেয়। বোতামগুলো আঁটতে আঁটতে বলে: অপূর্ব! প্রিন্সের মত দেখাচ্ছে তোকে! চমৎকার মানিয়েছে, ফিট তো করেছে বেশ!

ট্রেণ ছাড়বার সময় হ'লো। উঠে পড়ি। ঠিক এই সময়ই বিরাট এক সুটকেশ নিয়ে এক ভারী গড়নের অল্প বয়সী ভদ্রলোক তাড়াহুড়ো করে গাড়ীতে ওঠেন। সঙ্গে এক তরুণী। দেখে মনে হলো স্বামী-স্ত্রী। অথবা আগামী কোন দিনের হোনেওয়ালা আর হোনেওয়ালী।

ক্ষিপ্রতার সঙ্গে সুটকেশটা রাখলে। পালোয়ানের পিঠে পিঠ রেখেই মেয়েটি তাড়াহুড়ো করে ভদ্রলোকের কণ্ঠলগ্ন হ'য়ে শব্দ ক'রে এক চুমু খেলো। বজ্রাহতের মত কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে পালোয়ান।

মেয়েটি এক রকম লাফিয়ে নামলে ট্রেণ থেকে। অসহায়ের দৃষ্টিতে পালোয়ান বলে ঃ এটা কি রকম হলো বলতো! কোন রকম একটা ইয়ে…।

ইয়ে টিয়ের সময় ছিল না! ট্রেণ ছেড়ে দিল।

রেণকোটটা কাঁধে নিয়ে স্টেশন থেকে পথে নেমে আসি। বেশ রাত। ট্যাক্সির খোঁজ করি।

পকেটে হাত দিতেই কি যেন একটা ঠেকলো। দাঁড়িয়ে পড়ি। চামড়ার ছোট্ট একটা প্যাকেট। পালোয়ানের নতুন কেনা ফিল্টারটা।

হাইনৎস্ নিকলের সঙ্গে আমার পরিচয় ডাক্তারখানায়। বয়সে কিছুটা বড়। অবিন্যস্ত একমাথা চুল, চোখে মোটা শেলের চশমা। পরণে মহার্ঘ পোষাক। কিন্তু পরিপাটি নয়—অগোছালো। কিছুটা উদাস দৃষ্টি। পরিমিত কথা। ঠোঁটের হাসিটিও অপরিমিত নয়।

নিকল চিত্রকর। ছবি আঁকা নেশা। পেশাও। বেসরকারী কোনও এক বিখ্যাত প্রচার দপ্তরের আর্ট ডিজাইনার। তাছাড়া বইয়ের কভার আঁকবার কাজেও এক প্রকাশকের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ আছেন।

ভদ্রলোকের ঠোঁটে অবনী ঠাকুরের নাম শুনে আমি চমকে উঠেছিলাম। টানতে টানতে সেদিন রেঁস্তরায় নিয়ে গিয়ে লাল ব্রাণ্ডির অর্ডার দিতে এক মুহূর্ত আমার দ্বিধা হয় নি। এ যেন হারিয়ে ফেলা অনেক চেনা এক মানুষকে খুঁজে পেলাম।

নিকল কিছুটা বিস্মিত। একবার তাই কৌতূহলের হাসি হেসে বললেনঃ বিজ্ঞানের ছাত্র আপনি কলে কারখানায় আপনার আনাগোনা। ছবিতে আপনার আগ্রহ দেখে অবাক হলাম।

হেসে বলেছিঃ গলায় যার সুর নেই, তার কান কি দোষ করলে! তুলি ধরতে নাইবা জানলাম, চোখ দিয়ে দেখতে কি দোষ!

টেবিলের সামনে ঝুঁকে প'ড়ে কিছুটা নীচুগলায় বলেনঃ আপনাকে আমার প্রয়োজনও আছে। আলাপ হ'লো ভালোই হ'লো। দয়া ক'রে আপনাদের দেশের পর্দ্দা, শাড়ী, আর ছিট কাপড়ের কিছু ডিজাইন সংগ্রহ করে দিতে পারেন আমাকে? অপূর্ব পর্দ্দা, এত সুন্দর কাজ করা ছিট আমাদের দেশে পাবেন না। কিছু সংগ্রহ আছে আমার, কিন্তু আপনি সে দেশের মানুষ, আপনার ভালো জানা আছে।

কিছুটা অবাকই হয়েছি আমি। বলেছিঃ ও সবে আপনার কি প্রয়োজন? ভারতীয় কাপড়ের নানা ডিজাইন দেখে আপনার লাভ?

নিকল মাথা দুলিয়ে এক পশলা হাসলেন। বললেন: ওরিয়েণ্টাল আর্টের ওপর ইয়োরোপের নজর বহুদিনের। আমেরিকান নাইলন আর এক ঘেয়ে প্রচণ্ড টকটকে কটকটে রঙের দাপটে সবাই হাঁপিয়ে প'ড়ছে। ডিনার সেটে জাপানী ড্রাগন এদের ভালো লেগেছে। দামী পোষাকে চীনা আর্টিস্টের বাঁশের ইম্‌প্রেশন্‌ মেয়েদের মনে ধরেছে আমি লক্ষ্য করেছি। আমি ভারতীয় বয়ন শিল্পের নানা নক্‌শা থেকে কিছু কাজ ক'রতে চাই। প্রচুর সম্ভাবনা আছে এ দেশে। প্রয়োজনীয় খরচ পত্তর আমি ক'রবো। আপনাকে নিতে হবে সংগ্রহের ভার।

বুঝলাম নিকল এক জাতের শিল্পী। আমার পরিচিত চরিত্রের সীমারেখার বাইরে। সরস্বতীর পূজো বসিয়েছেন হয়তো কিন্তু লক্ষ্মীর আরাধনা বন্ধ নেই। আমার কাছে তাই ডিজাইনের খোঁজ। ভারতীয় বয়নশিল্পের নক্‌শা নিজের ঢংয়ে সাজিয়ে এদেশে পরিবেশন ক'রতে চান। জর্মন নাড়ীতে ঝঙ্কার তুলতে চান আমাদের জাম্‌দানি শাড়ী দিয়ে।

অনুরোধ সামান্যই। নিকলের কথায় আমি খুশীই হ'য়েছি। ব'লেছি: সাধ্যমত কিছু সংগ্রহ ক'রে আপনাকে আমি দেবো। কালই আমি পত্র লিখবো দেশে। আপনার উদ্দেশ্য শুভ।

জবাবদিহির সুরে বলেন: নজীর টেনে লাভ নেই বিশুদ্ধ ছবি এঁকে পেট ভরে না।

একটি সিগারেট ধরিয়ে নিকল বলেন: প্রায় মাস খানেক ঘোরা ঘুরির পর কাল একখানা ছবি বিক্রী করলাম। পাঁচ-শ মার্কে-ই ছেড়ে দিলাম। পরে হয়তো একশ মার্কের খরিদ্দার পাওয়াই দুষ্কর হবে। শুধু ছবি আঁকা নিয়ে থাকলে কি আর চলে?

আমার নিজের দেশের অবস্থা দেখে নিকলের কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। আমাদের দেশে যিনি শুধু ছবিই আঁকেন, তিনি মরেছেন। সাহিত্যকে যিনি পেশা করেছেন বাঙ্গলা দেশে, তার

অবস্থা কি! 'লেখেন তো, করেন কি—প্রশ্নের সামনে পড়তে তাঁকে হবেই। কবিতা যিনি লেখেন তার দিবারাত্রির কাব্যে রসদ আসে কোথা থেকে? খরচের হিসেব মেলাতে তাঁকে খিদিরপুরের ডকে দশটা-পাঁচটা মেনে নিতে হবেই।

বিশুদ্ধ শিল্পের সর্বত্রই প্রায় সমান হাল।

নিকল কোটের পকেট থেকে চওড়া একটা খাম টেনে বার ক'রলেন। তার থেকে কতগুলো ফটোগ্রাফ মেলে ধরলেন টেবিলে। নিকলের আঁকা ছবির ফটোগ্রাফ। একই ছবির দু'তিনটি কপি। মোট তিনটি ছবি। 'ফুলদানীতে ফুল,' 'শীতের সন্ধ্যা' ও 'ব্যস্ত কুরফুরস্টেনডাম'।

শেষের ছবিটির কথাই নিকল ব'লছিলেন। বার্লিনের কুরফুরস্টেন-ডাম। তারই ছবি। ফটোগ্রাফ দেখে অবশ্য আসল ছবির হদিশ মেলে না। তবে জমাট ভরা ছবি। আলোকোজ্জ্বল রাস্তায় লোকের ভীড়। দামী দামী গাড়ী। ফুটপাতের ওপর কাফে-টেরাসে চমৎকার এসেছে ছবিতে।

তবু 'শীতের সন্ধ্যা' আমার ভালো লাগলো। নিকলের কথায় মনে হ'লো 'ব্যস্ত কুরফুরস্টেনডাম' ছবিটি দেখে আমার কিছু উচ্ছ্বসিত হওয়া উচিত ছিল। হেসেই বললেন একরকম: সুযোগ পেলে আসল ছবিটি দেখাবো আপনাকে।

চারিত্রিক কাঠামো আমার কিছুটা আঁট আর বেয়াড়া মাপের। মানিয়ে নেবার অতি সনাতন পদ্ধতি আমি ঠিক রপ্ত ক'রতে পারি না। আলাপ ক'রতে পারি সহজেই। অন্যের প্রলাপেও আমার আপত্তি নেই। কিন্তু সর্বত্র নয়, সবার সঙ্গে নয়। ভালো কথা নিয়ে হাল্কা গল্প চলে। বাজে কথা নিয়ে ফাঁকা কথা বরদাস্ত ক'রতে পারি না।

তাই পিকাসোর আঁকা 'শান্তির পায়রা' নিয়ে নিকল অশান্ত হ'লে খারাপ লাগে না। কিন্তু হ্যানোফারের এক লক্কা পায়রার সঙ্গে ব'সে

প্যারীর নাচনেওয়ালীর ক্লান্তিকর খেমটা গল্পের নাচানাচি অসহ্য গুমোট মনে হয়।

সেদিক দিয়ে নিকল সম্পূর্ণ অন্য ধাতুতে গড়া। ইদানীং ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার হামেশাই দেখা হচ্ছে।

গল্পে গল্পে রাত হ'য়ে যায় বাড়ী ফিরতে। একদিনও ইনি রেস্তঁরার বিল আমাকে মেটাতে দিচ্ছেন না। শুধু বলেন ঃ আপনি আমার দেশে অতিথি। এই মুহূর্তে অর্থের বড় অকুলানও নেই আমার। আমাকেই দিতে দিন।

আমি কিন্তু পীড়িত হয়েছি তাঁর মর্ম্মান্তিক ভূগোল জ্ঞান দেখে। আমার দেশের অতি সাধারণ মানুষের জর্মনি সম্পর্কে যেটুকু কাণ্ডজ্ঞান আছে, ভারত সম্পর্কে নিকলের তার সিকি ভাগও জানা নেই।

অবশ্য তাতে তার কিছুই যায়-আসে না। ভারতের মাপ-জোখের অফিসে সে কোনও কালেই কাজ নেবে না।

মজুমদার সাহেবের দোকানে কিছুক্ষণ আড্ডা দিয়ে নিকলের গন্ধে গন্ধে হাজির হই রেস্তরাঁতে। সন্ধ্যেতে তাঁকে এখানেই পাওয়া যায়। বাঁদিকের সেই পরিচিত কোনের চেয়ারে ব'সে দরজার দিকে তাকিয়ে আছেন নিকল। আমারই যেন অপেক্ষায় ছিলেন।

বিয়ার নিয়ে বসা গেল।

কি প্রসঙ্গে যুদ্ধের কথা উঠেছিল। 'ওপেন সিটি' প্যারী-র বর্ণনা শুনছিলাম।

এমন সময় আচমকা এক ঝনঝনানিতে সারা রেস্তঁরা কেঁপে উঠলো। কাচ ভাঙ্গার যেন আওয়াজ পেলাম অপরপ্রান্ত থেকে।

কালো স্যুট পরা এক লম্বা লোক রেস্তঁরার বৃদ্ধ মালিককে শাসাচ্ছে। বিয়ারের ভারী মগটি তার হাতে প্রতিবাদের ঢঙে রুখে দাঁড়িয়েছে। একজন ক্ষিপ্রতার সঙ্গে হাতটি ধরে ফেলে। লোকটিকে

শান্ত করতে চেষ্টা ক'রছেন আর একজন। বৃদ্ধ ভদ্রলোক চওড়া গোঁফের প্রান্ত ধ'রে প্রবল বেগে মাথা নাড়ছেন।

দেখলাম লম্বা লোকটিকে দু' ভদ্রলোক টানতে টানতে সামনে নিয়ে আসছে। লোকটি খোঁড়া—ডানহাতটিও নেই। এক মুখ দাড়ি। খাড়াই নাকের দুপাশে চোখ দুটি জ্বল জ্বল করছে রোষে। শুধু চীৎকার ক'রছে একটানা : আমার দিকে অমন ক'রে তাকাবে কেন! অমন ক'রে তাকাবে কেন আমার দিকে?

শুনলাম লোকটি উন্মাদ।

কোন ফাঁকে নিকল উঠে গেছেন খেয়াল করিনি! দেখলাম তিনি শান্ত ক'রতে চেষ্টা ক'রছেন লোকটিকে। চেঁচাতে চেঁচাতে রেস্তরাঁ ছেড়ে চ'লে গেল লোকটা।

দেয়ালে টাঙানো একটি ছবির কাচ দেখলাম চুরচুর হ'য়ে গেছে। কাঁচের ভাঙা টুকরো ছড়িয়ে প'ড়েছে সবুজ কার্পেটে। ফ্রেমের মধ্যে প্রায় উলঙ্গ এক নারীর দেহ দেয়ালে তখনও দুলছে।

নিকল ফিরে এলেন। জিজ্ঞাসা করি যুদ্ধে এরকম বহু লোক হাত পা খুইয়েছে না? মারাত্মক কোনও আঘাতেই বোধ হয় মাথাটা গেছে নষ্ট হয়ে।

কয়েক মুহূর্ত পর নিকলের জবাব এলো : একদম না! যুদ্ধে ওর হাত পা যায় নি। মাথা নষ্ট হয়নি বোমাতে।

সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললাম : আপনি লোকটিকে চেনেন নাকি?

নিকল কেন জানি না কয়েক মুহূর্ত চুপ ক'রে রইলেন। তারপর চোখ তুলে বলেন : খুব চিনি! হয়তো এ পৃথিবীতে আমিই সবচেয়ে ভালো ক'রে জানি! অনেক বেশী ক'রে চিনি ব্রুনোকে।

আমি কিছুটা কৌতূহলী হ'য়ে পড়ি। আগ্রহের সঙ্গে প্রশ্ন করি : কই আপনাকে উনি চেনেন বলে তো মনে হ'লো না?

আপন মনেই ব'লে চলেন নিকল : কাউকেই আর চেনে না ব্রুনো।

মাথাটা সম্পূর্ণ নষ্ট হ'য়ে গেছে। ইদানীং বেশ চুপচাপই ছিল। গোলমাল তো বড় করে না।

আমাকে ঠিক শোনানোর খাতিরে নয়। কিছুটা যেন আনমনা হ'য়ে কথাগুলো ব'লে গেলেন।

জিজ্ঞাসা করি : ঐ ছবিটার ওপরই বা ওর এত রাগ কেন? একেবারে চুরমার ক'রে দিয়ে গেল কাচটা।

বিয়ারের পাত্রাধারে চোখ রেখে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইলেন নিকল। তারপর কিছুটা নীচু গলায় বলেন : আজ শহরের এক অবস্থা, যুদ্ধের পর এই নিউরেমবার্গের ছিল অন্য হাল। ব্রুনোর কথা জানতে হ'লে আমাদের কিছু পিছু হ'টতে হবে। প্রথম থেকেই আপনাকে আমি বলবো। গোড়া থেকেই শুনুন তবে :—

অভিজাত জর্মন বংশে ব্রুনোর জন্ম হয়। পিতা ছিলেন ডাক্তার। কাকা উচ্চপদস্থ কর্মচারী। শৈশব ও কৈশোর প্রাচুর্যের মধ্যেই কেটেছে ব্রুনোর।

এক রাজদ্রোহীকে বাড়ীতে আশ্রয় দেবার অপরাধে ব্রুনোর পিতা একেবারে হাতেনাতে ধরা পড়েন। মানুষের দেহে রোগের হাঁটা চলা তিনি ধরতে পারতেন অতিসহজেই। কিন্তু রাজনৈতিক মতলববাজ-দের কোন হদিশই তাঁর জানা ছিল না। 'মাইন্ কাম্ফ' না প'ড়েই তিনি হিটলারকে ভোট দিয়েছিলেন। গোঁফটিও তিনি অনেকটা তাঁর ধাঁচেই গ'ড়েছিলেন। কিন্তু সহপাঠী বন্ধুটি যখন গভীর রাত্রে তাঁর বাড়ীতে এসে রক্তাক্ত দেহ থেকে গুলিটি বার ক'রে দেবার করুণ মিনতি জানালেন ব্রুনোর পিতা ফিরিয়ে দিতে পারেন নি। তার বন্ধুটি যে রাজদ্রোহী একথা তিনি মুহূর্তের জন্যেও ভাববার সময় পাননি।

ব্রুনোর পিতাকে হিটলার নিক্ষেপ করলেন কারাগারে। সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করলেন। ব্রুনোর কাকাকেও চাকুরী খোয়াতে

হ'লো। কিছুকাল পরে বন্দী শিবিরেই দুরন্ত টাইফাস রোগে ক্রুনোর পিতা মারা যান।

ক্রুনোর ছোট্ট বাড়ীতে অন্ধকারের স্তূপ জমা হ'তে লাগলো। শিকারীর সন্ধান পেয়ে প্রাণ ভয়ে ভীত নিরীহ প্রাণী যে ভাবে আত্মগোপন করে, কিশোর ক্রুনোর অনেকটা যেন সেই অবস্থা।

পরিচিত সবাই ভয়ে ক্রুনোর পরিবারের ধারে কাছে ঘেঁষে না। সমাজ ছোঁয়া বাঁচিয়ে চ'লতে লাগলো। পৃথিবীর মানুষের কাছে সে যেন কিছুটা পায়ে ঠেলা।

অভিজাত পরিবারের একমাত্র পুত্র ক্রুনো শিশি বোতলের দোকানে কাজ নিল। মায়ের নীরব কান্নাই দেখেছে ক্রুনো। হাসতে যেন দেখেনি কোনও দিন!

ছবি আঁকায় শৈশব থেকে ক্রুনোর হাত ছিল। একফালি কাগজ পেলে শিশু মনের বিচিত্র আঁচড়ে ভরিয়ে তুলতো পাতাটি। সব গেল। শুধু ছবির শখটুকু ক্রুনোর নির্মূল হ'লো না।

শিশি বোতলের দোকানের সামান্য উপার্জন থেকে কিছু কিছু অর্থ সে আলাদা করে রেখেছে কাগজ আর পেন্সিলের জন্যে। রঙ ও তুলির জন্যে গোপন ক'রেছে কয়েক মার্ক।

অতি সচ্ছল জীবনের প্রাচুর্য থেকে নিক্ষিপ্ত ক্রুনো শুধু প্রাণ ধারণের, দিন যাপনের দুঃসহ গ্লানি ধীরে ধীরে মেনে নিল। অভাব আর ভয়ের মধ্যেই তার প্রথম যৌবনের আত্মপ্রকাশ।

তারপর মহাযুদ্ধ।

ক্রুনোর সঙ্গে নিকলের বন্দী শিবিরে পরিচয়। অনেকের সঙ্গে ওরা আটকা প'ড়েছিল সিসিলিতে। পোড়া রুটি আর এক হাতা ঝোলের লাইনে নিকল ক্রুনোর পেছনেই তার জায়গা ক'রেছিল।

যুদ্ধ শেষে নিকল ফিরে এলো দেশে। ক্রুনো তার নিউরেমবার্গের বাড়িতে ফিরে এলো।

কেমন যেন বোবায় পেয়েছিল প্রথমে। দৃশ্যমান জগতের সবকিছু

তার নিজের জীবনের মতই বড় শুষ্ক—বড়ই উষর। গাছে পাতা হয়তো আছে, কিছু বিবর্ণ তার রঙ। শীর্ণ ডালগুলি কঙ্কালের মত মনে হ'লো। ফুল বাগানে ফুল নেই। বারুদের গন্ধ উঠছে মাটি থেকে!

এক সহজ বৃত্তি ব্রুনো প্রথমে বেছে নিল। রেল স্টেশনে, সিনেমা হলে আর হাটে বাজারে সারাদিন ঘুরে বেড়াতে লাগলো। বিদেশী সৈনিকদের কাছে মাত্র কয়েক মার্কের বিনিময়ে সে কাজ নিল দোভাষার। ইংরেজীতে তার যেটুকু জ্ঞান ছিল, তাতে তাদের সস্তা রসিকতা, দরদাম আর হুল্লোড়ের ব্যাখ্যা ও অপব্যাখ্যা কিছুমাত্র অসুবিধের নয়।

রাত্রে ব্রুনো ছবি আঁকতো। সে পৃথিবীতে সে স্বাধীন। সেখানে সে একা। সেখানেই বোধ হয় সে ছিল অদ্বিতীয়।

আকাল আর আকাল। সামান্য একটুকরো চকলেট, এক পাত্র নিকৃষ্ট মদ বা সিগারেটের বিনিময়ে যে কোনও বিদেশী সৈনিক অতি সহজেই কোনও সুন্দরীর চূড়ান্ত সর্বনাশ ঘটাতে পারে। সর্বত্র কুশ্রীতা আর অশুচিতা। অব্যবস্থা আর অসংযম। তারই বিক্ষোভ ব্রুনো তুলির আঁচড়ে ফুটিয়ে তুলতে লাগলো।

সেদিন ছিল দুর্যোগের রাত। রেলস্টেশনে ব্রুনো আটকা পড়েছিল। লম্বা ঢেঙা মেয়েগুলো ঘুর ঘুর ক'রছে। উলঙ্গ পায়ের চলনে, দেহভঙ্গির বিভ্রমে, অশ্লাল খাটো আঁট পোষাক পরা মেয়েরা শিকার ধরতে ব্যস্ত। বিবর্ণ দেহ, পাণ্ডুর মুখশ্রী, টকটকে লাল এক জোড়া পাতলা ঠোঁটের ফাঁকে সস্তা সিগারেট গোঁজা।

একজন লম্বা রোগা ইয়াঙ্কী তার ইয়ার বন্ধুদের পাশে রেখে একটি মেয়ের সঙ্গে অশ্লীল হাসাহাসি ক'রছে। একমুঠো চকলেট মেয়েটির ব্লাউসের ফাঁকে ঢুকিয়ে দিয়ে বিকারগ্রস্থ রোগীর মত লাফাচ্ছে।

নিজেকে সংযত ক'রে সেখান থেকে সরে গেল ব্রুনো।

আকাশ অশান্ত। প্রবল বর্ষণ চলেছিল বাইরে। পাশ ফিরতেই হঠাৎ নজরে এলো। কিছুটা দূরে, কোণের দিকের প্যাকিং বাক্সের স্তূপের পাশে একটি মেয়েকে দেখে থমকে দাঁড়ালো ব্রুনো।

অন্ধকার আকাশের দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে আছে মেয়েটি। পরণে অতি সাধারণ পোষাক। মলিন জুতো, ম্লান মুখশ্রী। সমস্ত পরিবেশের মধ্যে মেয়েটি যেন কিছুটা সঙ্কুচিত। নিজেকে যেন আড়াল ক'রে রাখতে চায়।

কিন্তু স্টেশনে কেন? এই দুর্যোগের রাতে, কিসের তাগিদে, কার অপেক্ষায়? ব্রুনো কয়েক মুহূর্ত কি যেন চিন্তা ক'রলো তারপর এগিয়ে এলো সামনে। এতো অন্য জাতের মেয়ে। এতো শিকার ধ'রতে আসেনি।

মুখোমুখি সামনে এগিয়ে এসে ব্রুনো একেবারে সোজা প্রশ্ন করলেঃ এত রাত্রে এখানে। বিপদে পড়েছেন আপনি?

প্রথমে বোধহয় ভয়ই পেয়েছিল মেয়েটি। জবাব তার ঠোঁটে আসেনি অনেকক্ষণ।

কিছুটা নড়েচড়ে, ঠোঁটে সামান্য হেসে ব্রুনো আবার বলেঃ জায়গাটি খুব ভালো নয়। নেকড়েরা ঘুরছে সামনে।

মেয়েটি এবার কিছুটা এগিয়ে এলো। অসহায়ের দৃষ্টি চোখে। কণ্ঠেও এক নীরব ভীতি। কাঁপা গলায় বলেঃ আমার মায়ের আসবার কথা ছিল। কিন্তু তিনি আসেননি। রাত হচ্ছে অনেক, দুর্যোগের জন্যে আটকে আছি।

কথার ঢঙ দেখে মনে হয় মেয়েটি বিদেশী। চেহারাতে আভিজাত্যের ছাপ সুস্পষ্ট। চাউনীতে বিন্দুমাত্র কলুষ নেই।

ব্রুনো বলেঃ এদেশে পালিয়ে এসেছেন নিশ্চয়ই।

সুন্দর এক টুকরো হেসে কিছুটা বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বলেঃ চেহারাতে তার ছাপ আছে বুঝি?

ব্রুনো মাথা নেড়ে বলেঃ চেহারাতে নয়—কণ্ঠে। আপনার কথাতেই ধরা পড়ে। পূবের কোন্ দেশ থেকে আপনার এদেশে আসা ?

মেয়েটির নাম সারা। চলে এসেছে বার্লিনের রুশ এলাকা ছেড়ে। পরিবারের অর্দ্ধেক নিহত হ'য়েছেন যুদ্ধে। দু'জনের কোনও খোঁজ নেই। মায়ের সঙ্গে সারা পালিয়ে এসেছে এখানে।

ব্রুনো জানতে চাইলোঃ রুশ এলাকা কি বিপদজনক ?

সারার কোন জবাব এলো না।

কৌতূহলী ব্রুনোর জানতে ইচ্ছে করে সারার কথা। চাপা গলায় বলেঃ মড়ক বা অনাহার নিশ্চয়ই সেখানে ?

সারা কয়েক মুহূর্ত কি যেন ভাবলে। তারপর বলেঃ না।

ব্রুনোর কৌতূহল বিস্ময়ে গিয়ে পেঁাছোয়ঃ তবে এদেশে এসেছেন কিসের লোভে ? রুশ এলাকা ছেড়ে এসেছেন কেন ?

নরম বুক যেন দুলে উঠলো সারার। আর্দ্র কণ্ঠে বলেঃ ভয়ে !

ব্রুনো যেন থামবে না। তার আবার জিজ্ঞাসাঃ ভয়ে ? কিসের ভয় সেখানে ?

উত্তর এলো সারারঃ কমিউনিস্টদের।

আকাশ শান্ত হ'লো অনেক পরে। বৃষ্টি থেমেছিল সেদিন অনেক রাতে। সারার ঘর পর্যন্ত ব্রুনো পেঁাছে দিল। স্যাঁতস্যাঁতে শীর্ণ গলি। সেওলা ধ'রেছে দেয়ালে। অস্পষ্ট আলোতে অনভ্যস্ত পথে দুবার হোঁচট খেলো ব্রুনো। ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে সারার অনেক কথা। একটা কথার শেষে সারার অন্য প্রসঙ্গ সুরু।

বিদায় নিয়ে উল্টোমুখো ফিরতে গিয়ে দাঁড়াতে হলো ব্রুনোর। সারার নিম্ন কণ্ঠের ছোট্ট প্রশ্নঃ আবার আমাদের দেখা হবে না ?

কিছুমাত্র অবাক হয়নি ব্রুনো। ধীরে সহজ সামান্য হেসে জবাব দিলঃ হবে।

ব্রুনো তার কথা রেখেছিল ঠিকই। দেখা ক'রেছে সারার সঙ্গে। সারাদিনের খাটুনির পর কি দুরন্ত আকর্ষণে ছুটে যায় সারার সন্ধানে। বাড়ি ফিরে সারারাত্রি সে ছবি আঁকতে পারতো অক্লেশে। তার হৃদয় জুড়ে তখন শুধু সারা আর সারারাত্রি। এক দুরন্ত প্রেরণা পেয়েছে ব্রুনো। সুন্দরকে সে সাজাবে। সত্যকে সে প্রকাশ ক'রে দেবেই।

জীবনের সুরুতে, আচমকা এক প্রচণ্ড আঘাতে ব্রুনো এসে ঠেকেছিল পথের ধূলোতে। অঘটন আর দুর্ঘটনার অতি সহজ শিকার সে প্রথম থেকেই। সুন্দর কোনও কিছু তাকে ভালোবাসেনি। জীবনের সমস্ত সুখ বারুদের তেজালো গন্ধের তলায় চাপা প'ড়েছিল। সারা যেন তার সুষুপ্ত হৃদয়ে অফুরন্ত এক প্রাণের সাড়া নিয়ে এলো।

শীতের এক সন্ধ্যায় ব্রুনো সারাকে তার ঘরে নিয়ে এলো। কোলাহল নেই। আড়ম্বর নেই। নীরবেই সে অনুষ্ঠান সম্পন্ন হ'য়েছে।

প্রথমটায় ঠিক সহজ হ'তে পারেনা ব্রুনো। কেমন যেন ভয় হ'য়েছিল তার। সারাকে কি সে সুখী ক'রতে পারবে?

চতুর মেয়ে সারা। ব্রুনোর দুর্বলতাকে সে আড়াল ক'রেছে। একথা সেকথা তুলে, ভিন্ন প্রসঙ্গ এনেছে। নীরব হাসির স্নিগ্ধ সুষমায় ব্রুনোর সমস্ত সংশয় সে ভুলিয়ে দিতে চেয়েছে।

এই সময়ই নিকলের এক পত্র এলো। বহুদিন পর নিকলের পত্র পেয়ে কিছুটা অবাকই হয় ব্রুনো। সুন্দর চিঠি। নাতিদীর্ঘ।

প্রিয় ব্রুনো,

সাম্প্রতিক আপনার আঁকা ছবি আমার চোখে পড়েছে। ছবিটি আমাকে অভিভূত ক'রেছে। রঙের ব্যবহার নিখুঁত। গভীরতা ছবিটিকে আরও বেশী জীবন্ত ক'রে তুলেছে।

প্রয়োজনেই লিখতে বসেছি আপনাকে। কিছু ছবির সংগ্রহ প্রকাশের ভার আমার হাতে এসেছে। তাতে আপনার একটি ছবি থাকলে আমার ভালো লাগবে।

বছর খানেক আমি এখানে আছি। মিউনিক বহু দূরের পথ নয়। একবার এখানে আস্থন। দেখা হ'লে কিছু কাজের কথা হ'তে পারে। আমার বাড়িতে জায়গার অকুলন নেই।

গুণমুগ্ধ

নিকল

নিকলের চিঠিতে অভিভূত হয় ব্রুনো। তার ছবির স্থনাম হ'চ্ছে। নিকলের ভালো লেগেছে তার ছবি।

কয়েকদিন শুধু ভেবেছে ব্রুনো। কি আঁকবে? কাকে আঁকবে। বিষয়বস্তু খুঁজে বেড়িয়েছে সে পথে পথে।

প্রায় হু'সপ্তাহ পর ব্রুনোর ছবি শেষ হ'লো। সাধারণ ছবি। বিষয়বস্তু কিছুমাত্র অসাধারণ নয়। পোড়া বিধ্বস্ত নিউরেমবার্গের রাস্তা। নিহত মায়ের স্তন পান ক'রছে শীর্ণ উলঙ্গ শিশু। সাঁজোয়া গাড়ীর খাকী কনভয় একদিকে। বিদেশী সৈনিকে মুঠো মুঠো চকলেট ছুঁড়ে দিচ্ছে পথের হুধারে। এক পাল ছেলে ভীত দিশেহারা দৃষ্টিতে ছুটছে পেছনে পেছনে। মৃত একটি গাছ। পাতা নেই তাতে।

অনেক ভেবে ছবিটির নাম দিলে ব্রুনো—'নিউরেমবার্গের কান্না'।

ছবি শেষ ক'রে ব্রুনো নিউরেমবার্গ ছেড়ে মিউনিকে এলো একদিন।

নিকলের আপ্যায়ন মুগ্ধ হবার। ব্রুনোর ঘর বাঁধবার কথা নিকল খুব মন দিয়ে শুনলেন। সারার গল্প ব্রুনো অনেকক্ষণ ধ'রে ক'রেছে। কিন্তু 'নিউরেমবার্গের কান্না' দেখে নিকলের মুখটা কেমন গম্ভীর হ'য়ে এলো। মাটির দিকে স্থির দৃষ্টি রেখে ধীরে ধীরে বলেন: আপনি শিল্পী। চিত্রকর হিসাবে আপনার পরিচয়। কিছু একটা যেন ব'লতে চেয়েছেন ছবিতে মনে হ'চ্ছে।

এমন কথা ব্রুনো আশা করেনি। কয়েক মুহূর্ত ফ্যাল ফ্যাল ক'রে তাকিয়ে থাকে। তারপর বলে: আপনি কি বলতে চান?

এক টুকরো হেসে নিকল বলেন: বড় বেশী উগ্র! ছবির মধ্যে একটা ঝাঁজ আছে। কাজের চেয়ে ঝাঁজ আসছে বেশী।

ব্রুনো উত্তেজিত হ'য়ে পড়ে। নিকল বাধা দিয়ে বলেন : আমার ভয় হয় আপনার দৃষ্টিভঙ্গি জীবনে হয়তো শান্তি দেবেনা। বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে সত্যকে এভাবে আঁকড়ে ধরলে জীবনই মিথ্যে হ'য়ে যাবে। বাস্তবের দিকে নজর রেখেই রঙ-তুলিতে বাস্তবতা তুলে ধরবার অত্যুগ্র বাসনা আপনার সংযত করা দরকার। আপনাকে সফল হ'তে হবে। সাফল্যই জীবনের আজ উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। ছবিটি নিঃসন্দেহে অতুলনীয়, কিন্তু সেই সঙ্গে আমি যেন এক বিপদের পদধ্বনি শুনতে পাই। আপনাকে আমি জানি। সিসিলির বন্দী শিবিরেই আপনাকে আমি ঠিক চিনেছি। দেশকে আমিও ভালোবাসি। কিন্তু নিজেকে কম ভালোবাসিনে।

ব্রুনো দুরন্ত আবেগে ব'লেছে : ছবির খাতিরে ছবি আমি মেনে নিতে রাজি আছি। কিন্তু কিছুর খাতিরে ছবি নিশ্চয়ই। শুক্‌নো গাছের ডালগুলোও কিছুমাত্র মিথ্যে নয়। আপনি হয়তো এ দিকটা ভেবে দেখেন নি।

সামান্য রকম উত্তেজিত নয় নিকল। প্রসন্ন হাসি। স্থির দৃষ্টি। ধীর কণ্ঠে বলেন : আমাকে ভুল বুঝে অহেতুক আপনি কষ্ট পাবেন না। আপনার চিন্তাধারা আমাকে চিন্তিত করে। হয়তো আপনার দৃষ্টিকোণ শুধু অভাব আর বিপদকেই আলিঙ্গন ক'রবে। ফুল আঁকতে পারেন না আপনি ? সুন্দরীর দেহ আঁকতে ভালো লাগে না ?

স্তব্ধ ব্রুনো। জবাব দিয়েছে ধীরে : ফুল কি আজ সত্যি ফোটে গাছে। সুন্দরীর দেহ ঘিরে আজ সিফিলিসের ঘা আপনি লক্ষ্য করেন নি ?

দুঃশ্চিন্তা আর বিক্ষিপ্ত এলোমেলো চিন্তায় তছনছ হ'তে হ'তে ব্রুনো ফিরে আসে সেই রাত্রিতেই।

ব্রুনো কিছুটা ভাবপ্রবণ। আনন্দে তার সহজ উচ্ছ্বাস, বিরক্তিতেও তাই অতি সহজ প্রকাশ।

অতি সামান্য ব্যাপার। নিতান্তই এক তুচ্ছ ঘটনা। সামান্য

এক কথাকে কেন্দ্র ক'রে সারার সঙ্গে তুমুল এক তর্ক বেধে গেল। কেমন এক কুতর্কে পেয়ে বসে ব্রুনোকে। কু-যুক্তির অবারিত ধারা সারার ঠোঁট থেকেও নেমে এলো অসঙ্কোচে।

চোখেমুখে যেন আগুন ছুটছে ব্রুনোর। হাতের কাছের অসমাপ্ত ছবিটি টুকরো টুকরো ক'রে পথে নেমে এলো।

পরিচিত কফির টেবিলে মন বসলো না। উদ্‌ভ্রান্তের মত পথে-ঘাটে ঘুরে ক্লান্ত হ'য়ে পড়ে। মন অশান্ত। বিক্ষিপ্ত চিত্ত। বাড়ীতে যখন ফিরলো তখন রাত অনেক।

মাসখানেক পর নিকলের ছবির সংগ্রহে 'নিউরেমবার্গের কান্না' প্রকাশিত হ'লো।

ক'দিন পর স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ব্রুনোকে ডেকে পাঠালো। নানা কথায়, নানা প্রশ্নে ব্রুনোকে যেন পাগল ক'রে দিল। সোনালী গোঁফ, প্রচণ্ড টাক, খুদে চোখতুটি রক্তবর্ণ সেই ভদ্রলোকের। 'নিউরেমবার্গের কান্না' ছবিটি ব্রুনোর সামনে বইয়ের পাতা থেকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো ক'রে, দরজার দিকে আঙুল তুলে বললেন : যাও!

ক্লান্ত চরণে শূণ্য মাথা নিয়ে ব্রুনো ফিরে এলো।

নিকলের সমর্থন নেই। এমন কি সারাও আর তার পাশে নেই। হিসাব মেলাতে গিয়ে ব্রুনো দেখে অনেক ফাঁক হ'য়ে গেছে নানাস্থানে। আজকাল তার ছবিতে সারার সামান্য রকম কৌতূহল নেই। ছবির নতুন কোন বিষয়বস্তুর আলোচনায় সারার আগ্রহ আর পূর্বের স্থুরে সাড়া দেয় না।

ঘরে ছিল না সারা। ব্রুনো হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে রইলো কিছুক্ষণ। মড়ার মত। বানে ভেসে আসা মানুষের মত।

সেদিন গেল। তারপর দিনও। তবু সারা জানতে চাইলে না কি প্রয়োজনে তার ডাক প'ড়েছিল। কিসের তাগিদে তলব হ'য়েছিল কর্তৃপক্ষের কামরাতে। কি শিরোপা মিলেছে সেখানে?

পরদিন সারা এরলঙ্গেন গেল। মন কেমন যেন বিদ্রোহী হ'য়ে

উঠেছিল ব্রুনোর। পীড়িতা মায়ের কাছে সারার যাওয়াতে ব্রুনোর খারাপ লাগেনি। সে কথা গোপন করার দরকার কি? রওনা হবার পূর্বমুহূর্তে তার তুচ্ছ সম্মতি চাইবার কি অর্থ হয়? বড় দূরের পথ নয়। সারাদিনে বহুবার সেখানে যাওয়া আসা চলে। তবে এত ঘটা করে যাবার দরকার কি?

সারাদিন ব্রুনো বাড়িতে রইলো। নানা চিন্তার ভীড়ে রাত্রেও তার ঘুম এলো না। নিকলের কথা বার বার তার মনে হ'য়েছে। সফল হ'তে হবে। সাফল্যই জীবনের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।

নিকলের ভুল কোথায়। তার কথা কিছুমাত্র মিথ্যে নয়। ভালোভাবে বাঁচা দরকার। সারা হয়তো কষ্ট পায়। কই সে তো সামান্য কোনও উপহারও আনেনি কোনও দিন। কতটুকু মর্য্যাদাই বা দিয়েছে সে সারাকে। অন্য দশজনে যে নিয়মে সুখী হয়, তাতে তারই বা অধিকার থাকবে না কেন। সফল হ'তে হবে। সাফল্যই জীবনের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। কিছুমাত্র ভুল বলেননি নিকল।

সারারাত লাগলো ব্রুনোর মনস্থির ক'রতে।

ব্রুনোকে দেখে নিকল প্রথমে কিছুটা যেন অবাক হলেন। সঙ্কোচের সঙ্গেই প্রশ্ন ক'রলেন: জানান না দিয়ে মিউনিকে? কি মনে ক'রে?

ব্রুনো একটানা কথা ব'লে চলে অনেকক্ষণ। কিছুটা অসংলগ্ন, কিছুটা খাপছাড়া। মাটির দিকে তাকিয়ে, কখনও দেয়ালের কোনও ছবির দিকে দৃষ্টি রেখে বা ছাইদানটি মনোযোগ দিয়ে দেখতে দেখতে ব্রুনো কথা বলে। শেষে ম্লান হেসে বলে: আপনার সঙ্গে আমার বিরোধ নেই। আমি আপনার সাহায্য চাই। আমি কাজ চাই।

নিকল বলেছেন: আমি জানতাম আপনি আমার কথা ভেবে দেখবেন। কাজ চাইছেন আপনি! আপনার মত লোকের কাজের অভাব কি? আপনি সঙ্গে থাকলে আমারও কিছু সুরাহা হয়।

—আপনার সঙ্গে আমি কাজ ক'রতে পারি।

—ঠিক বলছেন ?

—এই কথাই আপনাকে আমি জানাতে এসেছি।

—ফুল আঁকবেন আপনি ?

—আঁকবো !

—সুন্দরীর দেহ আঁকবেন আপনি ?

দিশেহারা দৃষ্টি ব্রুনোর চোখে। কিছুটা সঙ্কোচের হাসি ঠোঁটে। কণ্ঠস্বরও কুণ্ঠিত ঃ আমার আপত্তি নেই।

খুশীর হাসিতে সমস্ত পরিবেশ ভরিয়ে তোলেন নিকল। উচ্ছ্বসিত হ'য়ে ওঠেন ব্রুনোর কথাতে। একরকম ছুটে এসে করমর্দন ক'রলেন।

সোফাতে ফিরে এসে কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইলেন নিকল। তারপর সহজ গলায় বলেন ঃ দেখুন, আমার হাতে আজই ভালো একটা কাজ আছে। আপনি আমার কথায় চলুন, অর্থ ও সুনাম আপনার পিছু নেবে। কাজ ক'রতে চাইলে আমি আপনাকে কাজে পাগল ক'রে দিতে পারি। একজন বিলাসী আমেরিকান ভদ্রলোকের সঙ্গে ইদানীং পরিচয় হ'য়েছে। সেই কাজের কথাই বলছি।

ভদ্রলোকের নানাবাতিক। সুন্দরী স্ত্রীলোকের নগ্ন দেহ ঘুরে ঘুরে দেখেন আর চিত্রকরকে দিয়ে ছবি আঁকান। কয়েক ডজন বিভিন্ন ভঙ্গির সংগ্রহ আছে তাঁর। কয়েকটি আমার নিজের আঁকা। খরচে কার্পণ্য নেই। এক'শ মার্ক দু'রাত্রে রোজগার ক'রবে যে কোনও কেউ। এই কাজটা নিন না।

ভদ্রলোকের ঘরটাই একটা স্টুডিও। প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম সবই সেখানে রাখা আছে। ভদ্রলোক খরচ করেন প্রচুর। চমৎকার ডিনারের ব্যবস্থা সেখানে।

কি যেন বলতে যাচ্ছিল ব্রূনো। দরজার ভারী পর্দ্দা সরিয়ে এক মাঝারি গড়নের প্রৌঢ় ভদ্রলোক এসে ঘরে ঢোকেন।

এক রকম লাফিয়ে উঠলেন নিকল। আপ্যায়নের ধুম প'ড়ে গেল

ব্রুনোকে বলেন ঃ এনার কথাই আপনাকে বলেছি আমি। এনার সঙ্গেই যেতে হবে আপনাকে।

সেই রাত্রেই অজানা এক নতুন মানুষের সঙ্গে ব্রুনোর জীবনের এক নতুন পদক্ষেপ। প্রৌঢ় আমেরিকান ভদ্রলোকের সঙ্গে গভীর এক কুণ্ঠা নিয়ে ব্রুনো তার গাড়ীতে চেপে ব'সলে।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পর নিকল কি কাজে যেন ব্যস্ত ছিলেন, একরকম হুড়মুড় ক'রে ঘরে এসে ঢুকলেন সেই প্রৌঢ় আমেরিকান। দুই চোখ রক্তবর্ণ। দুরন্ত রোষে ঠোঁট দুটি থর থর ক'রে কাঁপছে। নিকলকে সামনে পেয়ে একটানা ব'লে গেলেন অনর্গল ঃ এই কারণেই আমি কোন জর্মনকে বিশ্বাস করি না। আমি ঘৃণা করি তোমার বন্ধুকে।

ভদ্রলোককে প্রকৃতিস্থ করাই নিকলের কিছুটা অসম্ভব হ'য়ে উঠলো। কিছুতেই থামবেন না তিনি। হাত পা নেড়ে ব'লে চললেন ঃ ভেতরের ঘরে পলার সঙ্গে ডেভিড ছিল বিছানাতে। কাঁচের ভেজানো দরজা খুলে ঘরে ঢুকে আলো জ্বালি। পলার সঙ্গে দু'চার কথার পর তাকে তৈরী হ'তে ব'লে ঘর থেকে বেরিয়ে দেখি আপনার বন্ধুটি গায়েব। তন্ন তন্ন করে খুঁজেও সারা চত্তরে আর কোনও পাত্তা নেই।

নিকল বলেন ঃ আমি জানতাম এ রকম একটা কিছু তিনি ক'রে বসতে পারেন। সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিনি ওনাকে! পলার ছবির জন্যে আপনি অহেতুক ব্যস্ত হ'চ্ছেন। সে দায়িত্ব আমার। আপনার আসবার দরকার কি ; একটা ফোন ক'রলেই হতো। তবে আপনি আসুন, আমার অপেক্ষা করবেন না। ডিনার আমি সেরেই যাবো। কিন্তু উনি গেলেন কোথায়?

—জাহান্নমে!

ভারী জুতোতে শব্দ তুলে ভদ্রলোক বেরিয়ে গেলেন।

ডিনার শেষে পথে নামতে বেশ কিছু দেরী হলো নিকলের। দ্রুত পদক্ষেপে এগিয়ে চ'লেছিলেন সামনে। সোরগোল দেখে থামতে হলো।

কোনও কিছুকে কেন্দ্র ক'রে ভীড় জমেছে। কানে এলো মোটর চাপা পড়েছেন একজন।

ঘড়ির চেহারা দেখে নিকল আবার পা চালাতেই পাশ থেকে কে একজন বলে উঠলোঃ পকেটের তুলি দেখে মনে হ'চ্ছে বেচারা চিত্রকর।

সারা শরীরে এক বিদ্যুৎ তরঙ্গ খেলে গেল। ভীড় ঠেলে সামনে এসে একরকম ঘুরপাক খেয়ে পড়ে গেলেন নিকল।

ব্রুনোর স্থির দেহ। চোখের মণি কোণের দিকে এঁটে গেছে। রক্তে সিঞ্চিত দেহ। ঠোঁট দুটি থরথর ক'রে কাঁপছে।

হাতটি সম্পূর্ণ বাদ দিতে হ'লো। ডান হাতটাই। দুদিন পর জ্ঞান ফিরে এলো। কদিন পর কিছুটা সুস্থ হলো। ব্রুনো চিনতে পারলে না নিকলকে।

ডাক্তার বলেনঃ মাথাটি সম্পূর্ণ নষ্ট হ'য়ে গেছে। শুধু আপনি কেন, নিজের স্ত্রীকেও উনি চিনতে পারেন না একদম। বেচারী খবর পেয়ে আজ এসেছেন এখানে।

কেবিনে এসে ঢোকেন নিকল। ঘুমিয়েছিল ব্রুনো। পাশের টুলে ব'সে মাথা হেঁট ক'রে ব'সে আছে সারা। ঘাড়ের দু'পাশ বেয়ে স্বর্ণাভ চুল নেমে এসেছে। দেহটি ফুলে ফুলে উঠছে। সারা কাঁদছে।

কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন নিকল। তারপর ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে এলেন। পায়ের শব্দ পেয়ে সারা নিজেকে সংযত ক'রে সোজা হ'য়ে বসে। রুমালটি এগিয়ে দিতে গিয়ে কেমন নিশ্চল পাথর হয়ে গেলেন। অন্ধকার এক শূন্য গহ্বরে যেন পাক খেতে খেতে আছড়ে পড়লেন নিকল। চরম বিস্ময়োক্তি ঝরে প'ড়লো ঠোঁট থেকেঃ পলা তুমি!

হাত লেগে মিটসেফের ওপর রাখা কাঁচের পাত্রটি চুরচুর হ'য়ে ছড়িয়ে পড়লো মেঝেতে।

—হের জেন···!

নিকলের কথায় যেন সম্বিত ফিরে আসে। বিষণ্ণ এক ঝোড়ো বাতাসে আমাকে যেন কোনও এক সুদূর অজানা পথে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল।

পাণ্ডুর মুখ নিকলের। মাটিতে দৃষ্টি রাখা। ধীরে সংযত কণ্ঠে বলেন ঃ আমার কি খুব দোষ আছে হের জেন ?

নিজের কিছুটা অজ্ঞাতেই জবাব যেন ঠোঁটে এলো ঃ না।

আবার প্রশ্ন নিকলের। দ্বিধাজড়িত কণ্ঠস্বর ঃ আমাকে কি একজন পাপী, স্বার্থপর ব'লে মনে হয় হের জেন ?

একই উত্তর এসেছে আমার ঃ না।

সামান্য বিরতি। নিকলের আবার জিজ্ঞাসা। মাথা নেড়ে কিছুটা ঝুঁকে প'ড়ে বলে ঃ সারা বা পলার সম্পর্কে জানবার ইচ্ছা হয় আপনার ?

সামান্য হাসি ঠোঁটে এসেছে। কিছুটা জোরেই জবাব দিয়েছি ঃ একদম না।

নিঃশেষিত পাত্রাধার। অনেক রাত। জনশূন্য রেস্তরাঁ। দেয়ালের কাচভাঙা ছবিটি ঠাণ্ডা হিমের বাতাসে থরথর ক'রে কাঁপছে।

রেস্তরাঁ থেকে চৌরাস্তা অনেকটা পথ। কনকনে ঠাণ্ডা। হাতের আঙুলগুলো টনটন করে। বাঁকের মুখে নিকল বিদায় নিয়ে চলে গেল। দ্রুত পায়ে আমি সামনে এগিয়ে চলি। হঠাৎ খেয়াল হলো রাত্রের আহার আমার এখনও বাকি। সিঙ্কেনের কথা মনেই হয়নি এতক্ষণ।

আলো জ্বলছে দোকানে। সিঙ্কেনের দোকানের মোটা লোকটিকে দেখা যাচ্ছে দূর থেকেই। এখনও বন্ধ হয়নি মেৎসগেরাই।

দিন দশেক পর আমাকে মিউনিকে আসতে হলো। পালোয়ানের খোঁজ নিয়ে জানি, সে ফিরে গেছে হামবুর্গ। এখানেও সে দু' একটি জিনিস অতি সহজেই ফেলে গেছে। এক জোড়া দস্তানা আর দাড়ি কামানোর সরঞ্জাম।

হোটেলের ম্যানেজার যেন আকাশ হাতে পেলেন। বিশাল দেহে ঘাড় ব'লে কোন পদার্থ নেই। জোড়া ভ্রূ'র নীচে ক্ষুদে চোখ দুটোর মাঝখানে গোল লাল মাংসল নাক। গলার স্বরটি খর্ব। পরিপাটি পোষাক। সুন্দর বিনয়। হেসে হেসেই বললেন শেষেঃ আপনার সঙ্গে নিশ্চয়ই তাঁর দেখা হবে। তাঁর সন্ধান আমাদের জানা নেই। খুব একটা অসুবিধে না থাকলে এ'দুটি জিনিস পৌঁছে দেবার অনুরোধ আমি ক'রবো আপনাকে।

ভদ্রলোকের অনুরোধ আমাকে রাখতে হলো।

এখানেই থেকে গেলাম। হোটেলের পূবমুখো ঘরটায় আমার থাকার ব্যবস্থা হলো। মহার্ঘ আসবাবপত্র, সুন্দর পর্দায় আর কার্পেটে ঘরটি সাজানো। জানালায় দাঁড়ালে শহরের ব্যস্ততা নজরে আসে। কর্মমুখর মিউনিক অনেকটা চোখে পড়ে।

এখানকার রাস্তাঘাট দেখে কলকাতার কথা মনে পড়ে। রাস্তা কিছুটা খাটো। তার মধ্যে ট্রাম চলেছে। বাস ও মোটর চলেছে সেই সঙ্গে।

গত যুদ্ধে শহরটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল অনেকটা। কিন্তু এরা তার সুযোগ নিয়ে শহরটিকে গড়েনি নতুন ক'রে। যেখানে যা ছিল, আবার ঠিক তেমনি করে খাড়া ক'রেছে সব কিছু। পুরাণোকে এরা বড় বেশী রকম আঁকড়ে রাখতে চায়। অন্য জায়গার লোকেরা বলে, শুধু মিউনিক

নয়, ব্যাভেরিয়ার লোকেরাই কিছুটা প্রাচানপন্থী। ফ্রাঙ্কফুর্টের সঙ্গে তুলনা ক'রলে মিউনিক নাকি প্রায় সেকেলে।

মিউনিক রেল ষ্টেশনের সঙ্গে তুলনা খুঁজতে বসলে মোগলসরাইয়ের নামই আমার আগে মনে পড়ে। চতুর্দিকে নানাপথ চ'লে গেছে দূর দূরান্তে। শুধু দেশের নয়—বিদেশের-ও। প্যারী ও রোমের যাত্রীদের গাড়ী পাওয়া যাবে এখান থেকে। বড় বড় শহরে যাবার ট্রেন এখানে হাতের কাছেই। কোলন, লাইপৎজিগ্ বা বার্লিনের গাড়ী এখানে অহরহ।

শহরটি আমার ভালোই লাগলো। কিছুটা সময় হাতে পেলে, কিছুমাত্র অবসর পেলে শুধু ঘুরেছিই। ট্রামে-বাসে, পায়ে হেঁটে সারা শহর প্রদক্ষিণ করেছি একা একাই।

মানুষ আমাকে আকর্ষণ করে বেশী। লোকের সঙ্গে কথা ব'লে, নানা প্রসঙ্গের আলোচনায় আমার তৃপ্তি। রেস্তরাঁ বা কাফেতে, ট্রামে-বাসে বা ট্রেনের কামরায় গায়ে পড়া আলাপের মাধ্যমে ভীড়ের মধ্যে থেকে আমি মানুষ খুঁজি। হোটেল থেকে বেরুনোর আগে ছক কেটে খাতায় দাগিয়ে নিয়ে, দ্রষ্টব্যস্থল ক্ষুধার আগ্রহে গেলবার তাগিদে ঘুরে বেড়ানোতে আমার আগ্রহ নেই। তাই বেমক্কা 'এটা দেখেছেন', 'ওটা দেখেছেনে'র বাগানো প্রশ্নের সামনে আমাকে সঙ্কুচিত হ'তে হবে। লাগসই উত্তর দিতে গিয়ে আমাকে হিমসিম খেতে হবেই।

দেরীতে ঘুম থেকে ওঠা আমার এক অভ্যাস। আমার ছোট বোন মিনা সংশোধন ক'রে বলেছে—বদঅভ্যাস। কিন্তু আমার হুঁশ আজও হলো না।

শুধু ঘুম নয়, এমনি এমনি বিছানায় প'ড়ে থাকতে আমার ভালো লাগে। চায়ের ঠুং ঠুং আওয়াজ শ্রবণেন্দ্রিয়ে শুধু অনুভবই ক'রেছি। বেশ বুঝেছি, চা এলো। ঠাণ্ডা হ'লো। জল হ'য়ে গেল। পাতলা

পর্দায় ঢেকে গেল ওপরটা। কিন্তু চোখ খুলতে পারিনি। কেমন যেন চায়ের লোভ দেখিয়ে ঠকিয়ে দেবার ষড়যন্ত্র বলে মনে হ'য়েছে।

হয়তো কিছুটা বেশী মাত্রায় দেরী হয়েছিল আমার। প্রাতরাশের টেবিলে গিয়ে দেখি চারদিক ফাঁকা। সমস্ত চেয়ার টেবিল খালি পড়ে আছে। লোকজনের কোনও চিহ্ন নেই। শুধু ডান দিকে একজন প্রায় আমার মুখোমুখি কফি স্থমুখ ক'রে বসে আছেন। কাগজ পড়ছেন।

ভদ্রলোক প্রৌঢ়। চেহারাও কৃশ। ফিনফিনে মাথার চুল ধূসর। রেখা পড়েছে কপালে আর গালে। চোখ দুটি জ্বলজ্বলে—তীক্ষ্ণ। কাগজ পড়বার ফাঁকে ফাঁকে কয়েকবার আমাকেও দেখছিলেন ভদ্রলোক।

কফি গিলেই উঠে আসছিলাম। চোখাচোখি হ'তেই ভদ্রলোক হাতছানি দিয়ে আমাকে কাছে ডাকলেন। একপ্রান্তে কাগজ সরিয়ে সামনের চেয়ারে বসতে বললেন।

বললেনঃ সতরো নম্বর কামরায় আপনি আছেন। আপনাকে আমি দেখেছি। আমরা আছি আঠারোতে। আপনার দেরী হচ্ছে না তো। তাড়া নেই তো আপনার?

প্রবল বেগে মাথা নেড়ে বলিঃ আমার কোন প্রোগ্রাম নেই। তাড়া তো নেই-ই।

প্রৌঢ় ভদ্রলোক হাসলেন। বললেনঃ আপনি অনেকটা দেখছি আমার দলের। আমি অবশ্য সেকেলে মানুষ, বাতেও কিছুটা কষ্ট পাই, কিন্তু আপনি হচ্ছেন নওজোয়ান। আপনি দেখছি আমার মতই দেরীতে ঘুম থকে ওঠেন।

হেসে বলিঃ এ আমার দীর্ঘদিনের বদঅভ্যাস।

অন্য প্রসঙ্গ তোলেন ভদ্রলোকঃ মিউনিকে আপনি বেড়াতে এসেছেন বুঝি? আমরা এসেছি হামবুর্গ থেকে। এদেশ আপনার কেমন লাগছে?

জবাবে বলি ঃ খুব ভালো। আমার বেশ ভালোই লাগছে আপনাদের দেশে এসে।

চোখে সামান্য হেসে বলেন ঃ আপনি জর্মন বেশ বলেন তো। বেয়াড়া উচ্চারণ আমি সহ্য করতে পারি না। ভাষা জানাতে আপনার নিশ্চয়ই সুবিধে হচ্ছে অনেক। এদেশের মানুষগুলো কেমন দেখছেন ?

বললাম ঃ এদেশের মানুষের মনে মহাযুদ্ধের বিচ্ছিন্ন কিছু দাগ দেখলাম। কিন্তু লোকে দেখলাম আজ আর মোটেই বিভ্রান্তিতে নেই। এটাই আমাকে স্পর্শ করেছে বেশী।

আত্মপ্রসাদের হাসি প্রৌঢ়ের ঠোঁটে। বললেন ঃ আমার দেশের মানুষরা একটু অন্য নিয়মে চলে। যুদ্ধের শেষে মানুষ তার নিজের ঘর খুঁজে, আস্তানা আর সংসার পুনরুদ্ধার করবার চেয়ে আধ পোড়া কলকারখানাগুলো নতুন ক'রে গড়ে তোলবার প্রেরণা নিয়ে এগিয়ে আসে। দেখুন, পৃথিবীর অনেক জায়গায় আমাকে ঘুরতে হয়েছে কাজের খাতিরে, কিন্তু এমনটি আর দেখিনি।

শূন্যে ঘুষি পাকিয়ে প্রৌঢ় ভদ্রলোক দাঁত চিপে বললেন ঃ আর-বাইট্। আরবাইট্।

ঠোঁটে হাসি টেনে বলি ঃ আপনার সঙ্গে আমি একমত। কাজ আর পরিশ্রম এদেশের মানুষের এক দুরন্ত নেশা। কলে কারখানায় আমি হামেশাই ঘুরে থাকি। কাজ পাগল মানুষের সাক্ষাৎ আমার মিলেছে বিস্তর !

খুশীর হাসি সারা চোখে ছড়িয়ে পড়ে ভদ্রলোকের। বললেন ঃ আমেরিকা আশা ক'রেছিল সমস্ত জর্মনি জুড়ে আলুর চাষ হবে। কারখানার চিমনীতে আর কোনও দিন ধোঁয়া উঠবে না। পঞ্চাশ বছর ধ'রে হয়তো ডেমোক্র্যাসি শেখানোর মাস্টারীর চাকুরীতে তারা বহাল থাকতে পারবেন।

টেবিলে প্রচণ্ড এক মুষ্টাঘাত করে হেসে বেশ হেঁকে বললাম ঃ উই কাম অ্যাজ কঙ্কারারস্ অ্যাণ্ড নট অ্যাজ লিবারেটরস্।

খুশীতে গলে গলে পড়লেন ভদ্রলোক। শিশুর মত খিল খিল করে হাসলেন অনেকক্ষণ ধরে। বললেন ঃ আইজেনহাওয়ারের কথাগুলো আপনার বেশ মনে আছে তো। মজার কথাটা আপনি মনে করে রেখেছেন দেখছি। আপনাদের মনে থাকবেই তো। আপনি ভারতীয়। ইংরেজের অনেক বাঁদরামো সহ্য করতে হয়েছে আপনাদের! সত্যি, গ্রেট বৃটেনের অবস্থা আজ সবচেয়ে মর্মান্তিক। মহাযুদ্ধের পর একটার পর একটা জায়গা থেকে সরে আসতে হচ্ছে। কোটী কোটী ডলার আমেরিকার কাছে ভিক্ষে করছে, তবু সে আজও গ্রেট ব্রিটেন। ক্ষুর দিয়ে ওর 'গ্রেট-'টা চেঁছে ফেলা দরকার।

ভদ্রলোক থামলেন না। একটি সুন্দর সিগারেট কেস পকেট থেকে বার করলেন। আমাকে একটি দিয়ে নিজে একটি ধরালেন। যেন জুত হয়ে বসে নতুন প্রেরণায় শুরু করলেন। বললেন ঃ আসলে আমরা জর্মনরা বড় হতভাগা। রাজনীতির কুৎসিত পাকচক্রের খপ্পরে পড়ে কি মর্মান্তিক মৃত্যুকে আমরা আলিঙ্গন ক'রেছি। ক্ষমতার জন্যে হিটলার উঠেছিল পাগল হয়ে। প্রথমে আমার খারাপ লাগেনি। তারপর দেখলাম নিজের দল ও স্বার্থের খাতিরে গোটা দেশকেই তছনছ করে দিতে লাগলেন। জর্মনি এদিক দিয়ে বড় হতভাগা। তাই ইয়াঙ্কী আর রুশ ভালুকের মুখে ডেমোক্র্যাসি আর কমিউনিজমের বুলি শুনতে হচ্ছে আমাদের। এখন আর কি দেখছেন আপনি, প্রথম দু' বছর আমাদের কি হতাশা আর বিভ্রান্তিতে দিন গেছে; বেকারী ছিল না দেশে, সেই দেশে রুটির জন্যে কামড়াকামড়ি যদি দেখতেন।

প্রৌঢ় থামলেন। মুখটিতে রুমাল বুলিয়ে নিয়ে বললেন ঃ আর একবার কফি চলুক। দু'এক টুকরো স্যাণ্ডউইচ আপনাকে দেবে কি?

হাত নেড়ে বলি ঃ কফি। শুধু কফি।

কফি এলো। অন্য প্রসঙ্গ শুরু হ'লো। আমার দেশের কথা তুললেন। আমার খোঁজ নিলেন অনেক ক'রে। হেসে হেসে বললেন ঃ

আপনাদের দেশে স্বাধীনতার পর তুরন্ত এক সাড়া পড়েছে জানি। নেহরুর মত একজন নেতা আপনার দেশে থাকাতে শুধু আপনার নয়, ভারতের নয়, গোটা তুনিয়ার অনেক মঙ্গল হ'চ্ছে। ক্রুশ্চেভ এসিয়াতে কমিউনিজমের ফেরিওয়ালা হয়ে ঘুরছে আর ডালেস থলিতে ডলার বোঝাই করে তামাম চত্বরে দৌড়ে বেড়াচ্ছে। স্বাধীনতার পর আপনাদের দেশে অনেক বড় বড় কলকারখানা হচ্ছে, ইস্পাত তৈরীর কারখানা হচ্ছে আমি খবর রাখি। ভারত সরকারের সঙ্গে আমি কিছু কাজও করেছি। হামবুর্গেই আমার ব্যবসা।

ভদ্রলোকের নাম হের গুটেনবার্গ। হ্যানোফারের মানুষ। ব্যবসা আছে হামবুর্গে। বছরে একবার বেড়াতে আসেন। এবার নাকি স্ত্রীকে কথা দিয়েছেন তাঁকে নিয়ে যাবেন প্যারীতে।

গুটেনবার্গ আলতো ক'রে তাকালেন আমার দিকে। ঠোঁটে হাসি টেনে বললেন ঃ আমার স্ত্রীর ঘোরার খুব বাতিক। ছেলেমানুষের মত বেড়াতে ভালবাসেন। ভোর বেলাতেই বেরিয়েছেন। আরে বলতে বলতে এসে হাজির! আপনার সঙ্গে স্টেলার আলাপ করিয়ে দিই।

ফিরে তাকালাম। ফ্রাউ স্টেলা গুটেনবার্গকে দেখলাম।

সামান্য কয়েক মুহূর্ত আগে মনে মনে তাঁর চেহারার যে আদল এঁকেছিলাম আশ্চর্য তার সঙ্গে বিন্দুমাত্র মিল নেই। বিস্মিত হ'য়ে, বিমূঢ় হ'য়ে কয়েক মুহূর্ত ভেবেছি। এই বয়স! এই চেহারা! এই প্রৌঢ় হের গুটেনবার্গের স্ত্রী স্টেলা !!

একহারা দিঘল গড়ন। সুবিন্যস্ত সুন্দর একমাথা স্বর্ণাভ চুল কাঁধের তু'দিকে আলগোছে বেয়ে নেমেছে। আঁট শরীরটি মহার্ঘ এক ঢিলে শীত বস্ত্রের আবরণে ঢাকা। পায়ের সুডোল গড়ন। চলার গতিতে পরিচ্ছন্ন ব্যঞ্জনা। মুখভাব স্নিগ্ধ—কমনীয়। এক টুকরো হাসি পাতলা ওষ্ঠাধরে ভেঙে পড়েছে। ডাগর আঁখি পল্লবে কিছুটা নীরব কৌতূহল।

মাথা নুইয়ে আমার সঙ্গে করমর্দন করলেন ফ্রাউ গুটেনবার্গ। কণ্ঠস্বরটি অতি সুন্দর। দানা নেই, যেন মীড় আছে। পাথরের নুড়ির আঘাতে ছড়িয়ে যাওয়া ঝর্ণার চূর্ণ বারিধারার মত পরিচ্ছন্ন হাসিটি যেন অপূর্ব সুষমায় ছড়িয়ে পড়েছে সুদতীর। নরম হাল্কা এক মেয়েলী সুগন্ধে সারা পরিবেশ ভরে উঠলো। দেহভঙ্গী যেন ফ্রাউ গুটেনবার্গকে আরও কমনীয় ক'রে তুলেছে।

সামান্য পরিচয় হলো। দু'চার কথার বিনিময়। স্বামীর দিকে চোখ তুলে কিছুটা কৃত্রিম অভিমানের সুরে বলেন: তোমার সকাল এখনও হ'লো না। এখনও তুমি কফি গিলছো।

গুটেনবার্গ উঠে দাঁড়ালেন। অব্যক্ত বিনয়ে, ঘাড় নুইয়ে অভিবাদন ক'রে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেলেন। ফ্রাউ গুটেনবার্গ চলেছেন পেছনে। শুধু ঘাড় ঘুরিয়ে বলেন: ওঁর সঙ্গে বসে ছিলেন, সুন্দর সকাল আপনার নষ্ট হলো। ওঁর খপ্পরে পড়লে আপনাকেও উনি কুঁড়ে ক'রে ছাড়বেন।

এক টুকরো হাসতে হলো। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াই। ঘড়িতে সময় দিচ্ছে অনেক। পথের উদ্দেশ্যে পা বাড়াই।

ঘুরতে ঘুরতে, চলতে চলতে এসে ঠেকেছিলাম ইণ্ডাস্ট্রিয়াল মিউজিয়ামে। এই স্থানটি আমাকে অবাক করলে।

কয়লায় খদ্ দেখবার জন্যে দরকার নেই ধানবাদ যাবার। পাতাল-পুরীতে পা বাড়ানোর কোনও প্রয়োজন নেই। এই মিউজিয়মে সব রাখা আছে। মনে হয় কর্মমুখর খদ্ আমার সাড়া পেয়ে থমকে দাঁড়িয়েছে। কি অপূর্ব কলা-কৌশল। কি বিপুল অর্থব্যয়। কিন্তু শ্রম ও ব্যয় সার্থক। চোখের হাল্কা কৌতূহল উপলব্ধির আনন্দে সহজেই মনকে নাড়া দেয়।

অনেকটা সময় আমার এখানে গেল। মিউজিয়াম আমার বড় ভালো লাগলো।

পথে নেমে বাসের জন্যে এগিয়ে চলেছি। কর্ম্মমুখর দিন। মানুষ ব্যস্ত। দাঁড়ানোর যেন সময় নেই কারো। সবাই ব্যস্ত। সবারই যেন কাজ।

বাঁকের মুখে থমকে দাঁড়াতে হলো। আমার প্রায় গা ঘেঁষে একটি গাড়ী এসে থামলো। সচকিত হয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখি ঝকঝকে এক নতুন গাড়ীতে বসে হের গুটেনবার্গ মিটিমিটি হাসছেন। পাশে ফ্রাউ গুটেনবার্গ বিচিত্রিত একটি ওড়নায় অবাধ্য কেশরাশিকে শাসনে আনতে ব্যস্ত।

হের গুটেনবার্গ একরকম জোর ক'রে আমাকে গাড়ীতে তুলে নিলেন। বেশ শাসনের স্বরে বলেন : আপনি হুট করে বেরিয়ে পড়লেন। ইচ্ছে ছিল আপনাকে পাকড়াও করে নিয়ে আমরা বেরুবো। লাঞ্চ খাওয়া হয়নি নিশ্চয়ই, মুখ দেখে মনে হচ্ছে ওসব সমাধা হয়নি এখনও।

আমার পাশে ফ্রাউ গুটেনবার্গ। গাড়ী চালাচ্ছেন হের গুটেনবার্গ। চোখাচোখি হলেই নরম একটু হাসা। ডাইনে বামে বাঁকের মুখে নরম একটি মেয়েলী স্পর্শ আলতো করে ক্ষণকের জন্যে ছুঁয়ে যাচ্ছিল।

কিছুটা পথ পার হ'য়ে এসে গাড়ী থামালেন গুটেনবার্গ। স্ত্রীর সঙ্গে নীচু পর্দ্দায় কি যেন বললেন। তারপর কি একটা কাজে নেবে গেলেন গাড়ী থেকে।

কয়েক মুহূর্ত গেল। হঠাৎ খেয়াল হলো ফ্রাউ গুটেনবার্গ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন। বেশ কিছুক্ষণ ধরে তাকিয়ে আছেন। কিছুটা নির্লিপ্ততার ভান ক'রে অন্যমনস্ক হ'তে চেষ্টা করি। পর মুহূর্তেই প্রশ্ন এলো : আপনি কি বিবাহিত ?

'এ প্রশ্ন নতুন নয়। তবু কেমন যেন সামান্য প্রশ্নের উত্তর দিতে আমার সময় লাগলো। হয়তো এই প্রথম আমি সত্য গোপন করবার সাহস পেলাম না। সাজানো বানানো কোন কথাই আমার ঠোঁটে

এলো না। মন্দোদরীর কথা ভুলে গেলাম! ফোটোর কথা আমার মনেই হলো না। হেসে বললাম ঃ না।

কথায় একটি সহজ সুর ভেসে এলো। বললেন ঃ ভারতে শুনেছি একটি পুরুষের চারটে ক'রে স্ত্রী থাকেন।

কথাটা আমার ভালো লাগেনি। তবু শান্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করেছি ঃ এ সংবাদ আপনি পেলেন কোথায়?

এবার হাসি নয়। কিছুটা কৌতূহল ভরা দৃষ্টিতে বলেন ঃ এক মহারাজার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল বার্লিনে। তার মুখেই শুনেছিলাম, ভারতে চারটি স্ত্রী নিয়ে সংসার করা কোনও পুরুষের পক্ষে নাকি বড় কথা নয়।

হেসে জবাব দিয়েছি ঃ মহারাজার কথা ছেড়ে দিন। তাঁর শুধু টাকাই আছে। উন্মাদের মত অনেক কিছু বলতে পারেন। অনেক অনিয়ম ও অন্যায়কে তিনি নিয়ম ও ন্যায় বলে জানেন। পৃথিবীর সর্বত্র যে নিয়ম, সেই নিয়মেই আমাদের দেশ আজ চলছে। একাধিক স্ত্রীর কথা সম্পূর্ণ মিথ্যে নয়, তবে তাদের সংখ্যা নিতান্তই তুচ্ছ। ইয়োরোপের মত আমাদের দেশের স্ত্রীরাও হ'য়ে উঠেছেন আজ ব্যয়সাপেক্ষ। মহারাজা আপনাকে ভুল সংবাদ দিয়েছেন। আপনাকে দেখে জর্মন মেয়েদের সৌন্দর্য ও গড়ন সম্পর্কে আমি ধারণা ক'রে বসলে এদেশের মেয়েরা খুশী হলেও বিদেশের পুরুষগুলো আমাকে তাড়া করে আসবে।

চোখে হাসলেন ফ্রাউ গুটেনবার্গ। বললেন ঃ আমার আর কি সৌন্দর্য দেখলেন আপনি। নিতান্তই অতিশয়োক্তি।

আমি চুপ করে রইলাম। কিন্তু থামলেন না উনি বললেন ঃ আপনি বিয়ে করেননি কেন?

তারপরের কথায় আমি যেন কিছুটা অবাক হয়ে পড়ি। এক নজর দেখে নিয়ে বললেন ঃ এমন সুন্দর চেহারা আপনার। কিন্তু কি নিঃসঙ্গ, একাকী। কালো চুল আর কালো চোখ দেখলে আমার হিংসে হয়।

তাকিয়ে রইলাম কিছুক্ষণ। পলকহীন ফ্রাউ গুটেনবার্গের দৃষ্টি আমার মুখে। কি অদ্ভুত মুহূর্তগুলো। এরকম দৃষ্টি আর দেখিনি। এত পরিচ্ছন্ন নিবিড় ভাবগর্ভ জিজ্ঞাসায় আমি সম্পূর্ণ অনভ্যস্ত।

বিষাদের সুর ফ্রাউ গুটেনবার্গের কণ্ঠে। বলেনঃ একা মানুষ আপনি তাই আপনার একরকম একক জীবন। কিন্তু আমার তো সব ছিল তবু কবরের নীরবতা আমাকে পেয়ে বস'লে কেন বলতে পারেন ?

নিজের কানকেই যেন বিশ্বাস করতে পারি না। অস্থির হ'য়ে পড়েন ফ্রাউ গুটেনবার্গ। মুহূর্তে অসম্ভব রকম ভাবপ্রবণ হয়ে পড়লেন। পাণ্ডুর এক সূক্ষ্মরেখা নেমে এলো চোখে মুখে। অতি সুন্দর মুখশ্রী ঘিরে একটি অব্যক্ত বেদনা যেন দুঃসহ এক চাপা আবেগে ছড়িয়ে পড়লো।

আমার কোটের হাতার বোতামগুলোর দিকে স্থির দৃষ্টি মেলে নীচু গলায় বলেনঃ আমি তো ভাবতেই পারিনি, আমার সামনে আপনাকে আমার স্বামী এত সহজ ভাবে আহ্বান করবেন। আপনার ব্যক্তিত্ব অসাধারণ। তার প্রবল সন্দেহ বাতিকতা আপনাকে স্পর্শ করেনি।

আবহাওয়া লঘু করবার খাতিরে হেসে বলিঃ আপনার স্বামী অতি সজ্জন ব্যক্তি। আমার ভালোই লেগেছে ওনাকে।

ম্লান হাসি ফ্রাউ গুটেনবার্গের ঠোঁটে। কণ্ঠস্বরে জড়িমা। হিমেল ঠাণ্ডা বাতাসে কানের পাশের দু'চার গাছি চূর্ণ কুন্তল অবাধ্য হয়ে উঠছে। এক পলক দৃষ্টি তুলে বললেনঃ আপনি সুন্দর মানুষ, অন্যের ভালোটুকু দেখাই আপনার মহৎ চরিত্রের পরিচয়। আপনাদের দেশের কথা আমি অতি সামান্যই জানি। ভারতের মেয়েদের কথা শুনতে আমার খুব ভালো লাগে। এত সুন্দর পোষাক তাদের। শাড়ী পরা মেয়ে আমার দু'চোখ ভরে দেখতে ইচ্ছে করে। মেয়েদের সুন্দর লজ্জা, পোষাকেও তাই সহজ একটি কুণ্ঠা আছে। তাতে যেন

আপনাদের দেশের মেয়েদের অনেক বেশী রমণীয় ক'রেছে। কমনীয় করেছে বেশী ক'রে।

ফ্রাউ গুটেনবার্গ থামলেন না। আবার সুরু করলেন। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেনঃ আমার স্বামী আমাকে ভালোবাসেন। আমিও ওঁকে ছাড়া এক পা চলতে পারি না। আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন, বলতে দিন আমাকে। তবে এটুকু আপনার কাছে গোপন করবো না। তাতে হয়তো আপনার ক্ষতি হবে। উনি আপনাকে খুব ধনী লোক মনে করেছেন। কিছুটা সতর্ক হয়ে চলবেন। উনি শুধু ব্যবসা বোঝেন; লোকের মতলবের পেছনে ওনার দৃষ্টি, মানুষের হৃদয় পর্যন্ত ওঁর হাত পৌঁছোয় না। আপনি বিদেশী, দু'দিনের জন্যে এসেছেন এদেশে। কাজ ফুরিয়ে গেলে আপনার পরিবারের মধ্যে চলে যাবেন। ভুলে যাবেন আমাদের। আজকের এই মুহূর্তগুলো হয়তো হবে সম্পূর্ণ বিস্মৃত। তাতে ক্ষতি নেই, আমার তা'তে খারাপ লাগবে না হের জেন।

আমি বলিঃ আপনাদের সঙ্গে সামান্য পরিচয়, কিন্তু আপনাদের আমি ভুলবো না! আপনার কথা আমার মনে থাকবে!

ফ্রাউ গুটেনবার্গ বলেনঃ আমি ধন্য হবো। কিন্তু আমার ভয় হয় হের জেন।

আমি কিছুটা বিভ্রান্ত। কিছুটা দিশেহারা-ও। জিজ্ঞাসা করিঃ কিসের ভয়!

মাথা নত করে বললেনঃ গ্লানি সঙ্গে না নিয়ে গেলেই আমি খুশী হবো। ভয় আমার সেখানেই। সামান্য আলাপে নিজের বাতের কথা তুলবেন, উনি যতটা নিজের প্রবীণতার দোহাই দেন আসলে উনি ঠিক তা নন। পুরুষের পৌরুষ যার নেই সে তো সাজানো কথার আশ্রয় নেবেই। বানানো কথা বলবেই। সকালে আপনার সম্পর্কে একটি কুৎসিত মন্তব্য প্রকাশ করেছিলাম নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও। উনি তাতে খুশীই হয়েছেন। সেই কারণেই বোধহয় আপনাকে

গাড়িতে তুলে নেবার ওনার এত আগ্রহ! ইয়াঙ্কীদের উনি বলেন অমানুষ, আর আপনাকে উনি জানেন কালা আদমী। মানুষের মনের এ কি অদ্ভুত রিক্ততা বলুনতো! সে দৈন্য নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে ক্ষতি ছিল না, কিন্তু আমি যে নিঃস্ব হয়ে গেলাম হের জেন।

ফ্রাউ গুটেনবার্গ থামলেন। সামনের রাস্তার দিকে দৃষ্টি তুলে নীরব হ'য়ে রইলেন। একটি প্রশ্ন আমাকে এতক্ষণ তোলপাড় করেছে। এ সব কথা আমাকে বলা কেন! কিসের পরিচয়! কি সম্পর্ক আমার এদের সঙ্গে?

শেষ পর্যন্ত একটি সিদ্ধান্তে অবশ্য পেঁাছেছি আমি। ফ্রাউ গুটেন-বার্গ হয়তো কোনও কারণে নিরুপায়। বাইরের জগতে এই নারীর মূক বেদনা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। হয়তো এত কথা তিনি আমাকে শোনাতে চাননি। নিজের স্বামীর হীন চরিত্র উদ্‌ঘাটন ক'রে পৃথিবীর কোনও স্ত্রীর গৌরব বাড়ে না।

তবে এ রকম মেয়ের সান্নিধ্যেই বা আমি এসেছি কই! আমি যে অন্য দেশের, অন্য পৃথিবীর, অন্য কোনোখানের। তাই এই নারীর সহজ কথার মধ্যে গ্লানির সন্ধান পাই। অনাবিল সহজ অসংকোচের মধ্যে আবিলতা খুঁজি।

মনটা আমার কেমন যেন আর্দ্র হয়ে ওঠে। ফ্রাউ গুটেনবার্গের সুন্দর ম্লান মুখশ্রী ঘিরে এক পরিপূর্ণ শুচিতা। দৃষ্টিতে তিল মাত্র কলুষ নেই। লেশমাত্র মিথ্যা নেই সে চাউনীতে।

কিছুক্ষণ পর হন্তদন্ত হ'য়ে ছুটে এলেন গুটেনবার্গ। গাড়ীতে চেপে চাবি ঘুরিয়ে বলেন: অসম্ভব ক্ষিদে পেয়েছে। আপনি এমন চুপচাপ কেন। দাঁড়ান অধৈর্য হবেন না এখনিই আমরা পৌঁছে যাবো হোটেলে। আর আমেরিকান ডজের ঠেলায় রাস্তা ফাঁকা পাওয়া মুসকিল!

পথে বিশেষ কোন কথা হয়নি। শুধু আপন মনে বকে যাচ্ছিলেন

হের গুটেনবার্গ। পুরনো মিউনিকের গল্পে, মহাযুদ্ধ আর আমেরিকানদের মুণ্ডপাতে ব্যস্ত রইলেন সারাক্ষণ।

হোটেলে যখন এসে পৌঁছোই তখন লাঞ্চের সময় প্রায় পার হ'য়ে যেতে বসেছে।

বিকেল থেকেই শরীরটা যেন কেমন খারাপ হলো। মাথাটাও কেমন ধ'রে উঠলো বিশ্রী ভাবে। চুপচাপ শুয়ে রইলাম। তবে মুহূর্তের জন্যেও ফ্রাউ গুটেনবার্গের কথা ভুলতে পারিনি। হের গুটেনবার্গ লোকটি ধুরন্ধর সন্দেহ নেই কিন্তু স্ত্রীকে কষ্ট দিচ্ছেন কেন? এঁদের দুজনের জীবনে দুরন্ত এক ফাঁক আছে নিশ্চয়ই। তার জন্যে হের গুটেনবার্গ দায়ী। লোকটার বয়স হয়েছে অনেক। আর মেয়েটির? একজনের শেষ হয়েছে আর একজনের সবে স্থরু। সত্যিই তো, ফ্রাউ গুটেনবার্গ স্থখী হবেন কি ক'রে?

এমন সময় ফোন বাজলো ঝনঝনিয়ে। অপর প্রান্ত থেকে এক কণ্ঠ ভেসে এলো: পাশের ঘর থেকে আমি হের গুটেনবার্গ কথা বলছি। সন্ধ্যেতে অপেরা যাবো ঠিক করেছি, আপনি আসবেন আমাদের সঙ্গে?

কেন যেন নিমন্ত্রণ আমার ভালো লাগলো না। সঙ্গী হিসাবে আমার মত কালা আদমীকে তাঁর এত পছন্দ করবার কোনও কারণ আমি খুঁজে পেলাম না। তুচ্ছ এক অজুহাতে সে নিমন্ত্রণ অতি বিনয়ের সঙ্গে ফিরিয়ে দিলাম। প্রচুর পরিমাণ হালকা হাসি আর ধন্যবাদের ছড়াছড়ির শেষে ফোন রেখে দিয়ে বিছানায় এসে শুয়ে পড়লাম।

পর মুহূর্তেই মনে হলো বোধ হয় তাড়াতাড়িতে ভুল করলাম। অপেরা বা গুটেনবার্গকে ভালো না লাগলেও ফ্রাউ গুটেনবার্গকে তো পাশে পেতাম। অতি নিকটেই সে পাশে থাকতো অনেকক্ষণ। পর মুহূর্তে পাল্টা প্রশ্ন মনে এসেছে। আমি কি চাই! ফ্রাউ গুটেনবার্গ

এ দেশের এক মেয়ে। পরস্ত্রী। তাঁর পাশে বসবার আনন্দ আমাকে পেয়ে বসে কেন? সামান্য সময়ে আমার মনের এ কি হাল হয়েছে? এ কি কাঙালপনা? কিসের প্রত্যাশা তাঁর কাছে? এইটুকু পুঁজি নিয়ে আমার মতামত আর ধারণা আমি সগর্বে দশজনের সামনে জানান দিয়ে থাকি। মাথাটা আমার কেমন যেন গুলিয়ে যেতে লাগলো।

সব কিছুই অস্পষ্ট! ধোঁয়াটে!! বিভ্রান্তিকর!!!

পথে নেমে এলাম। অশান্ত মন নিয়ে ঘুরলাম কিছুটা পথে পথে। অন্য কারো কথা এভাবে আমাকে তছনছ করেনি তো। বিক্ষিপ্ত চিন্তাকে শাসনে আনতে বহু লোকের কোলাহলের মধ্যে ছুটে গেলাম। মাথাটা কিছুটা হালকা হ'লো। অশান্ত গুমোট মন ঠাণ্ডা বাতাসে, আলোতে, আর বহুলোকের কোলাহলের মধ্যে কিছুটা হালকা হ'লো। কিছুটা অপ্রস্তুত হ'য়ে হোটেলে ফিরে আসি। অপ্রতিভ মনে দু'এক-জনের সঙ্গে লাউঞ্জে কথা বলি। দোতালার বারান্দার বিরাট আয়নাটার সাক্ষাৎ এড়িয়েই আঠারো নম্বর কামরা বাঁচিয়ে নিজের কাছেই লজ্জিত হ'তে হ'তে কামরায় এসে ঢুকি।

বেশ রাত। বাইরে প্রবল ঠাণ্ডা। বিছানাতে শুধু এ'পাশ ও'পাশ করছি। পালকের পুর ভরা লেপ অসহ্য গুমোট মনে হচ্ছে। এক চিন্তার বিরতির শেষে কালো পাখা মেলে নতুন কথার অগোছালো ভীড়ের স্তূপ জমা হচ্ছে।

শব্দ হ'লো একটা। অতি নিকটেই। অন্ধকার ঘরে চোখ তুলে তাকাই। আবার শব্দ। অতি ধীরে দরজায় যেন টোকা পড়ছে মনে হ'লো।

বেড স্যুইচ জ্বেলে দরজার দিকে এগিয়ে যাই। দরজা খুলে অবাক হয়ে গেলাম। আমার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ফ্রাউ গুটেনবার্গ।

আমাকে কিছু বলতে না দিয়ে বিনয়ে নুয়ে পড়লেন। সঙ্কোচের

হাসি টেনে বলেন: বিরক্ত করলাম আপনাকে। মাপ করবেন। বই টই কিছু আপনার আছে কি? একদম ঘুম আসছে না। শুধু এপাশ ওপাশ করছি। এরকম আমার প্রায়ই হয়। আপনাকে জাগিয়ে দিলাম নিশ্চয়ই।

কিছুটা ধাতস্থ হয়ে বলি: বই অবশ্য আছে। তবে আপনার পড়বার মত কোনও কিছু আছে ব'লে মনে হয় না।

দরজা থেকে ফিরে এসে টেবিলের কাছে এসে দাঁড়াই। ফ্রাউ গুটেনবার্গ এলেন সঙ্গে।

আমার টেবিলের হাল দেখে হেসে বললাম: দেখুন ফ্রাউ গুটেনবার্গ, আমার কাছে জর্মন কোনও কেতাব তো দেখছি না। আপনাকে আমি কি যে পড়তে দেব।

অপ্রস্তুতের হাসি। কিছুটা সঙ্কুচিত হ'য়ে বলেন: স্প্যানিশ বা ফ্রেঞ্চ ভাষার কোনও কিছু থাকলেও আমার চ'লবে।

ঘুরে দাঁড়াতে হলো আমাকে। ঢিলে রাত্রিবাস পরনে। সুন্দর একমাথা চুল। নরম মেয়েলী গন্ধে জড়িয়ে যাচ্ছে সারা ঘর। সুন্দর মুখশ্রী ঘিরে এক ক্লান্তির ছাপ। অলস দৃষ্টি মেলে আমার ঘরের সব কিছু যেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছেন।

চোখাচোখি হতে হেসে বলি: আপনার বহু ভাষায় দখল দেখে আমার খুব ভালো লাগলো কিন্তু স্প্যানিশ বা ফ্রেঞ্চ ভাষা আমার বিন্দুমাত্র জানা নেই। কিছু যদি মনে না করেন, একটি সাপ্তাহিক আছে হাতের কাছেই—এদেশেরই। আজকের রাতের মত হয়তো আপনার কাজ চলতে পারে।

কিছুটা নির্লিপ্ত কণ্ঠ ফ্রাউ গুটেনবার্গের: তাই দিন।

সাপ্তাহিকটি আমার বিছানার এক প্রান্তে রাখা ছিল। সেটি হাতে নিয়ে ফিরে আসতেই দেখি টেবিলে রাখা আমার ব্যাগটি হাতে তুলে নিয়ে এক অফুরন্ত কৌতূহলে সেটি নিরীক্ষণ করছেন।

হেসে বললেন: মাপ করবেন! এটি দেখবার লোভ আমি

কিছুতেই সামলাতে পারলাম না। চমৎকার জিনিসটি; আপনার দেশের নিশ্চয়ই ?

অতি সামান্য এই ঘটনাটি আমার খুব ভালো লাগলো। ব্যাগটি ছিল অতি সাধারণ। কলকাতায় শান্তিনিকেতনের এই চামড়ার ব্যাগটির দাম তিন টাকার বেশী নয়। সামান্য জিনিসটি ফ্রাউ গুটেনবার্গের এতটা ভালো লাগায় আমার পরিচিত রুচির যেন পরিচয় পেলাম।

কিছুটা অবাক হয়ে বলিঃ এই সামান্য ব্যাগটি আপনার এত ভালো লেগে গেল। তাজ্জব করলেন আমাকে।

নীচু পর্দ্দায় উত্তর এলোঃ উগ্রতার সঙ্গে শুচিতার চিরকালের বিরোধ। আপনাদের দেশের রুচি নম্র। জাঁকজমকের মধ্যে আছে দম্ভ। সামান্য ছোট জিনিসটি তাই আমাকে আকৃষ্ট করেছে।

ব্যাগ থেকে চোখ তুলে একবার আমাকে কয়েক মুহূর্ত ধরে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলেন। একটি চতুর চাউনী মেলে বলেনঃ আপনি বাগদত্তা ?

আচমকা এক হোঁচট খেলাম। কিছুটা বিস্ময়ের দৃষ্টিতে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলাম। প্রশ্নটির খেই খুঁজে না পেয়ে কি যেন বলতে যাচ্ছিলাম কিন্তু বাধা পেলাম।

ব্যাগের দিকে দৃষ্টি নামিয়ে বললেনঃ ভারতীয় মেয়েদের খুব সুন্দর দেখতে হয়। মুখের আদলখানি সত্যি আমার খুব ভালো লাগলো। আপনাদের বিয়ে হবে কবে ?

একটি শীতল স্পর্শ সারা দেহে বয়ে গেল আমার। ব্যাগে যে মন্দোদরী দেবীর ছবিটি ভরা আছে, সম্পূর্ণ ভুলেই গিয়েছিলাম আমি। কিছুটা ধাতস্থ হয়ে বলিঃ আমি বাগদত্তা নই। ও মেয়েটিকে আমি জীবনে কখনও দেখিনি। আমার কবে বিয়ে আমি জানি না।

কৌতূহল যেন বিস্ময়ে গিয়ে পৌঁছলো। অনেকটা যেন হাঁ হয়ে গলেন। বললেনঃ আপনি মেয়েটিকে চেনেন না ? তবে আপনার

ব্যাগে অপরিচিতার ছবি কেন? আপনি কিছু গোপন করছেন নিশ্চয়ই।

মন্দোদরী দেবীর ছবির ইতিহাস আমাকে ভেঙে বলতে হ'লো। একেবারে ভোলা থেকে সুরু করলাম। এই ছবিটি যে আমার প্রচুর উপকার করছে, বহু কৌতূহল আর আগ্রহকে আমি অতি সহজেই যে এই ছবিটির আশ্রয় নিয়ে ফিরিয়ে দিতে পারছি; দু'একটি সুন্দরী ললনার হৃদয়ের অকৃত্রিম ইচ্ছা যে এই ছবিটি আমার সম্পর্কে কি দ্রুত বিতৃষ্ণায় ভরিয়ে তুলেছে সে কাহিনী বর্ণনা করলাম।

ফ্রাউ গুটেনবার্গ মিষ্টি মিষ্টি হাসছেন। ছোট্ট ক'রে তাকিয়ে বললেন: আপনি সাংঘাতিক মানুষ। এভাবে আপনি মেয়েদের ঠকাচ্ছেন। কিন্তু এ কথা আমার কাছে আপনি প্রকাশ করলেন কেন?

কি জবাব দেব। দাঁড়িয়ে রইলাম কিছুক্ষণ। অপ্রস্তুতের দৃষ্টি নেমে এলো নীচে। কার্পেট বেয়ে আমার পায়ের কাছে এসে থামলো।

ফ্রাউ গুটেনবার্গ বলেন: আমি আপনাকে ঠিক চিনেছি। তাই ছবিটি দেখে ধাঁধায় পড়েছি। আপনার চোখে মুখে তার প্রকাশ আছে। আপনি প্রেমে পড়েননি নিশ্চয়ই! কিন্তু মেয়েদের ভালো-বাসবার বয়স আপনার অনেক দিন আগেই এসেছে।

আমি যেন কিছুটা বেতালা হয়ে পড়ি। অন্য কোনও কিছুর সূত্র খুঁজতে গিয়ে বলি: আপনি দাঁড়িয়ে কেন, বসুন ফ্রাউ গুটেনবার্গ।

ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে এলেন। কিছুটা দূরে, এক প্রান্তে এসে বসলেন। চুপচাপ বসে রইলেন কিছুক্ষণ। সাপ্তাহিকের মলাটটি দেখতে লাগলেন মন দিয়ে। তারপর একটি বিষণ্ণ সুর ভেঙে পড়ে কথাতে: 'ফ্রাউ' কথাটা কেমন বিদ্রূপ করে আমাকে। আর 'গুটেনবার্গ' আমাকে অস্থির করে তোলে। আমাকে আপনি স্টেলা বলে ডাকবেন। তাহলেই আমার ভালো লাগবে হের জেন।

স্তিমিত বিষণ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন। একটি গভীর ক্ষতের ব্যথায় সারা প্রাণ মন অবশ হয়ে ওঠে। নীরব এক নালিশ আছে যেন সে চাউনীতে।

বলেন ঃ ঘুম নেই, অনেক কথা ভাবছিলাম। তাই একটা কিছুর খোঁজে আপনার কাছে এলাম। কেন যেন আপনাকে আমার দেখতে ইচ্ছে হলো। আপনার কাছে আসতে আমার কেমন যেন ভালো লাগলো।

এ এক অস্বাভাবিক মুহূর্ত। এ এক বিচিত্র অনুভূতি।

কিছুক্ষণ গেল তারপর। হঠাৎ আমার খেয়াল হ'লো আমি স্টেলার সঙ্গে কথা বলছি। ফ্রাউ গুটেনবার্গ আমার মন থেকে সম্পূর্ণ অন্তর্হিত। 'আপনি' কখন যে 'তুমি'তে এসে ঠেকেছে খেয়াল করিনি। স্টেলার ঠোঁট থেকেও 'জ্জী' বিদায় নিয়েছেন অনেকক্ষণ। সেস্থান বেদখল হয়েছে 'ডু'তে!

স্টেলা বলে ঃ ভারতে তোমার কে আছেন?

জবাব দিলাম ঃ সবাই আছেন! মা'বাবা আছেন সেখানে!

স্টেলা আরও জানতে চাইলো! বলে ঃ ভাইবোন নেই?

হেসে বললাম ঃ আছেন!

কৌতূহলের সঙ্গে জানতে চায় স্টেলা ঃ বিয়ে করেছেন তাঁরা?

বললাম ঃ অনেকেই।

মাথা হেঁট করে স্টেলা প্রশ্ন করে ঃ তোমরা সব এক সঙ্গে থাক! এক বাড়ীতে থাক সবাই?

জানালাম হেসে হেসে ঃ তাতেই আমরা অভ্যস্ত!

শিশুর মত হেসে ওঠে স্টেলা। বলে ঃ ভারতীয় একটি মেয়ের মুখে অনেক খবর নিয়েছিলাম। তার মুখেই শুনেছি এসব। আমার কিন্তু এই রকম নিয়ম খুব ভালো লাগে।

স্টেলা হঠাৎ কেমন যেন শিশুর মত অনুযোগ সুরু করে। কিছুটা কাছে এসে বসে। বলে ঃ আমার সঙ্গে আল্পসে যাবে না তুমি!

কাল আমার সঙ্গে আল্প্‌সে যাবে না? বলো! আল্প্‌স তোমার খুব ভালো লাগবে।

পরিপূর্ণ ভালো লাগার আবেশে প্রাণ মন আমার ভরপুর। স্টেলার মোমের মত আঙুলগুলো হাতে তুলে নিই।

বিষন্ন এক অনুযোগ স্টেলার কণ্ঠে দিশেহারা হ'য়ে পড়েঃ কথা দাও তুমি কথা দাও, প্যারীতে তুমি যাবে আমার সঙ্গে। কিছু বলো। কথা দাও তুমি আমাকে।

কিছুটা যেন হুঁশ ফিরে এলো। হেসে বলিঃ অল্প কদিনের ছুটি আমার! তাছাড়া এই মুহূর্তে প্যারী ভ্রমণের পাথেয়তে আমার টান পড়বে। আমার জন্যে বিদেশী মুদ্রার হাত দরাজ হবে না। প্যারীতে খরচাও বড় বিস্তর। আমার কাছে ভারতীয় মুদ্রার চেক বই খুঁজলে হয়তো পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু পকেটে ডিমার্ক নেই স্টেলা।

স্টেলা কেমন বেহিসাবী অস্থির হয়ে ওঠে। বলেঃ জানি বিদেশী মুদ্রার দুর্ভিক্ষ চলেছে তোমার দেশে। তাই বলে আমার স্বামীর অর্থ আমি তোমাকে দেব না। তোমাকে কিছু মাত্র সঙ্কুচিত হতে দেখতে পারবো না। আমার সামান্য যা কিছু আছে, উজাড় ক'রে দেব তোমাকে। সে দান নয়। সাহায্য নয়। উপহারও নয় সে। সে আমার নিবেদন। ছুটির কথা বলছো তুমি, কিন্তু আমাদের এই শুভযাত্রা তুচ্ছ অজুহাতে তুমি ঠেকিয়ে রাখতে পার না।

দু'ফোঁটা মুক্তোর মত অশ্রু স্টেলার গাল বেয়ে ঝরে পড়লো।

এ কি! স্টেলার চোখে জল! শান্ত করতে চেস্টা করি। কিন্তু আমি নিজেই তখন অশান্ত। বলিঃ স্টেলা কাঁদছো?

ভেজা জড়ানো গলা স্টেলার। বলেঃ তোমাদের দেশের মেয়েরা কাঁদে না? কান্নার-ও এক আনন্দ আছে। ভারি বোঝা নেমে যায় বুক থেকে।

অভিভূত আমি। কণ্ঠ আমার স্বাভাবিক নয়। অবিমিশ্র এক আনন্দের ঝরনা যেন বয়ে চলেছে অবারিত ধারায়।

হেসে বলি ঃ তুমি বড় ভাবপ্রবণ। তুমি কষ্ট পেলে আমার খারাপ লাগবে।

তু'বাহুর আলিঙ্গনে স্টেলা আমার দেহে ভেঙ্গে পড়ে। একটি নরম হাত আমার কাঁধে দিশেহারা হয়ে গেল। আমার হাতটি স্টেলার বুকে।

স্টেলা নত হ'য়ে আমার বুকের ওপর মাথাটি রাখলে। আনত মুখের উষ্ণ স্পর্শে সারা দেহ কেমন যেন অবশ হয়ে এলো।

আরও কয়েক মুহূর্ত। মুখে গালে আঙুল বুলিয়ে স্টেলা আদর জানালে। নড়েচড়ে মুখ তুলে আমার ঠোঁটে চুম্বন এঁকে দিল উত্তপ্ত অনুরাগে। তারপর সারা শরীরটা কেমন এলিয়ে গেল স্টেলার। বাহু আলগা হয়ে গেল। আলতো ক'রে নিজের দেহটি বিযুক্ত করে নিল। উঠে দাঁড়ালো স্টেলা।

দ্বিধাজড়িত কণ্ঠস্বরে বলে ঃ আমাকে তুমি ঘৃণা কর ?

আমি অশান্ত, অসংযত। সহজ সুরে বলতে চাইলাম ঃ না !

কিছুটা কাঁপা গলা স্টেলার ঃ তুমি আমাকে দোষ দেবে না ?

একই উত্তর আমার ঠোঁটে এলো ঃ না।

স্টেলা আবার জানতে চাইলো। নীচু পর্দ্দাতে টেনে টেনে বলে ঃ আমি কোন ভুল করিনি ?

হেসে বলেছি ঃ না।

ধীর কম্পিত পদক্ষেপে ঘর ছেড়ে স্টেলা বেরিয়ে গেল তারপর।

বিভ্রান্ত মনে তুর্বোধ্য রহস্য দ্রষ্টা এক শিশুর মত বিস্মিত হ'য়ে বসে থাকি কিছুক্ষণ।

নিভিয়ে দিলাম আলোটা।

সকাল।

গুটেনবার্গের সঙ্গে বসেই আমার কথা চলছিল। স্টেলা পাশে। নিজের কাছেই কেমন যেন অপ্রস্তুত হ'য়ে ছিলাম। চোখ তুলে তাকাতে পারিনি। সহজ হ'তে পারিনি কিছুতেই।

আমাদের দুজনের কথার মাঝখানে স্টেলা হঠাৎ বলে উঠলো আমরা আল্প্স যাচ্ছি আজ। আপনি আসুন না আমাদের সঙ্গে।

জবাব দিলেন গুটেনবার্গ। তির্যক চাউনীতে একবার দেখে নিলেন স্টেলাকে। তারপর ঠোঁটে হাসি টেনে বললেন: ওঁর বোধ হয় কাজ আছে।

স্টেলার কণ্ঠে বিস্ময়। বাঁকা ছুরির মত ভ্রূ ভেঙ্গে পড়লো। বলল: কি কাজ আছে? এত দূর দেশে এসে আল্প্স দেখবেন না? বার্লিন না দেখলেও ক্ষতি নেই, কিন্তু আল্প্স না দেখলে দেখবেন কি?

আমি নিরুত্তর ছিলাম। চতুর লোক গুটেনবার্গ। বুঝলেন আমার মৌনতাটাই অর্থপূর্ণ। খুব একটা কৃত্রিম আগ্রহ ফুটিয়ে তোলেন চোখেমুখে। বলেন: আপনার হাতে কাজ না থাকলে অনায়াসেই আসতে পারেন। আপনার সঙ্গ আমার ভালো লাগবে।

হাসি পেল। বেশ বুঝলাম প্রবল আপত্তি থাকা সত্ত্বেও মাত্র ভদ্রতার খাতিরে গুটেনবার্গের এই নিমন্ত্রণ। সভ্যতার জ্বালা অনেক। কালকূট বিষে অন্তর তাঁর কুরে কুরে যাচ্ছে হয়তো, তবু 'কুলটুরে'র খাতিরে কি মর্মান্তিক আত্ম প্রবঞ্চনা।

কিন্তু আমার যে দারুণ আগ্রহ। আমাকে তো যেতে হবেই। তবু বাঁকানো কথা বলি: আপনাদের অসুবিধে হবে। দু'জনেই আপনারা ঘুরে আসুন। তাছাড়া দু'জনের মধ্যে আল্প্স-এ আমার মত তৃতীয় ব্যক্তি নিতান্তই অবাঞ্ছিত।

ছোট্ট করে তাকালেন গুটেনবার্গ। হেসে বললেন: আপনার রসবোধ আছে। কিন্তু বিশ্বাস করুন আপনি থাকলে আমার ভালো লাগবে। পথক্লেশ যেটুকু আল্প্‌স আপনাকে ভুলিয়ে দেবে অক্লেশে।

স্টেলা অপ্রতিভ কণ্ঠে বলে: আপনার অসুবিধে থাকলে জোর করবো না।

গুটেনবার্গের চোখ বাঁচিয়ে এক অর্থপূর্ণ কটাক্ষ হানলে স্টেলা। গুটেনবার্গের কথায় বাধা দিয়ে বলি: বেশতো আমি যাবো আপনাদের সঙ্গে।

মাথা নেড়ে ছোট্ট করে তাকালেন গুটেনবার্গ। আমার চোখে চোখ রেখে বললেন: আসুন, আল্প্‌স আপনার ভালো লাগবে।

স্টেলার দিকে চোখ তুলে তাকাই। অবিমিশ্র এক খুশীর পাতলা হাসিতে যেন মোমের মত গলে গলে যাচ্ছে ওর নরম বুকটা।

বেরুতে বেরুতে প্রায় দশটা।

সুন্দর পোষাক পরেছেন গুটেনবার্গ। পরণে সাদা স্যুট। গাঢ় লাল টাই। লাল রুমাল।

প্রচুর হাসছেন। অনেক কথা বলছেন। আমাকে বললেন: বেড়াতে আমি বেরুতে চাই না। তবে একবার বেরুলে আমি ভয়ানক হৈ চৈ করি।

আর স্টেলা? সাদা আঁটো সোয়েটারের সঙ্গে মানিয়ে পরা লাল টুকটুকে জিন্‌স্‌। চোখে গগল্‌স্‌। মাথার চুলগুলো লাল ওড়নার ঘোমটায় আঁটো করে চিবুকের সঙ্গে বাঁধা। লাল দস্তানা হাতে। কাঁধে ঝোলানো গোটা চারেক চামড়ার থলে। ক্যামেরা আর দূরবীণ।

ওভার কোটটি আমার হাতে তুলে দিয়ে স্বচ্ছ হেসে বলে: এমন দিন আর হবে না। আল্প্‌সে আমি গেছি অনেকবার। কিন্তু আজকে

আমার এত আনন্দ হচ্ছে কেন। তোমাকেই বা আজ দেখে এত আনন্দ লাগছে কেন? অমন করে তুমি কি দেখছো আমার দিকে?

শুধু বললাম : তোমাকে।

শিশুর মত কৌতূহল স্টেলার কণ্ঠে : কেমন দেখছো?

আনন্দ যেন বাধা মানছে না আমারও। বলি : এদেশে এসেছি পেটের টানে। প্রাণ বা মনের টানে নয়। যেটুকু তোমাদের দেশের ভাষা জানি, দোকানে পশারে, কলে কারখানায় কাজ চালাতে পারি! মোটামুটি গল্প ফাঁদতেও আমার বাধে না। কিন্তু তোমার সাক্ষাৎ যে পাব এখানে, এমন কথা আমার জানা ছিল কই? কেমন দেখছি তোমাকে আমি তোমাকে বোঝাবো কেমন করে। আমার ঠোঁটে শব্দতত্ত্বের আকাল। জর্মন আমি কিছুই শিখিনি স্টেলা! তোমার খাতিরে সুরু করতে হবে। ভাষা খুঁজতে হবে আমাকে নতুন ক'রে।

স্টেলার ডাগর আঁখি পল্লবে সলজ্জ চাউনি নেমে এলো। মাথা নত হলো। মাটিতে রবারের সোলটি ঘষতে লাগলো বাঁ পায়ের।

স্টেলা বলে : টেগোর যে ভাষায় কবিতা লিখেছেন, দেশে তুমি কি সেই ভাষাতে কথা বল?

আমি অভিভূত। আমি সার্থক। মনে হলো স্টেলা কোনও বিদেশিনী নয়। কতদিনের কত কাছের মানুষ। স্টেলা দূরের নয়— নিকটের। স্টেলার অন্যের নয়—আমার।

গুটেনবার্গ গাড়িটি আমাদের সামনে নিয়ে এলেন। এক রাশ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন : আমাদের দেরী করা ঠিক হবে না। ট্রেন ধরবার কথাটা ভুলে গেলে চলবে না।

·

চুপচাপ অনেকটা পথ আসা গেল। গাড়ীর রেডিও'র যন্ত্রসঙ্গীত আমাদের দ্রুত লয়ে এগিয়ে চলার সঙ্গে তাল রাখছিল।

গুটেনবার্গ সুরু করলেন : বেশ শীত। শীতটা বেশ জোর পড়বে মনে হচ্ছে।

স্টেলা কি যেন জবাব দিল শোনা গেল না। পাশ দিয়ে প্রচণ্ড বেগে দৈত্যের মত একটি গাড়ী আমাদের পেছনে ফেলে চ'লে গেল।

রেডিও'র যন্ত্র সঙ্গীত থামিয়ে দিয়ে গুটেনবার্গ আয়নায় তাকালেন আমার দিকে। ঠোঁটে হেসে বলেন : বলুন তো কি শুনলেন?

সঙ্গীত আমার ধাতে নেই। তাও আবার বিদেশী। তবু এটি আমার দৈবাৎ জানা ছিল। হেসে বললাম : 'বাখ্'!

স্টেলা ঘুরে তাকালে আমার দিকে। প্রবল বেগে সামনে পেছনে মাথা নেড়ে গুটেনবার্গ বলেন : এত তাড়াতাড়ি নির্ভুল উত্তর আপনার আসবে আমি আশা করিনি।

সামনে দুটি রাস্তা দু'মুখে চলে গেছে। গাড়ির গতি কিছুটা কমিয়ে দিয়ে গুটেনবার্গ স্টেলাকে প্রশ্ন করলেন : এবার কোন দিকে? ডাইনে না বাঁ-য়ে?

স্টেলা সহজ কণ্ঠে বলে : ডাইনে। আর কিছুটা গেলেই 'গারমিশ'। তোমার স্মরণশক্তি দেখছি লোপ পাচ্ছে দিন দিন।

গুটেনবার্গ খুব হাসলেন একচোট। ডান দিকের রাস্তায় নেমে বলেন : দেখ, আমার স্মরণশক্তি আর তোমার সৎবুদ্ধি একত্রিত হ'লে পৃথিবীর অনেক শুভ কাজ অতি অক্লেশে সুসম্পন্ন হ'তো। কিন্তু বেশীর ভাগ সময়েই আমার স্মরণে অনেক কিছুই আসে না, আর তোমার বুদ্ধিও কেমন যেন গুলিয়ে যায়।

স্টেলা বলে, শুভ কাজের তাগিদে সারা দুনিয়াতে সৎলোকগুলো জায়গায় জায়গায় জটলা পাকাচ্ছে। আমি আর ভীড়ের মধ্যে ঠেলাঠেলি করিতে চাই না। সৎবুদ্ধি কথাটা অসম্পূর্ণ, পুরোপুরি অসম্পূর্ণ না হ'লেও যথার্থ তার সংজ্ঞা নেই। ওটা আপেক্ষিক। তোমার কাছে যেটি সৎবুদ্ধি, আমার কাছে হয়তো সেটা কুবুদ্ধির-ই নামান্তর।

এইমাত্র ক্রমাগত হর্ণ বাজিয়ে যে আমাদের পেছনে ফেলে চ'লে গেল সে বেচারী হয়তো সেটাকে দুর্বুদ্ধি বলে জানে।

গুটেনবার্গ আবার আয়নায় তাকান আমার দিকে। শুষ্ক হেসে বলেন : এটা কি শুনলেন বলুন তো?

আমাকে মৌন থাকতে দেখে এক টুকরো হেসে বলেন : পারলেন না তো! বুঝেছি আপনি ন্যায়শাস্ত্র বা দর্শনের ছাত্র নন।

ফুটফুটে ছোট গ্রাম—'গারমিশ'। পাহাড়ের ঢালুতে জায়গাটি অতি রমণীয়। অনেকগুলো গাড়ী সারবন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ধারে কাছে লোকজন খুব সামান্যই। গাড়ী থেকে নামতে হ'লো।

কিন্তু সমস্ত মাটি। জানা গেল আধ ঘণ্টা আগেই 'গারমিশে'র শেষ ট্রেন ছেড়ে গেছে। তবে উপায়?

ঠিক সেই সময়ই ডান দিক থেকে একটা ট্যাক্সি সজোরে আমাদের সামনে এসে দাঁড়ালো। আমাদের অবস্থা হয়তো আন্দাজ করেছিল ড্রাইভারটি। পরণে তার আল্পসের জমকালো পোষাক। মাথায় পালক গোঁজা। মুখ বাড়িয়ে বললে : উপায় আছে—আল্‌সে যাবেন আপনারা? স্বচ্ছন্দে আমার গাড়ীতে আসতে পারেন। পৌঁছে দিতে পারি 'টিরলে'। 'কেবল্‌-কার' সেখানে পাওয়া যাবে।

হাতে যেন স্বর্গ পাওয়া গেল। গুটেনবার্গ শুধু মুখ তু'লে তাকালেন আমার দিকে।

হেসে বললাম : পাসপোর্ট আমার সঙ্গে আছে। কিন্তু অস্ট্রিয়ার ভিসা?

গুটেনবার্গ হেসে এক রকম উড়িয়েই দিলেন সেকথা। বললেন : বর্ডার-এ করিয়ে নেব। সময় আর নষ্ট করা নয়। দিন বড় সুন্দর। গত বছর এমন সুন্দর দিন আমরা পাইনি।

গল্পে গল্পে চলে এলাম অনেকটা। অস্ট্রিয়ার সীমা পেরিয়ে এলাম। সাদা বরফে ঢাকা চূড়ো নজরে আসছে। বাঁয়ে আল্‌প্‌স দেখা যাচ্ছে।

'কেব্‌ল্ কার' পাওয়া গেল 'টিরলে'। 'কেব্‌ল্ কার' আমাকে অবাক করে নি। এর এক ভিন্ন সংস্করণ দেখেছি ধানবাদে। চাঁদমারী-র মাথার উপর দিয়ে গোয়েঙ্কার 'রোপ ওয়ে'র আনাগোনা দেখেছি দার্জিলিং'য়ে। 'কেব্‌ল্ কার' অনেকটা তাই। কিন্তু পাত্রটি একটি কাঁচে ঢাকা খাঁচা। কয়লার বদলে বোঝাই মানুষ। লোহার দড়িতে ঝুলতে ঝুলতে সেই খাঁচাটা উঠে যাচ্ছে খাড়াই পাহাড়ের গায়।

আমরা জন দশেক যাত্রী। স্টেলা ছেলে মানুষের মত চঞ্চল হ'য়ে উঠেছে। মুভি ক্যামেরায় ছবি তোলবার জন্যে এদিকে যাচ্ছে, ওদিকে নড়ছে।

গুটেনবার্গ কিছুটা প্রবোধ দিয়ে বলেনঃ সাধারণতঃ কোনও দুর্ঘটনা হয় না। একবার শুধু মাঝ রাস্তায় যান্ত্রিক গোলযোগ হয়েছিল। প্রায় পাঁচ হাজার ফুট উঁচুতে পুরো দুদিন মানুষে ঝুলে ছিল প্রাণ হাতে নিয়ে।

শির শির ক'রে উঠলো শিরদাঁড়াটা। মনে মনে চীৎকার ক'রে উঠলাম: বজরং বলী কী জয়।

অল্পক্ষণের মধ্যেই নীচে ফেলে এলাম সবুজ গাছপালা, রঙীন বাড়ীঘর। ছাইরঙের পাথর সুরু হলো। তারপর শুধু সাদা। চোখ ঝলসানো চকচকে সাদা বরফ। কোথাও যেন এক ফোঁটা দাগ নেই। দিকদিগন্তে তিল মাত্র কালিমা নেই।

ঝোলা পথ শেষ হ'লো। অপর প্রান্তে একটা হাঁটা পথ। নাম 'আইস-টানেল'। সার্থক নাম। দেওয়াল জমাট বরফ। এপারে অস্ট্রিয়া, ওপারে জর্মনি। মাঝামাঝি একটা জায়গায় ফ্রন্টিয়ার।

নতুন জায়গা। অপরিচিত অচেনা পরিবেশ। ভালই লাগছিল। অবাকও হচ্ছিলাম কখন কখন। কিন্তু টানেলের অপর প্রান্তে পৌঁছে আমাকে হতবাক হ'তে হলো।

টানেল শেষ হলো একটা হোটলের মধ্যে। এ যেন আমাদের গ্রাণ্ড্ হোটেল। ঝকঝকে চকচকে হোটেল। লিফট্, কাফে, রেঁস্তরা আর লাউঞ্জ। সেই সঙ্গে চমৎকার থাকবার ঘর।

গুটেনবার্গ ব্যবস্থাপনায় ব্যস্ত হ'য়ে পড়েন। ঘর ঠিক করলেন নিজের পছন্দ মত। আমার থাকার ব্যবস্থা হলো অপর প্রান্তের একটা কামরায়।

ঘরের পাশ দিয়ে ব্যালকনি। হেলানো চেয়ারে দেহ এলিয়ে অনেকে মড়ার মত প'ড়ে আছেন। প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করছেন নয়নভরে।

প্রায় সকলেই এসেছেন বিশ্রামের লোভে। নির্ভেজাল হাওয়া বাতাসের আকর্ষণে। একঘেয়ে কঠোর পরিশ্রমের পর কয়েক দিনের বিরতি। রুর এলাকা থেকে চিমনীর ধোঁয়া আর কারখানার বাঁশিতে ক্লান্ত মানুষ অল্প কয়েকদিনের জন্যে ছুটে এসেছেন। আমার মত ঘুরতে এসেছেন কেউ। জাহাজ ফেলে হামবুর্গ থেকে পালিয়ে এসেছেন কেউবা।

লাঞ্চরুম থেকে বেরিয়ে গুটেনবার্গ আড্ডা গাড়লেন ব্যালকনিতে। ঠিক আড্ডা নয়, চুপচাপ হেলানো চেয়ারে ব'সে রইলেন। শীতে বাতের ব্যাথা হয়তো কিছুটা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। পরিশ্রান্ত হ'য়েছেন নিশ্চয়ই। কিন্তু সে প্রসঙ্গ সম্পূর্ণ এড়িয়ে গেলেন। হেসে বললেনঃ আল্প্স আমি দেখবো এখান থেকে। চুপচাপ এখানে পড়ে থাকলে আমার ভালো লাগবে। আপনি নতুন জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েই আনন্দ পাবেন বেশী।

একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্তে ঘুরে বেড়াচ্ছে স্টেলা। হাতের দু'মুঠিতে তার রুটির টুকরো। বিস্কুট আর কেকের দানা। ছুঁড়ে

ছুঁড়ে দিচ্ছে আকাশের দিকে। কাকের মত এক ঝাঁক পাখী সেই টুকরো আর দানার পেছনে উড়ছে এদিক থেকে সেদিকে।

আমি যে কখন স্টেলার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলাম খেয়াল করিনি। হোটেল থেকে অনেকটা নীচে বহু লোক বরফের ওপর 'স্কি' করছে। সাদা বরফের গায়ে বহু দূরের মানুষগুলোকে কালো কালো বিন্দুর মত মনে হয়।

স্টেলা বলেঃ 'জুগ-স্পিট্‌স্' থেকে আল্প্‌স তুমি আরও ভালো দেখবে। এসো আমার সঙ্গে।

জমজমাট পরিবেশ। বেহিসাবী মানুষের অগোছালো আনাগোনা। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি অন্য কোনও কিছু আমি যেন টেরই পাই না। অন্য কারো দিকে আমার দৃষ্টি পোঁছায় না। স্টেলা আমাকে আচ্ছন্ন করেছে। আল্প্‌স যেন আমার চোখে দীপ্তিহীন। কেমন যেন নিস্প্রভ।

দু'পাত্র কড়া ধাতের ফরমাশ দিয়ে বসলে স্টেলা। কেমন যেন সে নিজের খেয়ালেই বিভোর। আপন খুশীতেই মশগুল।

ঠোঁটে সুন্দর খুশীর হাসি ফুটিয়ে তুলে বলেঃ আল্প্‌স-এ আমি এসেছি আগে, অনেকবার। কিন্তু এত সুন্দর, এত অপূর্ব আমার মনে হয়নি কোনদিন।...সামান্য আলাপ থেকে আমাদের পরিচয় যে এত নিবিড় হবে আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। আজকের এই মুহূর্তগুলো আমার মনে হয় সবচেয়ে দুর্মূল্য সময়।

ছোট একটি চুমুক দিয়ে স্টেলা বলেঃ আমাদের পরিচয় কি আকস্মিক বলোতো?

মাথা নেড়ে বলিঃ একদম ভুল কথা। পৃথিবীর জন্ম থেকে আজকের এই মুহূর্তের জন্য সময় উন্মাদের মত ছুটে এসেছে আমাদের দিকে। তোমার সঙ্গে আমার দেখা হ'তোই। এইখানেই যুক্তি তার নাগাল পায় না। স্বাভাবিক দৃষ্টিতে তাই অসঙ্গতি। অদৃষ্টবাদে আমি বিশ্বাসী নই। আমাদের পরিচয় আকস্মিক নয়—অনিবার্য।

স্টেলা হেসে বলে : তুমি বড় সুন্দর কথা সাজিয়ে বলতে পার। আমার কিন্তু ভয় হয়।

বললাম : কিসের ভয় ?

স্টেলার ভগ্ন কণ্ঠ : বহুদিন পর, বহু প্রতীক্ষার শেষে তোমার মত মানুষের সন্ধান পেয়েছি। হঠাৎ কোনও দুর্যোগে যদি হারিয়ে ফেলি।

আত্মপ্রসাদের হাসিতে সারা মুখ ভরিয়ে তুলি। বলি : আমার দেশের মেয়ের মন তুমি কোথায় পেলে স্টেলা ?

স্টেলার ভাবলেশহীন চাউনী। বিষণ্ণ কণ্ঠে বলে : সব মেয়েরাই ভালোবাসার কাঙাল। তোমার দেশে যে নিয়মে ফুল ফোটে, এখানেও সে নিয়মের বিশেষ ব্যতিক্রম আছে কি ? ভালোবাসায় পৃথিবীর সব মেয়েদের শরীর মন একই নিয়মে অস্থির হয়ে ওঠে। সবটা নিয়েই তো প্রেম।

স্টেলাকে তাড়া দিতেই ও আমার হাতে চাপ দিয়ে বসিয়ে দিল। দু'পাত্র 'শ্নাপস্' চেয়ে বসলে স্টেলা। বলে : হোটেলের মধ্যে ঠাণ্ডাটি তুমি টের পাচ্ছো না। বাইরে এখন প্রবল ঠাণ্ডা। তাপমানযন্ত্রের শূণ্যের নীচে কয়েকডিগ্রী সেন্টিগ্রেড। শরীরটা তোমার গরম রাখা দরকার। জোর ক'রে ধরে এনেছি আল্প্স-এ। তোমার ভালো মন্দ আমাকেই দেখতে হবে। 'শ্নাপস্' খাও, ভালো লাগবে। কিছুটা তির-তির না করলে আমারও মোটেই ভালো লাগছে না।

'শ্নাপস্' শেষ ক'রে উঠে পড়লাম। হোটেলেরই একটি বিরাট ঘরের এক প্রান্তে 'কেবল্ কার' অপেক্ষায় ছিল। স্টেলা আর আমি উঠে বসলাম। চললাম সবচেয়ে উঁচু চূড়োতে 'জুগ-স্পিট্স্'।

জর্মনির সব চেয়ে উঁচু জায়গা এটি। স্টেশনটি একটি ছোট বাড়ি। ছাতের ওপর তুষার। চারটে দেশের হদিশ মেলে এখান থেকে। ইটালি, অস্ট্রিয়া, সুইজারল্যাণ্ড আর জর্মনি।

প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। হাত ছুটো আমার দস্তানার মধ্যেও কনকনিয়ে উঠছে। তুষার আর তুষার! সাদা তুষারের প্লাবন ডেকেছে চারপাশে।

স্টেলা আমার বুকের ওপর তার দেহটা আলগা ক'রে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো অনেকক্ষণ। ডান হাতটা ওভারকোটের পকেটে। বাম হাতে স্টেলার ক্ষীণকটি বেষ্টন করে দাঁড়িয়ে আমি।

এক ভদ্রলোক এক সুন্দরীকে জড়িয়ে ধ'রে অতিকষ্টে যেন হেঁটে গেলেন সামনে দিয়ে। পাগলের মত ছবি তুলেছেন আর এক ভদ্রলোক। সবাই ব্যস্ত। কারো প্রতি কারো ভ্রূক্ষেপ নেই।

স্টেলা বলে: তোমার শরীরটা খুব সংযত। পুরুষ মানুষের হ্যাংলামো আমি পছন্দ করিনে মোটেই।

আমি বলি: শরীরের কথা থাক স্টেলা। তোমার মন কি বলে?

স্টেলার সুন্দর তনু খুশীর এক সহজ আবেশে ভেঙে পড়লো। সুন্দর হেসে বলে: দেখ, শরীর আর মন ছুটোকে আলাদা ক'রে দেখলে ভুল হবে। ওছুটো আলাদা নয়। মন দেওয়া নেওয়া যখন ছুজনেরই মনে একই সঙ্গীতের সৃষ্টি করে, দেহ সেখানে অনুপস্থিত থাকতে পারে না। জীবনের এই সহজ স্বাভাবিক ব্যাপার বুদ্ধিজীবীরা কিন্তু অস্বাভাবিক বলে জানে। তবে এ অধিকার সবার নয়। আমাদের কাছে যেটি অমিয় আচার, অন্যের কাছে বেহিসাবী অভ্যাসে সেটি দাঁড়াবে অমিতাচারে। প্রেম আর স্ফূর্তি এক জিনিষ নয়। তাই আমি ভয় পাই।

আরও কাছে আরও নিকটে, স্টেলাকে টেনে নি। নরম দেহটিতে সামান্য চাপ দিয়ে বলি: কিসের ভয় স্টেলা?

স্টেলার কণ্ঠস্বরে জড়িমা। সঙ্কোচের একটি মিহি রেশ তার কথাগুলোকে ঘিরে রাখে। ওভারকোটের বোতাম আলগা ক'রে নরম হাতে আমাকে সামান্য চাপ দিলে। চোখছুটো আলতো করে তুলে বলে: আমাকে হয়তো তুমি ঘৃণা করবে কোনোদিন। তখন আমি

দাঁড়াবো কোথায় ? আমার প্রেমকে যদি তুমি ভুল বোঝ। ভালবাসাকে যদি তুমি স্ফূর্তি মনে কর।

কৃত্রিম রোষ প্রকাশ ক'রেছি। মাথা নেড়ে বলেছি ঃ এ তোমার সব উদ্ভট চিন্তা। এখানে এসব কথা তুমি ভাবছো কেন ? আমি কি তোমাকে আঘাত দিয়েছি স্টেলা ?

মাথা নেড়ে স্টেলা বলে ঃ নিতান্তই হতভাগিনী আমি। তাই তোমাকেও ভয় পাই। তুমি আমাকে অনেক দিয়েছো। তোমার অনেক আছে। পুরুষ মানুষ তুমি, দানাউ নদীর ঢেউয়ের মত তোমার পৌরুষ আছে চরিত্রে। কিন্তু...

আমার কিছুটা বিভ্রান্ত প্রশ্ন। তবু হালকা ক'রে বলতে চেষ্টা করি ঃ কিন্তু কি স্টেলা ? তোমার ভয় কেন ? গোপন ক'রো না কিছু। তুমি আমাকে অবিশ্বাস করো না।

আমার মুখোমুখি ঘুরে দাঁড়ালো স্টেলা। অসহায়ের দৃষ্টি ভ'রে উঠলো দু'চোখে। ঠোঁট দুটি কেঁপে উঠলো থরথর করে। ভেজা গলায় বললে ঃ তোমাকে অবিশ্বাস ! এ জীবন থাকতে নয়। আমি তোমার মত মহৎ নই। তাই হয়তো মিথ্যে কিছু ভেবে নিজেকে বিভ্রান্ত করি। তোমাকে অশান্ত করি।

নিবিড় আলিঙ্গনে আমাকে বেঁধে ফেলে স্টেলা। নরম উষ্ণ বুকটা আমার বুকে চেপে রাখলে অনেকক্ষণ। গভীর এক তৃপ্তির আবেশে চোখদুটি বন্ধ হয়ে আসে। চুম্বন এঁকে দিলাম গভীর অনুরাগে।

স্টেলা কেমন বেহিসাবী হ'য়ে পড়লো। শরীর আর মন অশান্ত হয়ে ওঠে। উঁচু হ'য়ে বিপুল আবেগে আমাকে আকর্ষণ করলে। পাগলের মত চুম্বন ক'রে চললো আমার চোখে মুখে। যদিও বা থামালাম তাকে, পর মুহূর্তে আমাকেই স্থুরু করতে হলো নতুন ক'রে।

দেহ মুক্ত করে স্টেলা বলে ঃ চল, এবার নিচে যাই। বরফের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে তোমার নিশ্চয়ই ভালো লাগবে।

'কেবল্ কারে'র দিকে এগিয়ে গেলাম। সামনে স্টেলা। চলার ভঙ্গিতে লীলায়িত এক মাধুর্য। সুমধ্যমার সঙ্গে লাল আঁটো জিনস্ দেহের পরিপুষ্ট নিম্নাংশ এক কমনীয় ছন্দে উঠছে-পড়ছে।

আমি অনভ্যস্ত। কিছুটা আনাড়ীও। পদ্মার সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। প্রমত্ত সেই নদীতে আমি সাঁতার কেটেছি বহুবার। কিন্তু তুষার বা বরফ আমি দেখেছি কোথায়? স্টেলা কিন্তু নাছোড়। তাকে সঙ্গ দেবার খাতিরে আমাকেও নামতে হলো 'স্কি' করতে।

একে প্রবল শীত। আঙুলগুলোর যেন কোনো সাড় নেই। স্টেলার ক্ষিপ্র গতির নাগাল পাওয়া দুষ্কর। কয়েকবার অতি হাস্যকর রকম আছাড় খেয়ে ফিরে এসে গুম হয়ে বসলাম। দেখলাম, দুরন্ত নেশায় স্টেলা জমাট বরফের মধ্যে তির্যক গতিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

অল্পক্ষন পর স্টেলা এলো। বললেঃ তুমি বসে গেলে এত অল্প সময়ে? হাঁপিয়ে পড়েছো নিশ্চয়ই।

কৃত্রিম অভিমানের সুরে বলিঃ হাঁপিয়ে নয়, সব লোক হাসছিল। আমার দেশে বড় বড় নদী আছে। সাঁতারে তোমাকে আমি হারিয়ে দিতে পারি।

স্টেলা দুষ্টুমি ভরা চোখে হাসলে। হেসে বলেঃ চল এবার ফেরা যাক।

উঠে দাঁড়াই। হিমেল বাতাস। ধূসর আকাশ। বরফে ঢাকা হোটেলের মাথাটি মিঠে রোদে চিক্ চিক্ করছে। আলোতে উদ্ভাসিত আল্প্স শিশুর মত হাসছে।

নিজের ঘরে এসে চুপচাপ শুয়ে থাকলাম। দেহ ক্লান্ত। মন বিক্ষিপ্ত। নানা এলোমেলো চিন্তার ভীড়। স্টেলাকে কেন্দ্র ক'রে সম্ভব-অসম্ভব নানা ভাবনায় মন কিছুটা বিভ্রান্ত।

আমি জানি আমি এমন এক জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছি যেখান থেকে ফেরা অসম্ভব। এই সামান্য সময়ের মধ্যে নিজেকে প্রশ্ন ক'রেছি বহুবার। একটি নিদারুণ অন্তর্দ্বন্দ্বে শুধু তছনছ হ'য়েছি মনে মনে। সংযত চরিত্রের দোহাই দেব না। তবে আমার বিচার বুদ্ধিতে আমি ব্যক্তিগত ভাবে শ্রদ্ধাশীল। কিন্তু আজ এই মুহূর্তে জীবন সম্পর্কে আমার অনুভূতি ভিন্নরূপ। অন্তরের সুপ্ত মণিকোঠায় যে সঙ্গীত আজ বেজে উঠেছে সেই পবিত্র সুরনির্ঝর আমার সব কিছু চিন্তা-ভাবনা আর বিভ্রান্তি অতি সহজেই এক সুসম শাসনে এনে ছুটে চলেছে পাগলা ঝোরার মত। নদী চলেছে সাগরে।

গুটেনবার্গকে দেখে অবাক হলাম। এখনও ব্যালকনির হেলানো চেয়ারে চুপচাপ বসে অছেন। সুদূর প্রসারী দৃষ্টি মেলে যেন তন্ময় হ'য়ে আছেন আপনাতে।

আমাকে দেখে কিছুটা ন'ড়ে চ'ড়ে বসলেন। সামনের খালি চেয়ার দেখিয়ে বসতে বললেন ইঙ্গিতে।

অতি ভদ্র বিনয় গুটেনবার্গের। স্বচ্ছ হেসে প্রশ্ন করলেন: আল্প্স আপনার ভালো লাগলো?

হেসে বললাম: অপূর্ব।

ঘাড় নুইয়ে কিছুটা মাথা নেড়ে বলেন: এই জায়গাটা আমারও বেশ লাগে। প্রতি বছর আসি এখানে। বরফ পড়বার আগেই ফিরে যাই। আল্প্স ভালো লাগলো শুনে খুশী হলাম। আপনার এখানে আসা সার্থক। আপনার বোধ হয় ফোটো বাই নেই।

বললাম: বিশেষ নয়!

স্মিত হাসি ঠোঁটের কোণে ভেঙে পড়ে। ধীরে সহজ স্বরে বলেন: আপনি দেখছি আমার মত। আমার মনে হয় ফোটো তোলবার জন্যে এখানে যারা বেশী ব্যস্ত থাকেন, আল্প্সের আসল সৌন্দর্য থেকে তারা বঞ্চিত হন। আল্প্স হৃদয় দিয়ে উপভোগ করবার। নীরবে তার

ছবি আঁকতে হয় মনে মনে। লাইকা ক্যামেরার অন্ধকার ঘরে আল্‌প্‌সের সৌন্দর্য কিছুটা চুরি করে নিয়ে যাওয়া যায়, তবে সে নিতান্তই প্রাণহীন। তাজা মাছের যে স্বাদ, চালানি টিনের মাছে সে পরিতৃপ্তি নেই।

গুটেনবার্গের কথাবার্ত্তা আমার ভালো লাগে। যথেষ্ট সরলতা আছে কথাতে। দৃষ্টিভঙ্গিতে একটি চরিত্র আছে। কিন্তু স্টেলার কথায় এই লোকটির ভিতরের মানুষের যে সন্ধান পেয়েছি, তাতে আমার লোকটির সম্পর্কে মোটেই শ্রদ্ধা আসে না। বরং ভদ্রলোকের সব কথার পেছনে একটি হীন মতলবের আভাসই আমাকে সজাগ করে দেয়।

ভদ্রতার খাতিরে ভদ্রতার অভিনয় মেনে নিতে হয়। কিন্তু নাটকের নিশ্চয়ই শেষ আছে। অভিনয় শেষ হবে নিশ্চয়ই। রঙচঙ আমাকে তুলতেই হবে। প্রকাশ করতে হবে নিজেকে। অভিনয়ের সংলাপ ভুলে নিজের আসল চরিত্রটি নিয়ে যখন আমার সঙ্গে মোলাকাতের জন্যে নেমে আসতে হবে, তখনই বা কেমন দেখাবে এনাকে ?

গল্পে কিছুটা সময় গেল। গুটেনবার্গ বক্তা, আমি শ্রোতা। কিন্তু এত কিছুর মধ্যে স্টেলার কোনও কথাই ওঠেনি। তার প্রসঙ্গ আমি যদি বা তুলেছি, গুটেনবার্গ এড়িয়ে গেছেন বেমালুম।

গুটেনবার্গ উঠে দাঁড়ালেন। লাউঞ্জ পর্যন্ত এলেন আমার সঙ্গে। ঘরে গেলেন। আমি ফিরে আসি আমার কামরায়।

শরীর আমার যে পরিমাণ ক্লান্ত, মন তার চেয়ে কম অশান্ত নয়। আমার সমস্ত চিন্তা, সব ভাবনা যেন হারিয়ে গেছে নিঃশেষ হ'য়ে। মনের দুকূল ছাপিয়ে সব চিন্তাকে আচ্ছন্ন করে একই কল্লোল উৎসারিত হতে থাকে। স্টেলা আর স্টেলা।

পোষাক বদল্ ক'রে ঘর থেকে লাউঞ্জে যখন আসি তখন সন্ধ্যে পার হ'য়ে গেছে। হোটেলের সে এক ভিন্ন রূপ। নাচের উঠোন

জমজমাট। লঘু সঙ্গীতের সঙ্গে তাল রেখে জোড়ায় জোড়ায় নারী পুরুষের নৃত্যছন্দ সারা পরিবেশ হালকা ক'রে তুলেছে।

কোণের একটি টেবিল দখল ক'রে ব'সে আছেন গুটেনবার্গ। অতি সুন্দর পোষাক প'রেছে স্টেলা। দুজনে ব'সে আছেন চুপচাপ। স্ফটিকের পূর্ণ পাত্রাধার টেবিলে রাখা। ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে যাই আমি।

গুটেনবার্গ বলেন: আপনার এত দেরী কেন? আপনার জন্যে চেয়ার দখল ক'রে রেখেছি আগে থেকেই। বসুন বিয়ার দিতে বলি আপনাকে।

বিনা বাক্যব্যয়ে আসন দখল করি। বিয়ার আসে। স্টেলাকে সঙ্গে নিয়ে গুটেনবার্গ উঠে দাঁড়ালেন। স্টেলার ক্ষীনকটি আর কাঁধ বেষ্টন ক'রে নাচের উঠোনের মধ্যে নরম গতিছন্দে ভেসে যান তারপর।

আমার প্রায় মুখোমুখি ব'সে ছিলেন এক সুন্দরী। তার অর্থপূর্ণ বিলোল কটাক্ষ আমার নজরে এসেছে। ভেবেছিলেন, আহ্বান আসবে আমার তরফ থেকে। কিন্তু আমি আমাতে একান্ত মগ্ন। অল্পক্ষণ অপেক্ষায় থেকে যেন খুব একটা প্রয়োজনে চ'লে গেলেন অপর প্রান্তে।

গুটেনবার্গ ফিরে এলেন। স্টেলা আমার পাশে এসে বসে। তিন পাত্র 'কনিয়াক' এলো।

স্টেলা বলে: নাচের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কেমন? অন্যের নাচে ব্যাঘাত না ঘটালেই চ'লবে।

গুটেনবার্গ হেসে বললেন: ভারতীয় নাচের কথা আমি শুনেছি। দেখেছি কয়েকটি। তবে এ ধরণের নাচের সহজ প্রচলন নেই বোধ হয় আপনাদের দেশে।

জবাব দিলাম না। পাত্রটি হাতে তুলে নিলাম।

গুটেনবার্গ ছোট্ট ক'রে তাকিয়ে বললেন: আপনি একটি বিশেষ কিছু ভাবছেন মনে হচ্ছে?

মাথা ঝেঁকে বলি: ভাবছি! কই কিছু না তো।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াই। স্টেলা যেন আমার অপেক্ষাতেই ছিল। নাচের উঠোনের দিকে এগিয়ে যাই।

স্টেলা বলে ঃ কে বলে তুমি এসব জান না। 'শ্লো ফক্সট্রট্' তোমার চমৎকার জানা আছে তো।

জবাবে কি যেন বলতে যাচ্ছিলাম। আমাকে থামিয়ে দিয়ে স্টেলা বলে ঃ চুপ কর। আরও কাছে টেনে নাওনা তুমি আমাকে।

ঘুরতে ঘুরতে, পাক খেতে খেতে অপর প্রান্তে এসে প'ড়েছিলাম। যন্ত্রসঙ্গীত থেমে গেল। দেহ বিযুক্ত ক'রে একহাতে আমাকে টানতে টানতে স্টেলা নিয়ে গেল একদিকে। সেখানে আরও ত্বু'পাত্র ব্রাণ্ডি। কয়েকপাত্র 'শ্লাপস্'।

কোন্ ফাঁকে সঙ্গীতের কোন্ মূর্ছনা ধ'রে আবার নাচের মধ্যে হারিয়ে গেছি, খেয়াল ছিল না। স্টেলার চোখ হুটিতে নিদারুণ এক আবেশ। আমার প্রাণমন বিভ্রান্ত।

হঠাৎ খেয়াল হ'লো আমি ঠিক নেই। পা হুটির ওপর কোন অধিকারই নেই আমার। পা থেকে মাথা পর্যন্ত একটি বিহ্যুৎ প্রবাহ খেলে গেল সঙ্গে সঙ্গে। স্টেলাকে বলি ঃ আর নয়। আমার মাথাটা যেন কেমন করছে। আমি ঘরে যাবো।

স্টেলা বলে ঃ আমার শরীরটাও কেমন যেন করছে। বড় বেশী উল্টোপাল্টা গেলা হ'য়েছে। চল ফেরা যাক।

গুটেনবার্গ চেয়ার আঁকড়ে বসে আছেন তখনও। একটি সিগারেট বাড়িয়ে ধরলেন আমার দিকে। ধন্যবাদের সঙ্গে সেটি গ্রহণ ক'রে বলি ঃ 'শ্লাপস্' আমাকে কাতর করেছে। আমাকে মাপ করবেন। আমি চললাম।

স্টেলার উদ্‌ভ্রান্ত প্রশ্ন ঃ ডিনার ?

জবাব দিলাম ঃ ডিনার আমার ভালো লাগবে না।

বাঁকা হাসির টুকরো গুটেন বার্গের ঠোঁটে।

হাত পা ছড়িয়ে বিছানায় প'ড়ে রইলাম অনেকক্ষণ। মনে হ'লো বিছানাটা আমাকে নিয়ে মহাশূন্যে সামনে পেছনে, ওপরে নীচে দ্রুত আবর্ত্তিত হচ্ছে। এক সখের নাগর দোলা। ঘৃণায় ভ'রে উঠলো প্রাণমন। বেশ বুঝলাম, আমি আর আমাতে নেই। লোকে মাতাল হয় আর কেমন ক'রে ?

সুন্দর বিছানাও কেমন অসম্ভব হ'য়ে উঠলো। দরজা খুলে ঘর থেকে বেরিয়ে আসি। ব্যালকনিতে এসে দাঁড়াই। হিমেল বাতাস সারা মাথাটাকে নাড়া দিয়ে গেল।

হেলানো চেয়ারে অনেকে ঠিক তেমনি প'ড়ে আছেন মড়ার মত। স্তিমিত আলোতে হঠাৎ নজর পড়লো গুটেনবার্গ ব'সে আছেন তার সেই জায়গাতেই। স্টেলার মুখটাও এখান থেকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। কেমন যেন ভয় হ'লো। অপ্রস্তুতের এক শেষ হবো শেষে ? পালিয়ে এলাম বারান্দা থেকে। এক রকম টলতে টলতে ঘরে এসে ঢুকলাম।

কতক্ষণ এভাবে ছিলাম জানি না। হঠাৎ খেয়াল হলো মাথার যন্ত্রণা আর অবসাদ এবার নীচে নামছে। প্রচণ্ড ক্ষিদে পেয়েছে।

এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব না ক'রে উঠে দাঁড়ালাম। সোজা চ'ললাম লাউঞ্জের দিকে।

করিডর নির্জন। নরম আলো। কিছুটা সাদাটে আলো। সারা চত্বরে কোনও প্রাণীর চিহ্ন নেই। রাত অনেক। একজনকে শুধু নজর পড়লো। কাউন্টারে ব'সে কি সব কাগজ পত্তর নাড়াচাড়া করছেন। একপাত্র বিয়ার রাখা আছে সামনে। পরিপূর্ণ মগের ফেনা নাড়া খাচ্ছে। বুদবুদ ছুটে আসছে মগের তলা থেকে।

আমার করুণ প্রশ্ন ঃ কিছু খাবার পাওয়া যাবে ?

অবাক হ'য়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন ভদ্রলোক। মাথা নেড়ে বললেন ঃ না।

কিন্তু আমার তখন কিছু একটা চাই। আবার প্রশ্ন করলাম, রুটি মাখন হলেও চ'লবে।

ভদ্রলোক নিরুপায়। ছ'পাশে মাথা তুলিয়ে বলেন : মদ আছে। বিয়ায় পাওয়া যাবে। অন্য কোনও কিছু পাওয়া যাবে না এসময়ে।

মনে হ'লো ভদ্রলোক যেন আমাকে উপহাস করলেন। মাথা নত ক'রে ফিরে চলি। মুখটা তেতো তেতো লাগছে।

আমাকে দাঁড়াতে হ'লো। স্টেলা আসছে উল্টোদিক থেকে। ব্যালকনি থেকে ক্লান্ত চরণে নিজের ঘরে চ'লেছে। কৌতূহলের হাসি ভেঙ্গে পড়ে চোখে মুখে।

কিছুটা জোরে পা চালিয়ে কাছে এলো। বললে : কোথায় কোথায় ঘুরছো তুমি? আমি ছিলাম ব্যালকনিতে। আমার ঘরের দিকে গিয়েছিলে বুঝি? উনি এখনও আছেন ওখানে। শরীর তোমার ভাল আছে এখন?

ম্লান হেসে বলি : ভালো। শরীর আমার ভালোই আছে স্টেলা।

স্টেলা আমার সঙ্গে আসছিল। দরজার কাছে এসে দাঁড়াই। ঘুরে দাঁড়িয়ে বলি : অনেক রাত! আমার ঘুম আসছে। এত রাত্রে এখানে তোমার আসা ঠিক নয়। অপরের মনে অন্য কথা আসবে। তুমি তোমার ঘরে যাও।

আমাকে ভ্রূক্ষেপেই আনলে না স্টেলা। আমার সঙ্গে পা চালিয়ে ঘরে এলো। বললে : আমি কচি খুকী নই! ভালোমন্দের বিচার আমার আছে। তোমার উদ্বেগের কারণ নেই। ঘুমের কথা বলছো তুমি? ঘুম তোমার আছে, আমার নেই?

অগোছালো বিছানার চাদর স্টেলা ঠিক করলে। দলা পাকানো বালিশ যথাস্থানে রাখলে। লেপটা মেঝে থেকে তুলে নিয়ে আমার মুখের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে দেখলে, তারপর বিছানাতে ঢেকে দিল।

কিছুটা শাসনের ভঙ্গিতে বলেঃ শুয়ে পড়! একটা কথা নয়। প্রেমে প'ড়ে শরীর নষ্ট করো না।

আমি বলি ঃ একটু বসো না।

স্টেলা হেসে ফেলে। আমার মাথার চুলগুলো নাড়া দিয়ে বলে ঃ শিশুর মতো করো না। তুমি ঘুমোও, আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়। আমি যাই।

স্টেলা দরজার দিকে এগিয়ে গেল। মধুর এক দেহভঙ্গিতে ঘুরে দাঁড়ালো। স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। তার পর কি ভেবে এগিয়ে এলো ধীরে। বোতাম টিপে টেবিলে রাখা বাতিটি নিভিয়ে দিল। অন্ধকার নেমে এলো সারা ঘরে।

মুহূর্তে স্টেলা যেন বদলে গেল। কিসে যেন পেয়ে বসলো তাকে। শিশুর মত আমার দেহে অস্থির হ'য়ে ভেঙে পড়ে। নিবিড় আলিঙ্গনে দেহ যেন উদভ্রান্ত হ'য়ে গেল।

আমার জানু আকর্ষণ ক'রে বলে ঃ তোমার উরুদুটো কি সুন্দর, আর বলিষ্ঠ। কিন্তু একেবারে অনভ্যস্ত, আনাড়ী।

এলোমেলো হ'য়ে স্টেলার মাথার চুল আমার বুকে মুখে এসে পড়েছে। উষ্ণ নিঃশ্বাসের সঙ্গে তার নরম বুকটা উঠছে, পড়ছে। নিটোল উরুদুটো কেমন যেন উশখুশ করছে। মুখে ব'লে চলেছে সে একটানা ঃ আমার মুখটা তোমার বুকে রাখতে দাও না। রাখতে দাও না অনেকক্ষণ। অনেকক্ষণ রাখতে দাও না!

আরও কিছুক্ষণ। মুখে ও গালে আঙুল বুলিয়ে স্টেলা আদর জানাল। ঠোঁটে, ঘাড়ে, বুকে কপালে অবিশ্রান্ত চুম্বনে আমাকে পাগল ক'রে তোলে।

সপ্তমে বাঁধা হ'য়ে গেছি আমিও। সারা শরীর অস্থির। চিত্ত আত্মহারা।

সেই মুহূর্তেই কেমন যেন বেসুরো হ'য়ে গেল সব। গাঁথা মালা যেন ছড়িয়ে পড়লো চারদিকে। ছিঁড়ে গেল যেন সেতারের মিঠে তার।

হঠাৎ নিষ্ঠুর এক বিকর্ষণ। ছিটকে স'রে গেল স্টেলা। উঠে বসলো। স'রে বসলো কিছুটা। তারপর দ্রুত পদক্ষেপে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

আমি সম্পূর্ণ বিমূঢ়, বিভ্রান্ত হতবাক।

দিশেহারা একটি একক সুর যেন আমার রক্তধারায় সম্পূর্ণ আত্মহারা।

প্রবল এক উত্তেজনার মধ্যে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। স্বপ্ন দেখছিলাম। বিক্ষিপ্ত টুকরো টুকরো বীভৎস সব দৃশ্য। পাহাড়ের গায়ে বাড়ি খেয়ে বিমানের পাখাতে আগুন লেগে গেছে। দাউ দাউ ক'রে জ্বলতে জ্বলতে প্রচণ্ড বেগে মাটিতে আছড়ে এসে পড়ছে। প্রাণভয়ে ভীত যাত্রীদের সঙ্গে আমিও মুক্তির জন্যে চীৎকার ক'রে উঠছি। পর মুহূর্তেই দেখলাম গোখরো সাপ আমার মাকে তাড়া করছে। ভয়াবহ ফণা তুলে প্রচণ্ড রোষে সে দু'পাশে মাথা হেলিয়ে ক্ষিপ্রতার সঙ্গে ছুটে আসছে। চেরা জিভটা বিদ্যুৎ বেগে বেরিয়ে আসছে মাঝে মাঝে। প্রাণভয়ে চীৎকার করে মা আমাকে ডাকছেন, কিন্তু আমি শুনতে পাচ্ছি না। আমি ঘুমোচ্ছি। আবার দেখলাম, তুষারের মধ্যে পথ হারিয়ে ফেলেছি। প্রকাণ্ড এক দানব চওড়া পা ফেলে এগিয়ে আসছে আমার দিকে। সামনে প্রচণ্ড খাদ। পায়ের নীচে বরফের চাঙ ভাঙছে।

একটার পর একটা।

মাথাটা প্রচণ্ড ভারী। যন্ত্রনায় ছিঁড়ে প'ড়ে যাচ্ছে। সারা দেহ কাতর। আর মন? মন নেই।

উঠে ব'সে ঠাণ্ডা জল পান করলাম আকণ্ঠ। ভিজে হাতটা কপালে বুলিয়ে নিলাম। বদ্ধঘরে দম যেন আটকে আসছে। কিছুটা মুক্ত হাওয়া, ঠাণ্ডা বাতাস দরকার। দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে পড়ি।

রাত্রি শেষ হ'য়ে এসেছে। জমাট অন্ধকার ফিকে হ'য়ে এসেছে। ব্যালকনি জনশূন্য। আল্লস্ অস্পষ্ট—ধূসর।

একটি চেয়ারের ওপর প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাচ্ছিলাম। সামলে নিয়ে বাঁ দিকে এগিয়ে এলাম। নিজের চোখকেই যেন বিশ্বাস করতে পারি না। এখনও আমি স্বপ্ন দেখছি নাকি?

গুটেনবার্গ তার চেয়ারে ব'সে আছেন। শূন্য দৃষ্টি। নীরব পাথরের মত ব'সে আছেন।

আমার পায়ের শব্দ পেয়ে ধীরে ঘুরে তাকালেন। সামনের হেলানো চেয়ার দেখিয়ে বসতে ইঙ্গিত করলেন। বললেন ঃ এত প্রত্যুষে আপনি বিছানা ছেড়েছেন। রাত্রে ঘুম হয়নি আপনার ?

মাথাটা আমার ছিঁড়ে পড়ে যাচ্ছিল। তবু সংযত জবাব দিতে চেষ্টা করি। বললাম ঃ ঘুম আমার ভালোই হয়েছে রাত্রে। আপনি কতক্ষণ ?

গুটেনবার্গ বলেন ঃ অল্পক্ষণ এসেছি এখানে। প্রত্যূষে আল্প্সের এক সৌন্দর্য আছে।

বললাম ঃ নিশ্চয়ই।

প্রশ্নের ঢঙে মাথা হেলিয়ে গুটেনবার্গ বললেন ঃ আপনার এই রকম মনে হয় ?

জবাব দিলাম ঃ একেবারেই।

থামলেন না গুটেনবার্গ। সামান্য হেসে বললেন ঃ আপনি মহৎ। আপনি যুবক। ভালোটুকু আপনার চোখে পড়ে। আল্প্স-এ আপনি স্বর্গীয় এক শুচিতা দেখছেন। বিন্দুমাত্র কলুষ আপনার চোখে পড়েনি, না ?

নির্লিপ্ত জবাব আমার ঃ একদম না।

বলে চললেন গুটেনবার্গ ঃ আল্প্স-এর শুভ্রতা আপনাকে নাড়া দিয়েছে। দেবেই। কিন্তু সে শুভ্রতা মধ্যে কোন দাগ দেখেছেন আপনি ? কোনও দাগ ?

একটা যেন নাড়া খেলাম সারা দেহে। কিছুটা বিস্মিত কণ্ঠে বললাম ঃ কই, না।

গুটেনবার্গের কথা যেন থামবে না। কৌতূহলের যেন শেষ নেই তাঁর। বললেন ঃ সাদা বরফের ওপর রক্ত দেখেছেন কখনও ? হিমশীতল তুষারের মধ্যে রক্ত আপনার চোখে পড়েনি ?

অস্থির হ'য়ে পড়ি। যেন কিছুটা জোরেই বললাম : না। হয়তো সে দৃশ্য আমার কিছুমাত্র ভালো লাগবে না। এ সব প্রশ্ন আপনি আমাকে কেন করছেন ?

গুটেনবার্গ ছোট্ট ক'রে তাকালেন। ধীরে টিপে টিপে বললেন : আপনার শোনা দরকার। আপনার শোনার সময় হয়েছে। সাদা বরফের ওপর রক্তের দাগ আপনার ভালো লাগে না। সে দৃশ্য আপনি দেখতে চান না। আপনার অনুভূতি আছে। আপনার প্রতি আমি শ্রদ্ধাশীল। কিন্তু পৃথিবী আপনার আমার ইচ্ছে মত চলে না। তাই নিয়মের মধ্যে অনিয়ম দেখা দেয়।

আমার মুখের দিকে কয়েক মুহূর্ত একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন। তারপর আবার সুরু করলেন : আপনি দেখেননি, না? কিন্তু আমি দেখেছি। সাদা বরফের গায়ে রক্ত জমে যেতে আমি দেখেছি।

গত বছর এমনই একদিন, এ ঘটনা ঘটেছিল। নীচে বরফের মধ্যে বহুলোক তখন 'স্কি' করছিল। নরম রৌদ্রে সারা দিক দিগন্ত উদ্ভাসিত। প্রতিফলিত সূর্যের আলো জমাট সাদা বরফে এক স্বর্গীয় লুকোচুরি সুরু করেছে তখন।

হঠাৎ এক বেয়াড়া বাতাসে সব কিছু এলোমেলো ক'রে দিল। কোথা দিয়ে কি যেন ঘটে গেল। সোরগোল উঠলো নীচে থেকে। একই দিকে সবাই ছুটে যাচ্ছে যেন কি দেখে।

আমি যখন পৌঁছোলাম তখন সব শেষ। গিশেলা মুলারের রক্ত সিঞ্চিত দেহ দেখে শিউরে উঠলাম। সে রক্তাক্ষরণে কঠিন সাদা বরফও যেন কাঁদছে। একটা বলিষ্ঠ দেহ মাথা নত ক'রে সামনে দাঁড়িয়ে আছে। পিটারের ঠাণ্ডা হাতটি হাতে নিয়ে সামান্য চাপ দিলাম। অব্যক্ত এক কান্না যেন হা হা ক'রে উঠলো সারা চরাচরে।

গুটেনবার্গ কয়েক মুহূর্ত থামলেন। আপন মনে ব'লে চলেন :

আকস্মিক এই দুর্ঘটনায়, সারা হোটেলকে সেদিন বোবায় পেয়েছিল। কিন্তু আমি জানি, আমি জানি সব! আকস্মিক দুর্ঘটনা এ নয়। দুরন্ত এক অঘটনে একটি সুন্দর জীবন সেদিন ফুরিয়ে যায়নি। অনিবার্য এক অদৃষ্টের লিখনে লেখা ছিল না গিশেলা মুলারের অপমৃত্যু। নিপুণ হাতের ভয়ঙ্কর এক চক্রান্তের নিষ্ঠুর শিকার এই গিশেলা মুলার। হতভাগ্য পিটারকে সেদিন বোধহয় দানবে পেয়েছিল। সহজ উপায়ে, সামান্য কৌশলে এই মর্মান্তিক অঘটনটি ঘটানো গেছে সেদিন অতি সহজেই।

আমার মাথার শিরাগুলো যেন ফুলে ফুলে উঠছে। প্রচণ্ড এক ভার যেন আবেষ্টন ক'রে আছে দৃঢ়ভাবে। প্রশ্ন করি: এ রকম হলো কেন? গিশেলা মুলার কে? পিটারেরই বা কি পরিচয়?

গুটেনবার্গ ম্লান হাসলেন। একটি হাতে আমার জানু স্পর্শ ক'রে বলেন: বলবো! সব বলবো আপনাকে।

ওরা ছিল স্বামী-স্ত্রী। পিটার ছিল ডাক্তার। উঁচু ঘরের ছেলে সে। সুন্দর জীবন। বিয়ের পর গিশেলা যখন নিজের ঘর গুছোনোতে ব্যস্ত, বহু সুখ স্বপ্নের নেশায় তার প্রাণমন যখন ভরপুর, এমন সময় এক সুন্দরীর সঙ্গে পরিচয় হলো পিটারের।

প্রচণ্ড জোয়ারের মুখে তৃণখণ্ড যেমন উধাও হ'য়ে যায়, ঠিক তেমনই যৌবনের তাড়নায় সেই নারীকে আশ্রয় ক'রে ভেসে গেল পিটার। নম্র ভীরু স্বভাবের মেয়ে গিশেলাকে ফেলে সেই সুন্দরীর পেছনে পিটার চললো উন্মাদের মত।

সুন্দরীর শুধু যৌবন ছিল না। উদগ্র কামনার ঝাঁঝালো এক আরক ছিল সে যৌবনে।

কিন্তু শেষটায় বাদ সাধে গিশেলা। চূড়ান্ত বোঝাপড়ার সময়ে আমি অবশ্য উপস্থিত ছিলাম না। কিন্তু তার স্বাক্ষর আজও আল্পসের সাদা বরফের গায়ে লেখা অছে।

আমাকে যেন এক দুঃস্বপ্নে পেয়ে বসেছে। উদভ্রান্তের মত প্রশ্ন করি : তারপর।

তাচ্ছিল্যের হাসি গুটেনবার্গের। বলেন : তারপর! তারপর পিটার চ'লে গেল। চোরের মত, কাপুরুষের মত,—আল্প্স ছেড়ে চ'লে গেল। ...তার সন্ধান আমি জানি না।

আমার ঠোঁটে কৌতূহলের প্রশ্ন। জিজ্ঞাসা করি : সেই নারী? পিটারের সঙ্গে সেই সুন্দরী নিশ্চয়ই সঙ্গে গেলেন!

ক্ষিপ্রতার সঙ্গে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালেন গুটেনবার্গ। হঠাৎ যেন দু'চোখে আগুন জ্বলে উঠলো। মুহূর্তকাল পর আবার সুরু করলেন। গলার স্বর গম্ভীর। বললেন : নাটকে তাই বলে। শেষ দৃশ্যটি ওভাবে সমাপ্ত হ'লে মন্দ হ'তো না। কিন্তু বাস্তবে সে দৃশ্য ভিন্ন রূপ। পটভূমি বদলালো অন্য কায়দায়।

পিটার একা আল্প্স ছেড়ে চলে যায়। সর্বস্বান্ত, রিক্ত পিটারকে ক'দিন পরই সে সুন্দরী পথের ধূলোতে নিক্ষেপ করলো। পিটারের সুন্দর যৌবন·যখন তার সব কৌতূহল মিটিয়ে দিল, পিটারকে আর সেদিন প্রয়োজনই রইলো না সুন্দরীর।

পিটার বলেছিল : কিন্তু প্রেম? আমি তো তোমাকে ভালবাসি সুন্দরী। সুন্দরীর সে কি অদ্ভুত হাসি। চোখে মুখে কৃত্রিম রোষ ছিটিয়ে আদেশের সুরে বলেছিল : এই মুহূর্তে তুমি চলে যাও। তুমি নীচ, হীন। নেকড়ের রক্ত আছে তোমার দেহে।

পিটার চোরের মত পালিয়ে যায়। শুধু আল্প্স ছেড়ে নয়, দেশ ছেড়েই। হামবুর্গে আমার এক কর্মচারীর মুখে শুনেছিলাম, পিটারকে সে প্যারীতে দেখেছে। সব ছেড়েছে পিটার। হাসপাতাল ছেড়েছে। ডাক্তারী গেছে ভুলে। পথে নেমে গেছে একদম। সর্বনেশে নেশা ধরেছে। দিবারাত্রি 'আবসাঁৎ' গিলছে। আর বমি করছে রাস্তাতেই।

গুটেনবার্গ থামলেন। চুপ ক'রে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর চোখতুলে তাকান আমার দিকে। বললেন : এ রকম অনেক, বহু সুন্দর

জীবন নষ্ট করেছে এই নারী। পিটার আর গিশেলার কাহিনী সবচেয়ে মর্মান্তিক।

একটু চুপচাপ। হঠাৎ প্রবল বেগে মাথা নেড়ে বললেনঃ নারী সাধারণতঃ পুরুষের মত নিষ্ঠুর হয় না। কিন্তু বিকৃত ক্ষুধার পেছনে সে যখন ছোটে হন্যে হ'য়ে সে তখন আর নারী থাকে না। সে হয় রাক্ষসী।

অন্ধকারের অবগুণ্ঠন থেকে শুভ প্রাতঃকাল তখন দিগন্তে উদ্ভাসিত। হিমেল বাতাসেও আমার মাথার আগুন তখনও কিছুমাত্র কমেনি। কপালের দুইপ্রান্ত একটানা দপ্‌দপ্‌ করছে।

গুটেনবার্গ কেমন যেন তখনও অস্থির। কিছুটা নীচু পর্দাতে, খানিকটা কাছে ঘেঁষে সংযত গম্ভীর কণ্ঠে বলেনঃ যাও, সাদা বরফের ওপর রক্তের দাগ দেখে এসো। নিজের জীবনকে এভাবে নির্মূল ক'রো না। এদেশে এসেছো যে কাজে, সেটি সমাধা ক'রে নিজের দেশে আপনার লোকের মধ্যে ফিরে যাও। তোমার মতন মানুষের এ কি বিভ্রান্তি। দু'দিনেই তোমার চেহারার হাল কি হয়েছে দেখছো? মরীচিকার পেছনে ছুটে প্রচুর সম্ভাবনা-ভরা জীবনকে এভাবে শ্রীহীন ক'রো না হের জেন।

টঙ্কার দিয়ে ওঠে আমার শিরায়। বিধ্বস্ত মাথাটা যেন প্রচণ্ড একটা আঘাতে বিবশ হ'য়ে আসে। চূড়ান্ত বিস্ময়োক্তি ঝরে পড়ে ঠোঁট থেকেঃ আপনি কি স্টেলার কথা বলছেন?

গুটেনবার্গের অসহিষ্ণু জবাবঃ তবে আর অন্য কার কথা ব'লতে ব'সেছি তোমাকে?

আমার যেন দেহ নেই। নেই মন। দুঃসহ ক্লান্তিতে দু'হাতের মাঝখানে ভেঙে পড়ে আমার মাথাটা। গুটেনবার্গের লোমশ হাতটা খসে পড়ে আমার জানু থেকে।

তবু প্রতিবাদের সুরে বলিঃ মিথ্যে, এ সব মিথ্যে। আপনি নিষ্ঠুর। আপনি শয়তান। সাজানো কথার আশ্রয় নিয়ে আপনি আমাকে

বিভ্রান্ত করবেন! স্টেলার জীবন তছনছ করেছেন আপনি নিজে। আপনি মানুষ নন।

গুটেনবার্গের চোখদুটি জ্বল জ্বল ক'রে উঠলো মুহূর্তে। তামাটে বিবর্ণ ঠোঁট দুটি এঁটে এলো দুরন্ত এক প্রস্তুতিতে। প্রসারিত হাত বাড়িয়ে বলেন: আল্পস্ কখনও মিথ্যে কথা বলবে না। বরফের ওপর দেখে এসো গিয়ে গিশেলার রক্ত। যাও!

উন্মাদের মত টলতে টলতে ব্যালকনি ছেড়ে চ'লে আসি। সত্যিমিথ্যে আজ আমাকে কে ব'লে দেবে? কি গভীর ষড়যন্ত্র! পাগলের মত হোটেল থেকে নেমে আসি।

বরফ আর বরফ! তুষারের পর তুষারস্তূপ ভেঙ্গে চলেছি আমি। সামনে আল্পস্। বাধামুক্ত পথ। তবু মন অনন্ত কারাগারে।

মৌন আল্পস্। পৃথিবী নির্বাক। আমি অশান্ত। গিশেলার রক্তের দাগ খুঁজে চলেছি আমি তখন পাতি পাতি করে।

কিন্তু কই! কোথাও তো তার হদিশ নেই। শুভ্র তুষার রাশির ওপর দাঁড়িয়ে আমি নিজেই শুধু নিজেকে রক্তাক্ত করছি।

হঠাৎ ধরিত্রীর নীরবতা খান খান ক'রে ভেঙ্গে দিয়ে একটি কাতর আর্ত্তনাদ যেন ফেটে পড়লো। তুষার ভেজা একটি পাখীর তীব্র আর্ত্তস্বরে যেন শুনতে পেলাম: গিশেলা···আ···আ···!

কোন্ পথে? আমি সে হারানো পথ খুঁজে পাবো কোথায়? হয়তো এখানে নয়! অন্যকোথা। অন্য কোনোখানে।

কি দেখে হঠাৎ থমকে দাঁড়াতে হ'লো। সাদা তুষারের ওপর খানিকটা কালো দাগ। উদ্‌ভ্রান্তের মত এগিয়ে গেলাম।

দেখি, আর একটা ঐ পাখি। শুকনো বিবর্ণ মরা পাখি।

একটা দুঃসহ বেদনা নিয়ে হোটেলে ফিরে আসি। শুধু একটা কথা বার বার আমার মনকে তোলপাড় করে, স্টেলার কি তবে সবটাই

মিথ্যে? নাকি সাজানো বানানো কথায় নিষ্ঠুর গুটেনবার্গ আমাকে বিভ্রান্ত ক'রেছে? দেখি, তখনও ব্যালকনিতে ব'সে আছেন গুটেনবার্গ। কিসে যেন পেয়ে বসল আমাকে। এক রকম দৌড়ে এসে তার মুখোমুখি দাঁড়াই।

নীরব গুটেনবার্গ। সেই ছোট্ট ক'রে তাকানো। চেয়ার দেখিয়ে ইঙ্গিতে বসতে বলা।

সোজা প্রশ্ন করি: স্টেলাকে আপনি কেন তাহু'লে বরদাস্ত করছেন? কেন আপনি মেনে নিয়েছেন স্টেলাকে? ডাইনীর রক্ত যে নারীর দেহে তাকে স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করেছেন কেন?

কিছুমাত্র বিকার নেই। সেই তাকানো। ঠোঁটের হাসি। সেই ইঙ্গিতে আমাকে বসতে বলা।

আমার উদ্‌ভ্রান্ত কণ্ঠ: সব মিথ্যে! সব মিথ্যে! সবটাই আপনার ষড়যন্ত্র।

আমি বিভ্রান্ত। বিপর্যস্ত। মুখোমুখি বসে গুটেনবার্গ তখনও নীরব। স্থির, সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত।

কয়েক মুহূর্ত পর মুখ তুললেন গুটেনবার্গ। ভাবলেশহীন চাউনী মেলে চুপচাপ তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর সুরু করলেন: তোমার অবস্থা দেখে আমার দুঃখ হয়। এত অল্প সময়ের মধ্যে স্টেলাকে তুমি এতটা ভালবেসে ফেলবে ভাবতে পারিনি। তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি বাধ্য নই; কিন্তু তোমাকে আমি বলবো। সব প্রশ্নের উত্তর আমি দেব। বিশ্বাস কর, আমি তোমাকে পছন্দ করি। আমি শ্রদ্ধা করি, বিশ্বাস করি তোমাকে।

দু'পাশে দৃষ্টি বুলিয়ে নিলেন একবার। ম্লান এক টুকরো হাসলেন। বললেন: আমার সব কথা তোমাকে আমি বলবো। আমার নিজের কথা গোড়া থেকে ব'লতে হবে তোমাকে। আমাদের কিছু পেছনে হাঁটতে হবে।

চাকরীর খাতিরে আমি তখন ডুসেলডর্ফে। তোমার মত যুবক আমি তখন। ডুসেলডর্ফ আমার মোটেই ভালো লাগে না। সন্ধ্যার হুল্লোড় আমার পছন্দ নয়। তোমার মত আমিও তখন এক এঞ্জিনীয়ার। মনের মত মানুষ সারা শহরে খুঁজে পাইনে। তাছাড়া 'হ্যানোফারে' মানুষ হয়েছি, রুর্ আমার ভাল লাগেনি মোটেই। সামান্য ছুটি পেলে রাইন নদী পেরিয়ে যেতাম বেড়াতে।

হের ব্রাউনের সঙ্গে আমার পরিচয় হয় এই রাইনে। এক দুর্যোগের দিনে আমরা একই মোটরলঞ্চে ডুসেলডর্ফে ফিরছিলাম।

প্রবীন হের ব্রাউন আমাকে সহজেই আকর্ষণ করেন। দীর্ঘ গড়নের ভারী বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা। শুধু ধনী নন, চালচলনে আভিজাত্যের ছাপ সুস্পষ্ট। সামান্য পরিচয়ের সূত্র ধরে আলাপ দাঁড়ালো
।

ভদ্রলোক একা। সুন্দর ফ্ল্যাটে একা থাকেন। একটি প্রশ্ন অবশ্য আমাকে প্রথম থেকেই নাড়া দিয়েছিল, নিজের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে তিনি সামান্য কোনও প্রসঙ্গ আলোচনা করতেন না আমার সঙ্গে।

হামেশাই তাঁর ফ্ল্যাটে আমার আনাগোনা ছিল। ছুটির দিনে ওনার ওখানে লাঞ্চ খেয়েছি। রাত্রে ডিনার শেষে বাড়ি ফিরেছি বহুদিন।

সেদিন এক উৎসবের দিন। সারা শহরে হৈ হুল্লোড় আর আমোদ-আহ্লাদ। রেস্তরাঁ আর হোটেল, অপেরা আর সিনেমা হল গমগম করছে। আতশ বাজিতে সারা ডুসেলডর্ফ আলোকিত।

ঘুরতে ঘুরতে সন্ধ্যের পর হের ব্রাউনের ফ্ল্যাটে এলাম।

আমাকে দেখে হের ব্রাউন একটু অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন। হাবভাবে মনে হ'লো অন্য কারো অপেক্ষায় ছিলেন হয়তো। মুহূর্তের মধ্যে সে ভাবটা অবশ্য কাটিয়ে তুললেন তিনি। বললেনঃ এইমাত্র আমার কাছে একজন আসবেন। তোমাকে আমি কিন্তু বেশীক্ষণ সঙ্গ দিতে পারবো না।

জবাবে বললাম ঃ আদেশ ক'রলে এখুনি চ'লে যেতে পারি।

হের ব্রাউন ঠোঁটে সামান্য হেসে বললেন ঃ এসেছো যখন তখন চলে যাবে কি হে! তবে তোমার ভালোর জন্যেই বলছি। আমি যাঁর অপেক্ষা করছি, তোমার সঙ্গে তাঁর দেখা না হওয়াই মঙ্গল। তোমাকে আমি পরে সব বলবো। আমার কিছু কাজেও তোমাকে লাগতে হবে।

সেই মুহূর্তেই দরজায় করাঘাত হ'লো। অনভ্যস্ত, আনাড়ী আমি এক রকম দৌড়ে পর্দ্দার আড়ালে দাঁড়ালাম। ডান দিকের টেবিলের নীচে আশ্রয় নিলাম।

হের ব্রাউন বলেন ঃ তুমি দেখলে ক্ষতি নেই কিন্তু আগন্তুক যেন তোমাকে না দেখেন।

কেমন যেন ধোঁয়াটে আর গুমোট গুমোট মনে হলো। টেবিলের তলা ছেড়ে আমি বিছানার তলায় ঢুকে পড়ি।

হের ব্রাউন বলেন ঃ ঠিক আছে। বাহাদুর ছেলে তুমি।

তারপর দরজা খোলার শব্দ হ'লো। একজন প্রবেশ করলেন ঘরে। মুহূর্তের মধ্যে বুঝে নিলাম, হের ব্রাউন যাঁকে আশা ক'রেছিলেন আগন্তুক ঠিক সেই ব্যক্তি নন। একটি অপরিচিত গলা। কালো জুতো আর ট্রাউজার্স-এর নিম্নাংশই শুধু আমার নজরে আসছিল।

কথা এক বর্ণও বোঝবার উপায় নেই। একটি বিদেশী দুর্বোধ্য ভাষায় দুজনের কথা চলছিল। ঠিক কথা নয়, দেখলাম দুজনের বচসা সুরু হ'য়ে গেল।

ঠিক এই সময়ই ঘরের রেডিওটি খুব জোরে আওয়াজ করে উঠলো। কেমন যেন সঙ্গতিহীন মনে হ'লো। পর পর দুটি গুলির আওয়াজ হ'লো পর মুহূর্তেই। ভারী দরজাটা বন্ধ হ'য়ে গেল সশব্দে।

একেবারেই বেমক্কা। নিতান্ত অপ্রত্যাশিত। সত্যিই গুলির

আওয়াজ না রেডিও'র শব্দ বা বাইরের অন্য কোনও কিছু ঠিক সমঝে উঠতে পারলাম না। শুধু শীতল স্পর্শ অনুভব করলাম সারাদেহে। রেডিও'তে একটানা ঝঙ্কার চ'লেছে।

নিদারুণ এক বিস্ময়ে, প্রচণ্ড সাহসে বুক বেঁধে খাটের তলা থেকে বেরিয়ে আসি। বিছানায় অর্দ্ধেকটা দেহ, বাকিটা ঝুলছে। রক্তাক্ত হের ব্রাউন। গুলিতে বুক ও পেট বিদীর্ণ হ'য়ে গেছে। দেহে প্রাণ নেই। রেডিও বন্ধ ক'রে দিলাম টলতে টলতে।

কতক্ষণ এভাবে ছিলাম জানি না। হঠাৎ খেয়াল হ'লো কিছুটা রক্ত আমার হাতেও লেগেছে। কোটের হাতায় আর পেটের কাছে রক্তের দাগও লেগেছে অনেকটা। রুমাল দিয়ে মুছে নিলাম রক্তটুকু। চিন্তার কোন খেই খুঁজে পাচ্ছিলাম না। মাথাটা শূন্য। পায়ের সঙ্গে দুরন্ত এক বোঝা।

ফোন করতে গিয়ে শিউরে উঠলাম। রিসিভারটা নামিয়ে রাখলাম সঙ্গে সঙ্গে। দরজা খুলে বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। চারদিক ফাঁকা। শুধু বাঁকের মুখে, সিঁড়িতে ক্ষীণস্বাস্থ্যের এক কিশোর চশমার পুরু কাঁচের মধ্যে দিয়ে আমাকে অনিমেষ নয়নে দেখছিল। পাগলের মত রাস্তায় নেমে এলাম। ফ্ল্যাটের দিকে পা বাড়াই। জীবনে আমার ভুলের সুরু এখান থেকেই।

গুটেনবার্গ থামলেন। আমার চোখে উত্তেজনা। ওঁর দৃষ্টিতে এক রিক্ততা। বলেন ঃ অপ্রাসঙ্গিক লাগছে তোমার ?

মাথা নেড়ে বলি ঃ থামবেন না। আপনি বলুন।

গুটেনবার্গের ঠোঁটে সঙ্কোচের হাসি। বলেন ঃ নিজের ঘরে এসে ব'সে রইলাম চুপচাপ। একটি ফোন বেজে বেজে থেমে গেল। ধরতে সাহস হলো না। আকাশ পাতাল ভাবতে লাগলাম চেয়ারে ব'সে।

রাত তখন অনেক। চেয়ারে ব'সেছিলাম সেই ভাবেই। ভারী জুতোর আওয়াজ পেয়ে সচকিত হলাম। জুতোর আওয়াজ এগিয়ে

এলো। দরজায় ঘা পড়লো তারপর। আঁচড়ানোর মত আওয়াজ। পর মুহূর্তেই এ্যালসেশিয়ানের বুক কাঁপানো ডাক রাত্রির নীরবতাকে ভেঙে খান খান ক'রে দিল।

ভুল আর ভুল। মহাভুল আমাকে তখন আচ্ছন্ন ক'রে ফেলেছে। বাথরুমে প্রথম আশ্রয় নিলাম। কয়েক মুহূর্ত ভাবলাম। আমি নির্দোষ, আমি পালাবো কেন? পর মুহূর্তে আবার ভেবেছি, আমারই বা কি বলবার আছে! নিজেকে আমি রক্ষা করবো কেমন কোরে?

জানালা গলে নেমে পড়লাম কার্নিশে। জলের কলটি খুলে দিয়ে গেলাম। জলের শব্দের সঙ্গে আমার কিছুটা সাড়া রেখে গেলাম।

সে মুহূর্তগুলো ভাবলেও আজ আমার পায়ের তলা শির শির করে। কি ভাবে আমি ফ্ল্যাট ছেড়ে এসেছিলাম আমি জানি না। কি অবস্থায় রাইন নদী পেরিয়ে এসেছিলাম আজ আমার স্মরণে নেই। শুধু একটি ভুল ঢাকতে গিয়ে প্রতি মুহূর্তে একটির পর একটি ভুল ক'রে চ'ললাম।

পরদিন কাগজে হের ব্রাউনের হত্যাকাণ্ডের খবর প্রকাশিত হ'লো। সংবাদে আরও লেখা ছিল, পুলিশ আমাকে তন্ন তন্ন করে খুঁজে বেড়াচ্ছে। আসামী নাকি বহু সূত্র পেছনে রেখে গেছে।

এক কাফেতে বসে এই সংবাদ আমি পাঠ করলাম। তারপর উদ্‌ভ্রান্তের মত ঘুরতে ঘুরতে, বিধ্বস্ত হ'তে হ'তে আমি বার্লিনে আসি।

বার্লিনে এসে ভালোই হ'লো। অদ্ভুত এক যোগাযোগ হ'লো। দেশ ছেড়ে পালানোর এক মওকা পেলাম। সে অনেক কথা, অন্য প্রসঙ্গ। এখানে আজ সে খুব কাজের কথা নয়।

মাস দুই পর আমি লণ্ডনে আসি। শুধু মিথ্যা ও জালিয়াতির আশ্রয় নিয়ে প্রচণ্ড এক প্রতারকের নতুন জীবন স্থরু করি। দেখলাম, ভবিষ্যৎ জীবন আমাকে নতুন ক'রে আবার গড়ে নিতে হবে। স্থরু করতে হবে প্রথম থেকেই।

কিন্তু এদেশেই বা আমার জায়গা কোথায়? আমি খুনী! আমি যে হত্যাকারী! পৃথিবীর কোনও মানুষ আমাকে আশ্রয় দেবে না। কোনও দেশ আমাকে গ্রহণ করবে না। কণামাত্র সদয় হ'বে না কোন বন্ধু।

নিজেকে গুটেনবার্গ ব'লে চালালাম। সর্বত্র জানান দিলাম, নাজীদের নিষ্ঠুর অত্যাচারে আমি লাঞ্ছিত। জর্মনিতে ব্যক্তি স্বাধীনতার সমাধি হ'য়েছে। সত্য গেছে, ধর্ম সেখানে অপ্রস্তুত। মেশিন গান আর 'মাইন কাম্ফ' সমস্ত দেশকে ধ্বংস ক'রতে বসেছে। পৃথিবী কি ঘুমিয়ে আছে? ডেমোক্র্যাট্‌রা গেলেন কোথায়?

এতে কাজ হ'লো। তাছাড়া রাজনৈতিক পলাতকদের আশ্রয়স্থল হিসাবে বৃটেনের সুনাম বহুদিনের। রুশ বিপ্লবের সময় কত রথী মহারথী বৃটেন আর আমেরিকায় পালিয়ে আশ্রয় নেন তার নজীর আমার জানা ছিল। তাছাড়া সেই সময়ই ছিল মরসুম। নাজী অত্যাচারে বহুলোক তখন দেশ ছেড়েছেন। বুদ্ধিজীবীরা তখনও পালিয়ে আসছেন।

পালিয়ে আমি বাঁচলাম। কিন্তু রাজনীতি তো আমার ধাতে নেই। অতি সাধারণ মানুষ আমি। চাহিদা আমার সামান্যই। চুপ-চাপ থাকতে হ'লো। মিথ্যার ভিড়ে আমার প্রকৃত পরিচয় আমি ভুলে গেলাম।

পৃথিবী বিরাট। পৃথিবী ব্যাপক। আমার মত ক্ষুদ্র মানুষের পেছনে সন্দেহ আর কতকাল পিছু নেবে? ব্যবসা সুরু করলাম। আমদানী রপ্তানীর ব্যবসা।

আমি নিজে ছিলাম এঞ্জিনীয়ার। ভাল কাজেই বহাল হবার যোগ্যতা আমার ছিল। কিন্তু সে পরিচয়টুকুও আমি গোপন ক'রে গেলাম। যদি প্রশ্ন ওঠে এঞ্জিনীয়ার কিসের? কোথাকার? তবে যে জ্ঞানটুকু আহরণ করেছি, সেটুকু আমার কাজে লাগাতে দোষ কি?

নতুন দেশে আমি এক নতুন মানুষ। আমার নতুন জীবন সুরু হ'লো।

গুটেনবার্গ থামলেন। একটুকরো হেসে বলেনঃ আসল বক্তব্যে আসতে গেলে এ সব আমাকে ব'লতেই হবে। কিছুটা পরিষ্কার ক'রে বলা দরকার। আপনাকে সহজ ক'রে বলতে হবে সব কিছু।

আমি নিরুত্তর! সন্দেহ, বিভ্রান্তি আর মনকষ্টে আমি ব্যাকুল। প্রৌঢ় গুটেনবার্গকে কেমন যেন চাঞ্চল্যকর এক রহস্যময় মানুষ মনে হ'তে লাগলো।

গুটেনবার্গ সুরু করলেন আবার। মাথা নত ক'রে বলে চললেনঃ ব্যবসাতে আমার ভালোই হলো। পূর্বের জীবন যেন ভুলে গেলাম। কাজ আর অর্থের প্রয়োজনে এমনভাবে ছুটে চললাম যে অন্য সব চিন্তা ভাবনা সেখানে খেই হারিয়ে ফেলে।

তারপর যুদ্ধ এলো। লণ্ডনের মানুষ, বৃটেনের নাগরিক হিসাবে সেখানে তখন আমার শক্ত খুঁটি। কলকব্জার ব্যবসা আমার। যুদ্ধের মরসুমে কারবার আমার কিছুটা ফেঁপে গেল। আমি যেন ধনী হ'তে চলেছি।

মহাযুদ্ধ কারো নিজের অভিজ্ঞতা নয়। কোনও একটি দেশের সমস্যা নয়। সে ক-বছরের ইতিহাস আপনার জানা আছে।

ব্যবসার খাতিরে আমি দূর দূরান্তে ঘুরেছি। কিন্তু লণ্ডনই ছিল আমার আসল আস্তানা। হঠাৎ দেখলাম, আমার পরিচিত দু'একটি মুখ স্বদেশে ফিরে গেলেন। ফ্যাসিজম-এর কবরের উপর নূতন সভ্যতা গড়বার প্রেরণা নিয়ে দেশে ছুটে গেলেন।

কিন্তু আমি? আমি যাবো কোথায়? নিজের কবর যে আমি খুঁড়েছি বহু আগেই। ফ্যাসিজম ধ্বংস হ'লেও মানুষ তো নির্মূল হয়নি সেখানে। আমার সেখানে স্থান কোথায়? দূর থেকে জন্মস্থানকে প্রণাম জানিয়েছি শুধু।

ঠিক এই সময় আমি একটি নতুন ব্যবসায় হাত দিলাম। দেখা-শোনো করবার অসুবিধে থাকায় আমার পরিচিত এক ভদ্রলোক তাঁর দীর্ঘ দিনের চামড়ার কারবার গুটিয়ে ফেলছেন শুনলাম।

আমি আগ্রহ প্রকাশ করি। নতুন কিছুতে হাত দেবার কথা আমি ঠিক সেই সময়ই ভাবছিলাম।

চামড়ার কারখানা দেখতে এলাম ট্যান্জিয়ার্স। মরোক্কোর সমুদ্র তীরে ট্যানজিয়ার্স। মাছের আঁশটে গন্ধ আর ভেড়ার চামড়ার গন্ধ শুঁকলাম ক'দিন ধরে। মাথার ওপর শকুন আর চিল। আর সারা পরিবেশ জুড়ে ভেপসা গন্ধ।

একটা কথা আমার মনে ধরলো, চামড়ার কারখানাকে অবলম্বন ক'রে এই দূর দেশে ব্যবসার যথেষ্ট সুযোগ আছে। তাছাড়া কারখানা সাজানোর ব্যাপারে নতুন ক'রে পরিশ্রমের প্রয়োজন নেই। গড়া আছে, শুধু ভাঙন রোধ করা গেলেই প্রচুর লাভ।

বৃষ্টির দিন ছিল সেদিন। পথে কাদা। লোকের গায়ে বোটকা বিটকেল গন্ধ। কোনও রকমে কাজটুকু সেরে হোটেলে ফিরে আসছিলাম। হঠাৎ মাঝ রাস্তায় একজন পেছন দিক থেকে জাপটে ধরলে।

ঘুরে তাকিয়ে দেখি বডেন। বডেন আমার বহু পুরনো বন্ধু। হ্যানোফারের মানুষ। প্রচণ্ড আনন্দেও মানুষ হতবাক হয়। টানতে টানতে বডেন আমাকে এক কাফেতে নিয়ে চললো।

সন্ধ্যে গড়িয়ে গেছে অনেকক্ষণ। ভারী দেহের অদ্ভুত চেহারার লোকেরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। মুসলিম আছে, ইহুদী আছে।

জায়গাটা ঠিক কাফে নয়। ঢুকেই সিঁড়ি। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে বিরাট হল। বেলুনের মত পাতলা ফিনফিনে পর্দা ঝুলছে চারদিকে। আলো আছে। শুধু একটা গুমোট গুমোট ভাব।

বডেন চলেছে আমেরিকা। সব কিছু সম্পর্ক চুকিয়ে জর্মনি ছেড়ে চ'লে যাচ্ছে।

আমি বিস্মিত হ'য়ে প্রশ্ন করি : তবে মরোক্কোতে তুমি এসেছো কেন? ট্যানজিয়ার্সে তোমার কিসের প্রয়োজন?

বডেন হেসে বলে : আমার সঙ্গে প্রচুর পরিমাণ স্পেনীয় মুদ্রা ছিল। চোরাকারবারীদের কাছে বেশী দামে ভাঙাতে এসেছি এখানে। সে কাজ আমার সমাধা হ'য়েছে। কালই আমি ফিরে যাবো। কিন্তু তুমি এখানে কেন?

কথা প্রসঙ্গে বুঝলাম বডেন আমার বিগত জীবন সম্পর্কে কিছু জানে না। আমি যে দীর্ঘকাল পলাতক, দেশ ছেড়েছি বহুদিন, সে সংবাদ তার সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। একটি কুৎসিত ঘটনার আবর্তে পড়ে শত পাকে নিজেকে জড়িয়ে পৃথিবীর সব মানুষের কাছে আমি যে আজ পায়ে ঠেলা, সে সংবাদ বডেনের জানা নেই।

চারপাশে লোকজন সামান্যই। সবাই হলে ভিড় করেছে। ট্যাঙো থেমে গেছে। আবার একটা নতুন গৎ বেজে উঠলো সেদিকে।

একটি ইহুদী ছেলে সঙ্গে একটি মেয়েকে নিয়ে আমাদের পাশের টেবিলে এসে বসলো। মেয়েটি বডেনের সঙ্গে সুন্দর স্প্যানীশ ভাষায় কথা বললে।

সারা চত্বরে অন্য কোনও সাদা চামড়ার চিহ্ন মাত্র নেই। সতর্ক দৃষ্টিতে একবার চার পাশ দেখে নিয়ে আমি শুরু করলাম। বডেনের কাছে আমার জীবনের অন্ধকার দিনগুলোর কথা বলে গেলাম।

বডেন যেন বজ্রাহত। বিমূঢ় হয়ে সব কথা শুনলে। তারপর উদ্‌ভ্রান্তের মত প্রশ্ন করলে : তুমি আজ ফন গুটেনবার্গ? ফ্রেডারিক মুলার নও? আমি যেন কিছুই ভাবতে পারি না ফ্রেডারিক। সুন্দর জীবন তোমার এভাবে নষ্ট করেছো? অদৃষ্টের কি নিষ্ঠুর পরিহাস! কি বংশের ছেলে তুমি! আজ হত্যার অপরাধে পালিয়ে বেড়াচ্ছো!

আমি দেশে ফিরে যাবার আগ্রহ প্রকাশ করি। বডেন বাধা দিয়ে বলে : যে দেশ এই মিথ্যার কুহেলিকার মধ্যে তোমার জীবন নষ্ট করেছে,

সম্পূর্ণ রিক্ত করেছে প্রাণমন, সে দেশে আর তোমার ফিরে যাবার দরকার কি ? দেশের কথা ভুলে গেলেই ভালো করবে।

আমি বললাম ঃ আমার মনে হয় এতদিনে সেই ভয়ঙ্কর রাতের কথা মানুষ ভুলে গেছে। কত কি বদলে গেল। গোটা দেশটাই উল্টে পাল্টে গেল। বহু দিনের বহু দুরন্ত ঘটনার মধ্যে আমার এই সামান্য অঘটন লোকে মনে করে রাখে নি।

প্রবল বেগে মাথা নেড়ে বডেন বলে ঃ জীবনে ভুলই খালি ক'রেছো তুমি। নতুন ক'রে আর তার বোঝা বাড়িয়ো না। আমি তোমাকে কথা দিলাম, এ সম্পর্কে আমি গোপন অনুসন্ধান করবো। আইন দেখবো। সম্ভব-অসম্ভব সব তথ্যই সংগ্রহ করবো। মানুষের শুভবুদ্ধি আর নিজের সরল বিশ্বাস নিয়ে জগতে চলে আজ এখানে এসে ঠেকেছো। তোমার কোন উপকারে লাগতে পারলে আমি খুশী হবো। এ সম্পর্কে সঠিক সংবাদ তোমাকে পৌঁছে দেওয়া আমার পক্ষে খুব ক্লেশকর হবে না।

কাফে ছেড়ে চ'লে এলাম। পরদিন সকালে টেলিফোনে আমার সঙ্গে বডেনের কথা হ'লো। সন্ধ্যায় সে ট্যানজিয়ার্স ছেড়ে চ'লে যাচ্ছে।

আমার কাজও শেষ হ'য়েছে। চামড়ার কারখানার দর কষাকষি হবে লণ্ডনে। আমার হাতে কোনও কাজ নেই। হোটেলেই ছিলাম সে সন্ধ্যেতে।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে গলার টাই ঠিক করছি, এমন সময় আমার দরজায় করাঘাত পেলাম। ঠিক করাঘাত নয়, কিছুটা উদ্‌ভ্রান্ত ধাক্কায় কেঁপে কেঁপে উঠলো দরজার এক মুখো পাল্লাটা।

দরজা খুলতেই এক রকম হুড়মুড় ক'রে একজন ঘরে এসে ঢুকলো। অতি সুন্দরী একটি মেয়ে। আভিজাত্যের ছাপ সুস্পষ্ট। দিশেহারা চাউনী। ঠোঁট দুটি থর থর করে কাঁপছে। কণ্ঠে নিদারুণ ভীতি।

আমি বিস্মিত, চিন্তিত আর উদ্বিগ্ন। মেয়েটি আমার সঙ্গে অতি পরিষ্কার জর্মন বলছে। বিমূঢ় হ'য়ে সোফায় বসে পড়ি।

সে আর এক ইতিহাস! মেয়েটির নাম ইঙ্গে। স্পেনে বেড়াতে গিয়ে কডওয়েল নামে এক তরুণের সঙ্গে তার আলাপ হয়। ছেলেটির অতিশয় সুন্দর ব্যবহারে ইঙ্গে মুগ্ধ হয়। কডওয়েলের সঙ্গেই এখানে বেড়াতে এসেছিল ইঙ্গে।

এখানে এসে ইঙ্গে আবিষ্কার করে, ছেলেটি একটি কুৎসিত শ্রেণীর জীব। আসলে সে জালিয়াৎ। এখানকার এক ভদ্রলোককে সর্বস্বান্ত ক'রে কডওয়েল আজ ফেরার হয়েছে সকাল থেকে। ইঙ্গে ভয়ানক বিপন্না। ইঙ্গেকে এখানকার লোকেরা সন্দেহ করছে। তুজন মূর পথে নাকি তার পিছু নিয়েছিল।

গুটেনবার্গ কথার মাঝখানে থেমে গেলেন। এক ভদ্রলোক দূরের হেলানো চেয়ারে এসে বসলেন। আলোতে ভ'রে উঠছে চারদিক। ঘুমন্ত পৃথিবীর যেন ঘুম ভাঙছে।

চোখাচোখি হ'তেই গুটেনবার্গ পূর্বের মত সামান্য একটু হাসলেন। স্থুরু করলেন আবার ঃ ইঙ্গের কথাবার্তা আমাকে স্পর্শ করলো। কিন্তু আমি যে নিরুপায়! অপরিচিত মানুষকে আমি এড়াতে চাই। অপরের ঠোঁটে জর্মন শুনলে আমার কেমন যেন ভয় হয়। নিজের আমার বহু ভাবনা। চিন্তার আর ঠাঁই নেই মাথাতে। অন্যের কোন কিছুর দায়িত্ব নিতে ভয় পাই।

তবু ইঙ্গে আমাকে অভিভূত করলে। ইঙ্গে এক বিপন্না জর্মন মেয়ে। এইটুকুই আমাকে বিহ্বল করলে। তবু আন্তরিক ইচ্ছা থাকলেও অবস্থা আমার প্রতিকূল। নতুন কোনও কিছুতে আমার যেন শঙ্কা হয়।

শান্ত ক'রতে চেষ্টা করি। বললাম ঃ কালই আমি এদেশ ছেড়ে চলে যাবো। আমি তোমাকে কিছু অর্থ সাহায্য করতে পারি। কত হ'লে তোমার চলবে, তুমি স্বচ্ছন্দে বলতে পার।

বেদনায় ভেঙ্গে পড়লো ইঙ্গে। ঠোঁট দুটি থর থর করে কেঁপে উঠলো। নীরব অশ্রুতে চোখের পাতা ভিজে উঠলো। আকুল নিবেদন জানালেঃ আপনি জানেন না এদের। এই মূরদের কোনও পরিচয় আপনার জানা নেই। এদের অসাধ্য কর্ম নেই। আমাকে একা পেলে, এই শয়তানরা আমাকে যে কি করতে পারে আমি ভাবতে পারি না। অর্থ সাহায্যের কথা বলছেন, আমার যেটুকু সম্বল আছে তাতে আমি কোলোনে ফিরে যেতে পারি সহজেই! কিন্তু একা আমি যেতে পারবো না। দয়া ক'রে কোনও সভ্য দেশে আমাকে পৌঁছে দিন। সারা জীবন আমি কৃতজ্ঞ থাকবো আপনার কাছে।

কি ভেবে বডেনকে একটা ফোন করলাম। জবাব এলো, অল্প কিছু সময় আগে সে হোটেল ছেড়ে চ'লে গেছে।

ভেবে দেখলাম ইঙ্গের অনুরোধ সামান্যই। কালই তো আমি ট্যানজিয়ার্স ছেড়ে যাব। সে তো সহজেই আমার সঙ্গী হ'তে পারে। বিপন্না জর্মন মেয়ে ইঙ্গে! নিজের অর্থেরও অকুলান নেই শুনলাম। যুক্তি দিয়ে ইঙ্গের এই সামান্য অনুরোধ অগ্রাহ্য করা অসম্ভব।

বিনীত সংযত অনুরোধ ইঙ্গের। বলেঃ লণ্ডনে পৌঁছোলে আমার আর কোনও ভয় নেই। আমার বাড়ির সবার মধ্যে অতি সহজেই ফিরে যেতে পারবো। এদেশের মুসলিমদেরও আপনি চেনেন না। এখানকার ইহুদীদের সঙ্গে আপনার কোনও পরিচয় নেই। দৈত্যের মত মূরগুলো মানুষ নয়—পশু!

ইঙ্গেকে আশ্রয় দিলাম। বিপদাপন্না এই মেয়েটিকে আমি পরিত্যাগ করতে পারলাম না। অসহায় মেয়েটিকে রাত্রে আমি কোথায় যেতে বলবো? ইঙ্গেকে আমি ভরসা দিলাম। পরদিন আমরা দুজনে লণ্ডন পাড়ি দিলাম।

ডুবন্ত মানুষ হাতের কাছের তৃণখণ্ডকে যে ভাবে আঁকড়ে ধরে, লণ্ডন পর্যন্ত মেয়েটি আমাকে ধরে রইলো সেইভাবেই। লজ্জায়, ভয়ে আর

ঘৃণায় সে সঙ্কুচিত। সুন্দর মুখে একটি চাপা বেদনা, আর দৃষ্টিতে নিদারুণ ভীতি তার কিছুতেই গেল না।

লণ্ডনে ইঙ্গে সহজ হ'লো। খোলা মনে তাকে প্রথম হাসতে দেখলাম সেখানে।

ইঙ্গের সঙ্গে কথা হ'য়েছিল, সে পরদিনই লণ্ডন ত্যাগ করবে। কিন্তু লণ্ডন শহর তার তুরন্ত ভালো লেগে গেল। কাজের মধ্যে ডুবে থাকি আমি। যৌবনও আমার ফুরিয়ে গেছে বহুদিন। ইঙ্গের সঙ্গে ঘুরে বেড়ানোতে আমার আনন্দ কই ?

তবে সামান্য তু'একটি কথা ও ঘটনা থেকে বুঝলাম ইঙ্গে ঠিক আগের মত ব্যবহার করছে না আমার সঙ্গে। আমার সম্পর্কে সে যেন সচেতন হ'য়ে উঠলো।

পরদিন রাত্রি। ঘুমিয়ে ছিলাম ঘরে। কোনও কিছুর আওয়াজে আমার ঘুম ছুটে গেল। চোখ খুলে দেখি, আমার বিছানার অতি নিকটেই ইঙ্গে। বিস্ময় ভরা কণ্ঠে বলিঃ ইঙ্গে, এত রাত্রে তুমি আমার ঘরে ?

ধীরে বিছানার এক প্রান্তে এসে বসে ইঙ্গে। উঠে বসলাম আমি।

কণ্ঠস্বরে জড়িমা। কুণ্ঠিত ভাষা। বললেঃ ঘুম নেই, অনেক কথা ভাবছিলাম। তাই একটা কিছুর খোঁজে আপনার কাছে এলাম। কেন যেন আপনাকে আমার দেখতে ইচ্ছে ক'রলো। আপনার কাছে আসতে আমার কেমন যেন ভালো লাগলো !

শিউরে উঠলাম। একটা শীতল বিত্যুৎপ্রবাহ যেন অতর্কিতে খেলে গেল আমার দেহে। বেয়াড়া জোয়ারের আচমকা ঢেউ যেন আমার মাথাটাকে খান খান করে ভেঙে দিল।

গুটেনবার্গ যেন চমকে উঠলেন। বিস্মিত কণ্ঠে বললেনঃ আপনি চমকে উঠলেন কেন হের জেন ? আপনি অমন করলেন কেন ?

রুদ্ধশ্বাসে শুধু বলিঃ বলুন ! আপনার কথা ব'লে যান। থামবেন না। আপনি শেষ করুন।

গুটেনবার্গ বলেনঃ আমি হাত বাড়িয়ে আলোটা জ্বাললাম। অপ্রস্তুত হ'য়ে ইঙ্গে কিছুটা সরে বসলে। আমি চেয়ারে:এসে বসলাম।

আমি কিছুটা বিভ্রান্ত। প্রবল সন্দেহে আমি বিহ্বল। সংযত ও সহজ গলায় বললামঃ তোমার কথা আমি ভালো করে শুনিনি! তুমি কি বলতে চাও ইঙ্গে, পরিষ্কার করে বল।

ইঙ্গে মাথা নত ক'রে:ব'সে র'ইল অনেকক্ষণ। তারপর ধীরে ধীরে বলেঃ তোমাকে আমি ভালোবাসি। কিন্তু তুমি আমাকে ঘৃণা করছো।

কথাটা গিলতে আমার সময় লাগলো। আমার পাল্টা প্রশ্নের জন্যে ইঙ্গে হয়তো প্রস্তুত ছিল না। ছোট্ট কথাই আমার ঠোঁটে এলো। বললামঃ কডওয়েল ছেলেটি কে?

থ হয়ে মাথা নত ক'রে বসে রইলো ইঙ্গে। তারপর ধীরে ধীরে মাথাটা তুলে বলেঃ তুমি আমাকে বিশ্বাস করো না? আমাকে তুমি ঘৃণাই করবে শুধু!

পূর্বের প্রশ্ন আমার ঠোঁটে। বললামঃ কডওয়েল ছেলেটি কে?

ইঙ্গে নিরুত্তর।

আমার আরও শান্ত, গম্ভীর কণ্ঠ। বললাম টিপে টিপেঃ তুমি আমার পিছু নিয়েছো কেন?

ইঙ্গে রুদ্ধ কণ্ঠে বলেঃ ভালোবেসে।

একটি অজানা ভয়ে মন দুলে ওঠে। অশান্ত ভীত চিত্ত। ঠোঁটে হাসি ফুটিয়ে তোলার বৃথা চেষ্টা করি। বললামঃ তোমার এমন দুর্বুদ্ধি হলো কেন? তুমি আমার পিছু নিয়েছো কি দেখে? তোমার ভালোবাসায় আমার বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা নেই। তোমাকে আমার কণামাত্র প্রয়োজন নেই।

ইঙ্গে বলেঃ তুমি আমাকে অপমান করেছো, তাতে ক্ষতি নেই কিন্তু অবিশ্বাস ক'রো না। ফিরিয়ে দিও না আমাকে। আমি কারো নই। শুধু তোমার। তুমি আমাকে গ্রহণ কর।

তারপরের অবস্থা মর্মান্তিক। লজ্জা ও ভয়ে, ঘৃণা ও বিতৃষ্ণায় আমি তছনছ হ'য়ে গেছি। মাথায় অনেক কথা ভিড় ক'রে এলো। শেষের দিকে ক্রোধে আমি বোধ হয় চীৎকার ক'রে উঠেছিলাম। আমার জীবনের সীমারেখা ছেড়ে দূরে স'রে যেতে আদেশ করলাম ইঙ্গেকে।

আমার কথাতে সারা চোখে মুখে বিদ্যুৎ খেলে গেল। অনিবার্য এক প্রস্তুতিতে ইঙ্গের চোয়াল দুটি এঁটে এলো। তীর্যক ভঙ্গিতে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলেঃ জীবনের সীমারেখা ছেড়ে আমি দূরে সরে গেলেই কি তুমি শান্তি পাবে? অযথা আমাকে অবিশ্বাস ক'রে তুমি তোমাকে কোথায় নিয়ে যাবে, সে কথা ভেবে দেখেছো? সারা জীবন শুধু ভুলই করেছো তুমি! সে ভুলের মাশুল তোমাকে গুনতেই হবে ফ্রেডরিক!

চরম বিস্ময়োক্তি আমার কণ্ঠ থেকে ঝরে পড়েঃ ফ্রেডরিক!

বাঁকা হাসছে ইঙ্গে। বলেঃ আমি তোমার কোনও ক্ষতি করতে চাই না ফ্রেডরিক মুলার। এ সব কথা বলতে তুমিই আমাকে বাধ্য করেছো।

গুলিবিদ্ধ একটি অসহায় প্রাণীর মত আমার বুকটা থর থর করতে থাকে। রিক্ত, মর্মান্তিক কণ্ঠ যেন বিষণ্ণ ব্যাথায় টনটন করে ওঠে। বললামঃ তুমি আমাকে চিনলে কি ভাবে ইঙ্গে?

ইঙ্গে বলেঃ তুমি ভাবে বিভোর, আপনাতে তুমি মশগুল। বর্ষার দিনে সেই সন্ধ্যের কাফের কথা তোমার মনে পড়ে না? তোমার জীবনের চরম গ্লানিকর অধ্যায়ের একমাত্র শ্রোতা শুধু বডেনই নয়— আমিও ছিলাম। আমি সব শুনেছি। আমাকে তোমরা কি মনে করেছিলে জানি না। হয়তো জংলী দেশের কোনও একজন ঠাউরেছিলে। তাই বোধ হয় তোমার মুখের আগল ছিল না। তোমাদের জর্মন ভাষা হয়তো তাই কোন বাধা মানে নি।

আমি দুর্মদ। আমি অস্থির। কিন্তু নিরুপায়। আমি অক্ষম।

ইঙ্গেকে বলি ঃ কত চাই ? কি দিলে তুমি আমাকে মুক্তি দেবে ?

জবাব এলো ইঙ্গের ঃ অনেক, অনেক কিছু।

আমি যেন দেউলে হ'য়ে গেছি। নিলামের ঘরে বেচতে ব'সেছি নিজেকেই। ইঙ্গের মাথা নাড়ার সঙ্গে তাল রেখে দর শুধু বেড়েই চলে। হু হু ক'রে পাখা যেন মেলে উড়ে চলে।

কিন্তু পরদিন টেবিলে রাখা নোটের স্তূপ দু'হাতে সরিয়ে মেঝেতে ছড়িয়ে কান্নায় ইঙ্গেকে ভেঙে পড়তে দেখে হতবাক হ'লাম। নরম বুকটায় করাঘাত ক'রে কান্নায় সে ভেঙে পড়ে। আত্মগ্লানি আর অপমানে যেন সারা দেহ তার বিবশ হ'য়ে আসে।

ধীরে ধীরে মাথাটা তুলে অসহায়ের মত সারা ঘরে শূন্য দৃষ্টি মেলে ধরলো। বেদনাভরা কণ্ঠে বলে ঃ আমি এ সব চাই না। অর্থে আমার প্রয়োজন নেই! আমি চেয়েছি শুধু তোমাকে। কিন্তু তুমি আমাকে ঘৃণা করেছো! আমি তো মরতে চাই। আমি তো মরতে চাই-ই! তোমার পকেটে পিস্তল নেই ? গুলি ভরা নেই তাতে ?

অনেকক্ষণ পর আমার চেতনা যেন ফিরে এলো। ধীরে এগিয়ে এসে ইঙ্গের মাথায় হাত রাখলাম। আনত সুন্দর মুখটি অশ্রুতে মাখামাখি হ'য়ে গেছে। সুন্দর দেহশ্রী অবশ! ফুলে ফুলে উঠছে ক্ষোভে।

আমি কেমন বদলে গেলাম। ইঙ্গেকে আমার ভালো লাগলো। বড় সুন্দর মনে হ'লো সেদিন। ইঙ্গে তো হীন নয়। বিপুল অর্থ সে দু-হাতে ছড়িয়ে তার সুন্দর যৌবন নিয়ে আমার কাছে শুধু ভালোবাসার ভিক্ষা চাইছে। শুধু আমাকে পেলেই খুশী। আমাতেই সে সার্থক। আমি পাশে থাকলেই সে সফল।

ইঙ্গেকে আমি ভালোবাসলাম। সুন্দর মুখটি আমার বুকের মধ্যে নিয়ে রাখলাম অনেকক্ষণ। ইঙ্গে চরিতার্থ। নীরব অশ্রুতে আমার মনের কালিমাকে সে সম্পূর্ণ অবলুপ্ত করে দিল।

আমাদের দু'জনের বিয়ে হ'লো। ইঙ্গে বলে ঃ আমি গুটেনবার্গকেই

ভালোবেসেছি। বিয়ে করবো তাকেই। ফ্রেডরিক মুলারের সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নেই। তাই ইঙ্গে আজ বিদায় নেবে এ পটভূমি থেকে। আমাকে তুমি স্টেলা বলে ডাকবে প্রিয়।

তারপর কিছুদিন গেল। বিয়ের পর কয়েক মাস যেন ভালোই ছিলাম। স্টেলা আমার জীবনে বৈচিত্র্য এনেছিল সত্যি। কিন্তু ধীরে ধীরে আমি সব বুঝতে পারলাম। স্টেলার আসল চরিত্র আমার কাছে ক্রমে পরিষ্কার হ'য়ে এলো।

স্টেলা আমাকে ঠিক স্বামী হিসাবে গ্রহণ করলো না। আমার বিগত জীবনকে মূলধন ক'রে সারা জীবন সে আমাকে অপ্রস্তুত ক'রে রাখতে চায়। আমার অর্থের প্রাচুর্যকে হাতের দু'মুঠিতে নিয়ে রক্তিম যৌবনের সে যথেচ্ছ ব্যবহার সুরু করলে। পূর্ব জীবনের কি পরিচয়? সেখানেই বা স্টেলার কি ইতিহাস? আমার সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। আজও আমি জানি না আমার স্ত্রীর আসল নাম কি। স্টেলাই তার প্রকৃত নাম, না ইঙ্গে নামটাই ছিল খাঁটি, স্টেলার অসংলগ্ন কথা থেকে আমি আজও জানতে পারলাম না হের জেন।

দীর্ঘকাল পর আমরা জর্মনির দিকে পা বাড়াই। ভিন্ন নামে, ভিন্ন পরিচয়ে আমার জন্মভূমিতে ফিরে এলাম। বডেনের কোনও সঠিক জবাব আমার হাতে এলো না।

কিছুদিন ভয়ে ভয়ে গেল। হয়তো সময়ই সব কিছু সহজ ক'রে আনে। কিন্তু সহজ হলো না স্টেলা। অসুস্থ মন আর বিভ্রান্ত যৌবন দেশের জলবায়ুতে আরও বেশী অবাধ্য হ'য়ে উঠলো।

স্ত্রী হিসাবে স্টেলা সার্থক নয়, আমাকে দেখে নতুন পরিচিত কেউ সহজেই সেটা আন্দাজ করে। সেই সহানুভূতি স্টেলা তার কাজে লাগিয়েছে যথেচ্ছভাবে। সহজ শিকার সে খুঁজে পেয়েছে অতি সহজেই। অসুস্থ মন তার একটিকে কেন্দ্র ক'রে অন্যের সন্ধানে ছুটেছে। প্রলোভনের ক্ষমতাও বেড়েছে অনেক। বিকৃত রুচির তাড়নায় এক পুরুষ থেকে অন্য পুরুষে তার বিহার ঠেকানো অসম্ভব।

আজ অবস্থা অনেক বদলে গেছে। আমার সত্য পরিচয় প্রকাশ হ'লে আমি জানি মর্মান্তিক কোনও অঘটন ঘটবে না আমাব। আর এর চেয়ে সে মর্মান্তিক জীবন হয়তো সুখের।

স্টেলাকে আমি পরিত্যাগ করতে পারি, হয়তো তাতে আমার সম্মান অক্ষুন্ন রেখে চলা মুস্কিল হবে। স্টেলার কতটা শক্তি, কত গভীরে যে তার হাত পৌঁছোয় আমি অবহিত নই, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমি কি পথ বেছে নেবো আমি ভাবতে পারি না।

গুটেনবার্গ আমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। একটি দুর্বল হাত আমার হাতে মেলে ধরলেন। বললেন: আপনার প্রশ্নের উত্তর আমি দিতে পারলাম কিনা জানি না। স্টেলাকে আপনি ভালোবেসেছেন, তাই আমি আরও ভয় পেয়েছি। আমি জানি আমার এই কুৎসিত জীবন কাহিনী আপনি গোপন ক'রেই রাখবেন! সম্পূর্ণ ঘটনা আপনাকে না জানালে আপনার ক্ষতি হ'তো। স্টেলার সঙ্গে আছি ব'লে হয়তো আজকে আপনাকে আমি রক্ষা করতে পারবো। একটি সুন্দর জীবনকে অনিবার্য ধ্বংস থেকে হয়তো আমি নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দিতে পারলাম! আমি তো মৃত, আমার নিজের কবর আমি খুঁড়েছি নিজের হাতে, বহু আগে থেকেই। নিজেকে আমি ধ্বংস করেছি। সারা জীবন ভুলের পর ভুলই আমি কুড়িয়ে গেলাম অপরের ভুল তাই আমাকে নাড়া দেয়। অন্যের বিভ্রান্তিতে শিউরে উঠি।

চূড়ান্ত ভাবাবেগে গুটেনবার্গ অস্থির। অনুশোচনা আর আত্মগ্লানির বিয়োগসঙ্গীত এক দুরন্ত আবেগে সারা প্রাণ মনে উদ্বেল। হিম শীতল বাতাসে ভর ক'রে নৈরাশ্যের এক রিক্ত সুর দিক-দিগন্তে উধাও হ'য়ে গেল।

গুটেনবার্গ হাসছেন। আল্পসের মাথায় তখন নরম সূর্যরশ্মির বিচ্ছুরণ। আমার হাতে ধীরে চাপ দিলেন গুটেনবার্গ। ঠোঁট দুটি বিবর্ণ। চোখের প্রান্ত ভেজা। কণ্ঠস্বর অবরুদ্ধ।

গুটেনবার্গ চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়েন। মাথা নুইয়ে অভিবাদন করলেন। শিশুর মত এক টুকরো হাসি ঠোঁটের প্রান্তে ভেঙে পড়ে। বলেন : আল্লস্ হাসছে।

পাষাণের মত গুটেনবার্গের গমন পথের দিকে তাকিয়ে থাকি।

এক মুহূর্ত বিলম্ব নয়। হোটেল ছেড়ে চ'লে যেতে হবে। আল্লস্ ছেড়ে আমাকে পালাতে হবে! মুক্তি! মুক্তির জন্যে ব্যাকুল আমার হৃদয়।

পালিয়ে এলাম ঘর ছেড়ে। লাউঞ্জ পেরিয়ে আসতে গিয়ে হঠাৎ আমার যেন কেমন হ'লো। মন কেমন বিদ্রোহী হ'য়ে ওঠে। এগিয়ে চললাম অপরপ্রান্তে। স্টেলার মুখোশ আমি খুলে দেবো। প্রতারকের সব কথা আমি প্রকাশ ক'রে দেবোই।

কিছুটা দ্বিধার সঙ্গে ভেজানো দরজা খুলে ভেতরে ঢুকি। ভারী পর্দ্দার সামনে দাঁড়াতে হ'লো। ফাঁক দিয়ে নজরে এলো, স্টেলার ঘুম তখনো ভাঙ্গেনি।

বিছানার উপর স্টেলা। ঢিলে রাত্রিবাস বিস্রস্ত। লেপ খাট থেকে মেঝের কার্পেটে খসে নেমেছে। ক্লিপে কণ্টকিত মাথাটি নরম বালিশের মধ্যে উশখুশ ক'রছে। সামনে পেছনে কিসের যেন সন্ধান ক'রছে দু'বাহুতে। রক্তনখরে যেন নোনা স্বাদের স্পর্শ খুঁজছে পাতি পাতি ক'রে।

স্টেলার পরণের ঢিলে ফুরফুরে রাত্রিবাসটি বড় শীতল মনে হ'লো। মনে হ'লো এই পোষাকটি জড় নয়, এর যেন ভাষা আছে। এ শুধু মূক নয়। এ নির্মোক। স্টেলার উষ্ণ দেহ ও তার বিভ্রম দেখে মনে হ'লো সুন্দর প্রভাতের আভাস পেয়ে উদ্‌ভ্রান্তের মত অন্ধকার গহ্বর খুঁজে ফিরছে প্রাগৈতিহাসিক এক অন্ধ সরীসৃপ।

তারপর আমার কিছু মনে নেই। আল্পাস্ থেকে মিউনিকে ফিরে আসা আমার স্পষ্ট মনে প'ড়ে না। দুটি সম্পূর্ণ দিন কি ভাবে কেটে গেল ভাল করে বুঝতে পারিনি। দুঃস্বপ্নের ঘোর কেটে গেলেও একটি নৈরাশ্যের রেশ আছে। ন'ড়তে চ'ড়তে সেটি বড় বাজে।

দেহ অবসন্ন। মন বিষন্ন অবসাদে কাতর। মর্মান্তিক এক গ্লানি আমাকে আচ্ছন্ন ক'রে রাখে। প্রতারক যেন আমি নিজের কাছেই। এ প্রতারণার কথা অন্য কারো কাছে ব্যক্ত করা অসম্ভব। বড় একা। বড় নিঃসঙ্গ লাগে। বিদেশে এসে এত ফাঁকা, এতটা অসহায় আমার মনে হয়নি কোনদিন।

একবার ভেবেছি নিউরেমবার্গে ফিরে যাই। কিছুটা পরিচিত পরিবেশে হয়তো আমার ভাল লাগবে। আবার মনে হ'য়েছে, এত ঘটা ক'রে এখানে এসেছি; মিউনিকের স্বাদ এত তাড়াতাড়ি যে বিস্বাদে ভ'রে উঠবে তার কি সকারণ যুক্তি দেখাবো সেখানে ?

হোটেলের নীরব কামরা আর শীতল বিছানা যেন আমাকে আরও নিঃসঙ্গ ক'রে তুলছে। আয়নায় প্রতিফলিত নিজের মুখটি যেন বারবার অপ্রস্তুত করে। উদ্‌ভ্রান্ত মনকে আরও বেশী বিভ্রান্ত ক'রে তুলছে।

মনে হ'লো বাইরে হয়তো আমার ভালো লাগবে। মুখর মিউনিক আমার মনের অবসাদকে হয়তো নাড়া দেবে। বিষাদগ্রস্ত প্রাণমনে কিছু চপলতা আনবে।

তবু পথ আমাকে ভিন্ন পথে নিয়ে এলো। আমার অবচেতন মন হয় তো নীরবতাকেই আশ্রয় ক'রে থাকতে চায়। অনুতপ্ত মনে নির্জনতা এসে বাসা বাঁধে।

জনশূণ্য পার্কটিতে ব'সে রইলাম অনেকক্ষণ। এলোমেলো ঠাণ্ডা বাতাস আমায় ছুঁয়ে ছুঁয়ে কোনও অদৃশ্য আহ্বানে ছুটে চ'লেছে।

শীতে কাঁপতে কাঁপতে গাছ থেকে খসে প'ড়ছে বিবর্ণ পাতা। সবুজ ঘাসের আনাচে-কানাচে শুষ্ক পাতাগুলো প্রতিবাদের মিছিলের মত মনে হ'লো না। নীরব এক বিয়োগ সঙ্গীতের মূর্ছনা যেন ঝরে প'ড়ছে সে ঝরা পাতায়।

সুন্দর সাজানো বাগানটি নির্জন। পূবদিকের উঁচু গাছগুলোর মাথা ডিঙিয়ে গির্জার খাড়াই কোণগুলো আকাশের গায়ে স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে। সবুজ ঘাসের ওপর রকমারি ফুলগাছের সারি আবেষ্টন ক'রে আছে বাগানটিকে। এক পাশে ছোট একটি ফোয়ারা। চূর্ণ বারিধারার অবিশ্রান্ত বিচ্ছুরণ। স্থানে স্থানে পাথরের বাঁধানো গোল বেদী। ব্রোঞ্জের তুএকটি মূর্তি। অতীতের কোনও মহান ব্যক্তি। সাধারণ মানুষের নেতৃত্ব ক'রেছিলেন হয়তো কোনদিন। হয়তো নতুন কোনও পথ নির্দেশ ক'রেছিলেন শিল্প সাধনায়।

বাগানের অপরপ্রান্তে রোলিং'য়ের গা ঘেঁষে একটি লোক বহুক্ষণ ধ'রে বেহালা বাজাচ্ছে। ক্লান্ত এক সকরুণ সঙ্গীত। বাগানের সবুজ ঘাসের ওপর সেই সুরলহরী বিষন্ন মৃতু ছন্দে কম্পমান। আমার শূন্য মনে, রিক্ত মাণকোঠায় সে সঙ্গীতের খাদের সুর অবিমিশ্র এক সমতানের সৃষ্টি ক'রছে।

লোকটির বামদিকে মাটিতে রাখা টুপিটি মলিন। ধূসর বর্ণের টুপিটি উল্টে রাখা। দৈবাৎ কোনও পথচারী হয়তো থমকে দাঁড়ায়। হয়তো ঘাড় ঘুরিয়ে দেখেও। ফেলে দেয় তুএকটা ফেনিগ টুপির গর্ত্তে। সঙ্কুচিত আঙুলে ক্ষিপ্রতার সঙ্গে পকেটে তুলে নিচ্ছে লোকটা। শূন্য টুপিটা আবার রাখছে উল্টো ক'রে।

বিচিত্র বর্ণের কয়েকটি প্রজাপতি ফুল গাছগুলোর মাথার ওপর উদ্‌ভ্রান্তের মত উড়ে বেড়াচ্ছে। বোঁটায় ব'সছে কখনও। কখনও কুসুম কোরকের মধ্যে কৌতূহলে ঢুকে প'ড়ছে অনেকটা। আবার হিমেল বাতাসে দোল খেতে খেতে ছুঁয়ে চ'লেছে সে শাখায় শাখায়। অন্বেষণ চলে ফুলে ফুলে, পাতায় পাতায়।

পদধ্বনিতে ফিরে তাকাই। কিছুটা দূরে ফুল বাগানের সর্পিল পথ বেয়ে এক বৃদ্ধ এগিয়ে আসছেন। কুণ্ঠিত পদক্ষেপ। হাতের লাঠির সাহায্যে সামনের পথ যেন চিনে চিনে আসছেন।

আমার ঠিক সামনে নয়, কিছুটা এসে বাঁক নিলেন। পাথরের বাঁধানো গোল বেদীর সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেলেন।

ভদ্রলোকের ধরণধারণ কিছুটা অস্বাভাবিক। মূর্ত্তিটির অতি নিকটে গিয়ে কিসের যেন সন্ধান ক'রছেন। তারপর দেখলাম দু'হাতের শীর্ণ আঙুলের স্পর্শে মূর্ত্তিটির মুখ ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখছেন গভীর অনুরাগে। প্রশান্ত মুখটিতে অবিমিশ্র এক সুখানুভূতি ফুটে ওঠে।

আমার কিছুটা অসঙ্গত মনে হ'লো। বেখাপ্পা মনে হ'লো কিছুটা। বৃদ্ধ দুপা পিছিয়ে এলেন। প্রসারিত বাহু ধীরে ধীরে নেমে এলো। লাঠিটি খসে পড়লো বাহু থেকে। দুপাক খেয়ে বেদীর এক প্রান্তে এসে মাটিতে এসে পড়ে লাঠিটি।

বৃদ্ধ পাথরের ওপর লাঠিটির সন্ধান ক'রছেন। এপাশে ওপাশে সাদা পাথরের ওপর পরিচিত লাঠিটি খুঁজে চলেছেন। বুঝলাম বৃদ্ধ ভদ্রলোক সম্পূর্ণ অন্ধ। দৃষ্টিতে শুধু আছে অন্ধকার।

এগিয়ে এলাম। মাটি থেকে লাঠিটি হাতে তুলে নিলাম। পাথরের সিঁড়ি বেয়ে বৃদ্ধের সামনে এগিয়ে আসি।

বৃদ্ধ পদশব্দে উঠে দাঁড়িয়েছেন। লাঠিটি হাতে তুলে দিয়ে কয়েক মুহূর্ত ব্রোঞ্জের সেই মূর্ত্তিটির দিকে তাকিয়ে রইলাম।

পরিচ্ছন্ন গলায় প্রশ্ন করলেন: ভগবান আপনার মঙ্গল করুন! আপনার পরিচয়?

ধীর সংযত কণ্ঠ। দীর্ঘ শীর্ণ দেহে বার্ধক্যের পরিপূর্ণ ছাপ। মুখটি শুষ্ক। মাথার চুল ধূসর। ঠোঁটে ক্ষীণ হাসির সঙ্গে চাপা কৌতূহল।

আমার পরিচয় সামান্যই। তবু আনন্দ উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে বৃদ্ধের সারা মুখে। আকাশের দিকে লাঠি উঁচু ক'রে বললেন:

হিন্দুরা এক মহান জাতি। ভারত খুব প্রাচীন দেশ! ভারতের লোকেরা খুব মহান।

পা চালিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলাম বৃদ্ধের সঙ্গে। কথার সূত্র ধ'রে জিজ্ঞাসা করি: মূর্ত্তিটির সঙ্গে আপনার একটি বিশেষ সম্পর্ক আছে ব'লে মনে হচ্ছে।

থমকে দাঁড়ালেন বৃদ্ধ। লাঠির ডগায় সবুজ ঘাসের ওপর অদৃশ্য কয়েকটি আঁচড় কেটে বললেন: আপনার চোখে এড়ায়নি দেখছি! এই মূর্ত্তিটি আমার হাতের শেষ কাজ। সম্পূর্ণভাবে আমার হাতে গড়ন পাবার আগেই চোখ দুটি আমার নষ্ট হ'য়ে যায়। তাই আসি মাঝে মাঝে। হাতের স্পর্শে অনুভব করি। আঙুলের ছোঁয়ায় এটি দেখে যাই মাঝে মাঝে।

বিষাদে জড়ান কথাগুলি আমাকে স্পর্শ করে। শিল্পীর জীবনকে নিয়ে বিধাতার এ কি নিষ্ঠুর পরিহাস?

জিজ্ঞাসা করি: দুটি চোখই আপনার সম্পূর্ণ নষ্ট হ'য়েছে?

ক্ষীণ হাসলেন বৃদ্ধ। মৃত চোখ দুটিতে রুমাল বুলিয়ে নিয়ে বলেন: একেবারে জানান না দিয়েই! হঠাৎ এক সন্ধ্যায় আমার দৃষ্টি শক্তি লোপ পেলো। কোন চিকিৎসাই করাতে পারিনি। চোখ দুটি আমার সঙ্গে বড় বেশী কৌতুক ক'রেছে।

আমার কনুই স্পর্শ ক'রে বললেন: দেখুন, আমার হাত থেকে লাঠিটি খসে পড়বার পেছনে ঈশ্বরের এক সুন্দর অভিপ্রায় ছিল। আপনার সঙ্গে পরিচয়ের সৌভাগ্য থেকে নইলে বঞ্চিত হতাম।

আপন মনেই উচ্ছ্বসিত হন। মাটিতে লাঠি ঠুকে ঠুকে বলেন: আপনি সুন্দর জর্মন বলেন। ভারত এক সুমহান দেশ! আপনি মহান। আপনার দেশের সংস্কৃতি বহু প্রাচীন, আমি জানি।

এক বাঁকের মুখে ঘুরে দাঁড়ালেন বৃদ্ধ। অতি নিকটে ঝুঁকে প'ড়ে বললেন: আপনার বিশেষ তাড়া না থাকলে, একবার আমার বাড়িতে

আসতে ব'লবো! এক পেয়ালা কফি পান ক'রতে চাই আপনার সঙ্গে ব'সে। এ অনুরোধ আমি ক'রবো আপনাকে।

নিমন্ত্রণ গ্রহণ করি। বৃদ্ধ নিতান্তই প্রীত হ'লেন। বললেন: আমার ছেলেটি ক'দিন হ'লো অনেক দূরে চ'লে গেছে। আমার ঘর এক রকম শূন্য। সন্ধ্যেটা বড় ফাঁকা ফাঁকা মনে হয়। বড় নিঃসঙ্গ লাগে নিজেকে।

কথায় কথায় অনেকটা পথ এগিয়ে আসি। বাগান ফেলে এলাম পেছনে। বেহালার বিষাদ সঙ্গীত আর কানে ভেসে আসছে না।

আরও কিছুটা পথ পার হ'য়ে আসা গেল। বৃদ্ধ ভদ্রলোক বলেন: আমরা পৌঁছে গেছি। ডানদিকের ঐ কুটিরে আমার আস্তানা। আপনাকে দেখে আমার স্ত্রী খুবই প্রীত হবেন।

একতলা বাড়ী। ত্রিভুজাকৃতির লাল টালির ছাদ। ফলে ফুলে ও সবুজ গাছ গাছালিতে সামনের বাগানটুকু অতিশয় রমণীয়। ছবির মত বাড়ীটি যেন হাসছে।

গেট খুলে নত হ'য়ে আমাকে ভিতরে আহ্বান ক'রলেন। পাথরের নুড়িতে বাঁধানো সর্পিল পথ বাড়ীর সিঁড়িতে গিয়ে মিশেছে। পাতলা ইঁটের কিছুটা কাৎ করা ঢেউ খেলানো বেষ্টনীর দুই প্রান্তে সবুজ ঘাস ও ফল বাগান।

চলনে যদি বা সামান্য কিছু সঙ্কোচ ছিল বাইরে, কিন্তু বাড়ীর মধ্যে বৃদ্ধ ভদ্রলোকের গতিবিধি দেখে মনেই হয় না তিনি অন্ধ।

ঘরে ঢুকে কয়েক মুহূর্ত থ হ'য়ে থাকতে হ'লো। এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তের দেয়াল জুড়ে শুধু মূর্ত্তি। ছোট বড় নানা মূর্ত্তি। নানা ভঙ্গির বহু মূর্ত্তি। ভারী কার্পেট মেঝেতে। পরিষ্কার সুন্দর আসবাবে সাজানো ঘর।

অবাক হ'য়ে এই বৃদ্ধ শিল্পীর পরিপূর্ণ নিষ্ঠার নানা বিচিত্র প্রকাশ দেখতে থাকি। বৌদ্ধ মূর্ত্তি আমাকে অভিভূত করে। নটরাজ আমাকে মুগ্ধ করে।

বৃদ্ধ তাঁর স্ত্রীকে ধ'রে আনলেন। চোখে অদম্য কৌতূহল। ঠোঁটে খুশীর হাসি। দোহারা গড়নের প্রৌঢ়া মহিলা। পরণে সাবেকী ঢং-এর পোষাক। মাথা হেঁট ক'রে অভিবাদন করি।

ভদ্রমহিলার প্রচুর কৌতূহল। নানান প্রশ্ন। অনেক কথা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জানতে চাইলেন। আমার দেশের মেয়েদের কথা শুনলেন অনেকক্ষণ ধ'রে। কোনও এক গোপন সংবাদ আহরণের খাতিরে যেন কিছুটা ঝুঁকে প'ড়ে প্রশ্ন করেন: আপনাদের দেশের মেয়েরা এদেশের মেয়েদের মত ঠোঁটে রঙ মাখে?

হেসে জবাব দিলাম! বললাম: ঠোঁটে রঙ মাখবার চলন নেই আমাদের দেশে। সামান্য তু'চারজন ব্যবহার করেন, তবে বহু মেয়েদের ভীড়ে সামান্য কয়েকটি ঠোঁট সম্পূর্ণ হারিয়ে যায়। তাদের সংখ্যা নগণ্যই।

লাগসই জবাব যেন ওঁর কানে গেল। আধুনিক মেয়েদের রুচি-বিকারের বিরুদ্ধে অনর্গল ব'লে গেলেন।

বৃদ্ধ ভদ্রলোক কিছুটা ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ। অতি সাধারণ কৌতূহলের একান্ত অভাব। পৃথিবীর নানান কোলাহল এনাকে স্পর্শ করেনি। তুচ্ছ কোনও কিছুকে অবলম্বন ক'রে দায়িত্বহীন সহজ কৌতুকে ইনি আগ্রহশীল নন।

সুন্দর কফি পান ক'রলাম। নিউরেমবার্গে ড্যুরর্-এর সংগ্রহশালায় 'উড্‌কাট্' আমাকে মুগ্ধ ক'রেছে শুনে অতিশয় প্রীত হ'লেন ভদ্রলোক।

কি মনে ক'রে পেছনের দীর্ঘ শেলফ্-এর দিকে এগিয়ে গেলেন। এটা সেটা নাড়াচাড়া করেন। কাৎ করা একটি মূর্ত্তি সোজা ক'রে রাখলেন। তারপর তু'তিনটি মূর্ত্তি ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখতে লাগলেন। ঘুরে দাঁড়িয়ে স্ত্রীকে উদ্দেশ্য ক'রে বললেন: আমার সেই মেয়েটি কোথায় গেল? যে মেয়েটি কাঁদছিল, সে মেয়েটি কোথায় গেল?

একটি নারী মূর্ত্তির মুখে আঙুল বুলিয়ে ব'লে উঠলেন: এ মেয়েটি তো হাসছে, এটা নয়। আমার কান্নাটা কোথায় গেল?

প্রৌঢ়া মহিলা জবাব দিলেন: সেটি আমি সরিয়ে রেখেছি ও ঘরে। সেটাকে কি তোমার প্রয়োজন আছে? এনে দেব এখানে?

বৃদ্ধ মাথা নেড়ে বলেন: কোন প্রয়োজন নেই। কান্নার মূর্ত্তিটি দেখছিলাম না কিনা, তাই জানতে চাইছিলাম।

আমি বিস্মিত হ'য়ে জিজ্ঞাসা করি: আঙুলের স্পর্শে আপনি মূর্ত্তির হাসি কান্নার তফাৎ বুঝতে পারেন?

শিশুর মত লজ্জিত হাসি বৃদ্ধের ঠোঁটে। ফিরে এলেন সোফাতে। মৃত চোখদুটি সামনে তুলে বলেন: অবাক হচ্ছেন আপনি?

আমি অভিভূত। সার্থক শিল্পীর কি পরিপূর্ণ রূপ। বললাম: আপনি আমাকে বিস্মিত ক'রেছেন। এমন কোন শিল্পীর সান্নিধ্যে আমি আসিনি। শুনিনি এমন কথা। আপনি সার্থক! মহান আপনি।

কয়েক মুহূর্ত চুপ ক'রে রইলেন। তারপর মুখ তুলে বলেন: ঠিক আঙুলের স্পর্শে ধরা যায় না। হাত ও মন দুটোই কাজ করে। দুটোর সম্পর্ক দাঁড়ায় অভিন্ন। আপনি আমাকে পছন্দ ক'রেছেন, তাই আমার সাধারণ অনুভূতি দেখে আপনার খুব ভালো লাগছে।

আমি যেন কি বলতে যাচ্ছিলাম বৃদ্ধ বাধা দিয়ে বললেন: মহান এক স্রষ্টার কথা আমার মনে প'ড়ছে। উপলব্ধি, বোধ বা অনুভূতির কথা তুলছেন যখন তখন নিশ্চয়ই আপনার সে প্রসঙ্গ ভালো লাগবে।

বৃদ্ধ কেমন ভাবাবেশে চঞ্চল হ'য়ে উঠলেন। প্রসন্ন হাসিতে সারা মুখ ভরিয়ে তোলেন। পরিচ্ছন্ন সুরেলা কণ্ঠে তন্ময় হ'য়ে ব'লে চললেন:···

তিল ধারণের স্থান ছিল না সে অনুষ্ঠানে। অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহ। এক প্রান্তে বেদীর ওপর পিয়ানোতে তখন এক স্বর্গীয় সুর মূর্চ্ছনা উদ্বেলিত হ'য়ে উঠেছে। প্রকৃতির অকুণ্ঠ খামখেয়াল নব নব হিল্লোলে

উদ্‌ভ্রান্ত হ'য়ে গোটা পরিবেশকে আবর্ত্তন ক'রে চ'লেছে। নির্জন বনানীর একক সঙ্গীত মুখর সুর-লহরীর আবর্ত্তে প'ড়ে এক অপার্থিব ভাবাবেশে কম্পমান।

স্বর্গ ও নরক, ঝঞ্ঝা ও সমুদ্রতরঙ্গ, সৃষ্টি ও প্রলয়ের শাশ্বতরূপ সে সুর ঝঙ্কারে একত্রীভূত হ'য়ে মহামিলনের তীর্থক্ষেত্র সৃষ্টি ক'রছে। হতাশার মধ্যে থেকে আশার বাণী উৎসারিত হ'চ্ছে। বিয়োগব্যথার বিষণ্ণতা সে সুর মাধুর্যে বিভ্রান্ত হ'য়ে ধীর নৃত্যে এগিয়ে চলে। সমুদ্রের কল্লোল ধ্বনিতে আরোহণ, নিঃসঙ্গ কোন ঝরণা ধারার খাদের সুরে অবরোহণ।

সঙ্গীত স্তব্ধ হ'লো। পাথরের মত নীরব অন্ধকারে, সে সুর মূর্ছনা শিশির বিন্দুর মত নাড়া খেয়ে ঝ'রে প'ড়লো। সবুজ ঘাসেতে খসে প'ড়ে ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল। হারিয়ে গেল মিহি উদারায়।

অগণিত শ্রোতা নিশ্চল। সমগ্র ধরিত্রীর ভাষা স্তব্ধ।

কয়েক মুহূর্ত বিরতির পর আঁধারের সুষুপ্তি যেন কেটে উঠছে। পর মুহূর্তে আনন্দ বিহ্বল উদ্‌ভ্রান্ত শ্রোতাদের করতালি আর হর্ষধ্বনিতে প্রেক্ষাগৃহ কেঁপে কেঁপে উঠলো। আকাশ-বাতাস মুখরিত হ'য়ে উঠলো।

কান্নায় ভেঙে প'ড়েছেন কেউ। আনন্দের সহজ প্রকাশে উত্তেজিত হ'য়ে উঠছেন কেউবা। মহার্ঘ আসন থেকে উত্তেজনায় মেয়েরা চীৎকার ক'রে উঠছেন। নিজের অজ্ঞাতেই চেয়ারের হাতলে আঘাত ক'রে দুর্মূল্য সোনার পাখা ভেঙে ফেলেছেন কেউ। দূরবীণের কাচ গুঁড়িয়ে গেল কারো। অবিমিশ্র পুলকের দিশেহারা আবেগ অন্ধকার পরিবেশ ঘিরে রিণ রিণ ক'রতে থাকে।

বিশাল পিয়ানোর সামনে সেই স্রষ্টা কিন্তু নিশ্চল। দুঃসহ আবেগে প্রাণমন অবসন্ন। পিয়ানোর ওপর মাথা রেখে পাথরের মত স্তব্ধ হ'য়ে আছেন। পিছনের পৃথিবীর কোলাহল থেকে দূরে, বহুদূরে। নিঃসঙ্গ, একাকী সেই সুরকারের কানে কোন আওয়াজ ভেসে এলো না।

একজন বৃদ্ধ আস্তে এগিয়ে এলেন। অশ্রুধারা যেন বাঁধন মানে না তাঁর। ধীরে সেই স্তব্ধ সুরকারের মুখটি উত্তেজিত মানুষের দিকে তুলে ধরলেন। রুদ্ধ কণ্ঠে, দুরন্ত আবেগে যেন ব'লতে চাইলেন : হে স্রষ্টা, তুমি চেয়ে দেখো! তোমার সঙ্গীত, তোমার সুর, মানুষের মনে কি আনন্দের সঞ্চার ক'রেছে, চেয়ে দেখো। তোমার সুরে মানুষের মন কি দুঃসহ আবেগে উদ্বেলিত হ'য়েছে দেখো !!

সুরকারের অলস আঁখিতে সংশয়ের বিষণ্ণ দৃষ্টি। জীবনের অক্লান্ত সাধনা যেন গভীর উৎকণ্ঠায় থর থর ক'রে কাঁপছে।

কয়েক মুহূর্ত পর মানুষের মনের কথা যেন বুঝতে পারেন সুরকার। শ্রোতৃমণ্ডলীর উদ্বেলিত হৃদয়ের যেন তিনি সন্ধান পান। কারণ, অল্পক্ষণ আগে যে স্বর্গীয় সুরের সমাপ্তি হ'লো, যে সঙ্গীত, যে সুরের কবিতা এই ধরিত্রীর বুকে অনন্ত কাল অমর হ'য়ে রইলো, সে সঙ্গীত এই সুরকারের কাছে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। সুরকার বধির।

স্বর্গীয় সঙ্গীতের সুর সৃষ্টি করবার জন্যে হয়তো মর্ত্যের সব শব্দ তাঁর কানে ফুরিয়ে গিয়েছিল। অনন্তকাল ধ'রে যে সার্বজনীন ভ্রাতৃপ্রেমের কল্যাণকর গাথা ধ্বনিত হ'য়েছে সাহিত্যে, শিল্পে, যে প্রেরণা দিয়েছেন যীশু, বুদ্ধদেব, যে কথা ব'লতে চেয়েছেন প্লেটো, 'নবম ও শেষ সিম্ফনীতে সুরকার সেই সঙ্গীতই ধ্বনিত ক'রেছেন।

বৃদ্ধ হাসলেন। ভেজা চোখ দুটির ওপর রুমাল বুলিয়ে নিলেন। ক্ষীণ হেসে বললেন : বিঠোফেনের কথা আপনার হয়তো জানা আছে।

অন্ধ এই বৃদ্ধের ঠোঁটে মহান বিঠোফেনের কথা আমাকে অভিভূত করে। শিল্পী, সার্থক শিল্পীর কথা হয়তো এমন সুন্দর ভাবে ব'লতে পারেন।

বললাম : অতি সামান্যই জানি! আপনার কথা শুনতে আমার খুব ভালো লাগছে। বিঠোফেনের সুর আপনি শুধু কান দিয়ে শোনেন নি, হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছেন!

বৃদ্ধ কিছুটা কাৎ হ'য়ে বসলেন। হেলান দিয়ে ঝুঁকে প'ড়ে বললেনঃ হয়তো আমি কিছুটা বিব্রত হ'য়ে পড়ি। চোখে তো দেখি না, তাই মনের আবেগে কিছুটা হয়তো উচ্ছ্বসিত হ'য়ে পড়ি।

বৃদ্ধ শুরু করলেন আবার। সেই পরিচ্ছন্ন ঝরঝরে গলা। ম্লান একটু হেসে বলেনঃ আজ জর্মনি ধন্য। বন্ আজ পৃথিবীর মানুষের কাছে তীর্থস্থান। কিন্তু কি পরিমান বিদ্রূপ আর হতাশা এই সুরকার সারা জীবন বহন ক'রে গেছেন সে কথা ইতিহাসের পাতায় লেখা আছে।

দারিদ্র ও অবহেলার মধ্যে জীবনের সূত্রপাত। সুরে আগ্রহ পিতার ছিল ঠিকই, কিন্তু তার চেয়ে সহস্রগুণ আসক্তি ছিল সুরাতে।

গভীর রাত্রে মত্ত পিতা বাড়ী ফিরলেন। হুলস্থুল বাঁধিয়ে তুললেন ঘরে এসে। নাবালক পুত্রের গভীর নিদ্রা ছুটে যায়। টানতে টানতে নিয়ে চ'ললেন অন্য ঘরে। বেহালা হাতে তুলে দিয়ে মত্ত পিতা চীৎকার ক'রে উঠলেনঃ বাজাও!

ছাতের পাশে ছোট একটি ঘর। নাবালক পুত্রের একঘেয়ে ক্লান্তিকর সুরধ্বনির অবিরাম অভ্যাস চলে। পিতার চাকরী গায়কের। পুত্রকে তিনি দোসর হিসাবে পেতে চান। নীচে রুগ্না মাতা উৎকণ্ঠায় কাতর চোখে শুধু তাকিয়ে থাকেন।

অসুরের সঙ্গে বিশেষ মিল থাকলেও পিতার সুর জ্ঞানে খুব গরমিল ছিল না। হঠাৎ এক প্রভাতে, নিতান্ত আকস্মিক ভাবে তিনি আবিষ্কার ক'রলেন তার সমস্ত পুঁজি নিঃশেষিত। কিন্তু কিশোর পুত্র সুরের অনন্ত পিপাসায় ব্যাকুল। তৃষ্ণার্ত এই কিশোর চিত্তে নব নব সুর সিঞ্চনের মত সঞ্চয় তাঁর হাতে নেই।

পুত্রকে টানতে টানতে আবার নতুন অধ্যাপকের কাছে নিয়ে এলেন। নতুন শিক্ষা সুরু হ'লো। বিনা পারিশ্রমিকে সহকারী এক অর্গান বাদকের কাজও বালকের হাতে এলো। কিন্তু পিতা অসহিষ্ণু

হ'লেন। সুর বিক্রি ক'রে সুরা আহরণেই তিনি অভ্যস্ত। পুত্রের সঙ্গীতে তাই অসঙ্গতিই খুঁজে পান।

নবীন সুরকার কিন্তু থামলেন না। আঁধারে আলোতে মুক্ত আকাশে, নদীর কুলকুল প্রবাহে, এক ঋতু থেকে অন্য ঋতুতে অন্তলীন সুরের পেছনে কান পেতে রইলেন।

কাগজ কলম টেবিলে ছড়ানো। সারা ঘরে উদ্‌ভ্রান্তের মত পায়চারী ক'রছেন। অশান্ত মন নিয়ে পিয়ানোর দিকে ছুটে যাচ্ছেন। মৌন সুর আঙুলে নাড়া খেয়ে ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে। প্রথমে সন্দেহ, তারপর স্থির হ'য়ে শোনা। সুরের শেষ রেশটুকু যেন সারা দেহে ও মনে ঢেউ তুলে মিলিয়ে যায়। অবিমিশ্র এক পুলকে মুখটি উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে। ছুটে আসেন টেবিলে। কলম বেয়ে কাগজে সুরের মূর্ছনা ঝরে পড়ে। নতুন সুরের সাক্ষর রচিত হয়।

দিন যায়! সপ্তাহ গড়িয়ে যায়। মাস ঘুরে আসে। বছরের শেষ পাতাটিও হাতে খুলে আসে। সুরকার হয়তো সেই একই সঙ্গীতের গড়ন দিয়ে চলেছেন তখনও।

কতটা মিড়, কতটা গমক, আরও কত বেশী মূর্ছনা শীতের রাত্রে তুষারের এলোমেলো কান্নাকে ফুটিয়ে তোলে? শিশুর সহজ হাসিতে কত মিঠে ঝঙ্কার লাগে? প্রেমালাপেই বা কতটা প্রগল্‌ভ হতে হ'বে? পিয়ানোর আর কত খাদে গেলে বিষণ্ণ রুগ্ন মায়ের হৃদয়ব্যথার সন্ধান পাওয়া যায়? নবীন সুরকার সেই সুরের সন্ধান ক'রে চ'লেছেন পাতি পাতি ক'রে।

বিক্ষিপ্ত মন নিয়ে বন্ ছেড়ে চ'লে যান সুরকার। জীবনের পরিচিত পরিবেশের সীমারেখা ছেড়ে নতুন শহরে এলেন। মোর্জাট-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'লো ভিয়েনায়।

সারা বিশ্বে মোর্জাট তখন বিস্ময়। নবীন সুরকারের অব্যক্ত অনুযোগ যেন ধ্বনিত হ'লো। কাতর নিবেদন জানানঃ আমার হৃদয়ে সুর আছে। প্রকৃতির মৌন সুরের পদধ্বনি আমি শুনতে

পাই, কিন্তু ব্যক্ত ক'রতে পারি না। আমি এক বিষণ্ণ ব্যথায় তছনছ হচ্ছি! আমি ঠাঁই চাই, সামান্য একটু জায়গা চাই।

অল্প কিছুদিন পর অশান্ত সুরকার অনুতপ্ত চিত্তে বনে ফিরে আসেন। মায়ের ডাকে ফিরে এলেন ঘরে। কিন্তু সব শেষ! রূঢ় বাস্তবের আচমকা আঘাতে কাতর হ'য়ে পড়েন সুরকার। কবরের বিষাদ সঙ্গীত অনুতপ্ত হৃদয়ে নাড়া খেয়ে হা হা ক'রে ওঠে।

মর্মান্তিক নৈরাশ্য এসে বাসা বাঁধে। পিতা দুর্মদ, সুরের তৃষ্ণা মিটে গেছে তার নিঃশেষ হয়ে। ক্ষোভে, দুঃখে, আত্মগ্লানি আর হতাশায় সুরকার কাতর।

আবার এক শীতের সন্ধ্যায় ভিয়েনার পথে পথে ঘুরে বেড়াতে দেখা গেল সুরকারকে। মাথার চুল অবিন্যস্ত। মলিন বসন। ভ্রূকুটিতে এক তিক্ত উপেক্ষা।

এই ভিয়েনাতেই অস্ট্রিয়ার এক রাজকুমার এই সুরকারকে আবিষ্কার ক'রলেন। পরম শ্রদ্ধায় গ্রহণ ক'রলেন সুরকারকে। আন্তরিক ভালোবাসায় এই অশান্ত মানুষটিকে নিজের ক'রে নিতে চাইলেন।

পরিশ্রান্ত সুরকার প্রাসাদে উঠে এলেন। অর্থ এলো। যশ হ'লো। শ্রেষ্ঠ অভিজাত পরিবারে হ'লো সহজ আনাগোনা। সুন্দর বিছানা। অতি সুন্দর পোষাকও। সুন্দরী রমণীদের নিকট সান্নিধ্য।

তবু সুরকার অশান্ত। একটি কথা তাকে বার বার নাড়া দেয়. লোকে বলে তার আঙুলে যাদু আছে। কিন্তু স্রষ্টা হিসাবে আজও মানুষ তাকে স্বীকার করে না কেন?

আর সুখ! এই জীবন? এতো অতি সাধারণ মানুষের কাম্য। প্রবল এক সন্দেহবাতিক মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো। কাল্পনিক দুঃখ আর মিথ্যা সন্দেহ আরও ক্লেশকর। অহঙ্কারী উদ্ধত চরিত্র তখন অবাধ্য, জেদী আর একগুঁয়েমীতে গিয়ে পেঁৗছোয়।

দু'একটি অকৃত্রিম বন্ধু পাশে র'য়ে গেলেন। সুরকারের ব্যবহারে

অনুতপ্ত হ'য়েছেন মনে মনে। মনস্তাপ ও মর্মপীড়ায় কষ্ট পেয়েছেন। তবু এই সুরকারকে একা ফেলে যাননি।

শ্রবণশক্তি ঠিক এই সময়েই মারাত্মক এক আঘাত ক'রে বসলে। নীচু পর্দার ঝঙ্কার কানে আসে না! ভারী আওয়াজ তুলতে গিয়ে বড় বেশী জোরে জোরে আঘাত ক'রতে হয় পিয়ানোতে।

ডাক্তার মনোযোগ দিয়ে দেখলেন। নিষ্ঠুর কোন ষড়যন্ত্রের হদিশ খুঁজে পাবার আপ্রাণ চেষ্টা ক'রলেন। কিন্তু বৃথা! কোন প্রচেষ্টার আর প্রয়োজন নেই। সব কিছু ব্যর্থ হ'য়ে গেছে।

উষর মরুভূমিতে এক ধূলিঝড় উঠে এলো। হাহাকার ছুটে এলো চারদিক থেকে। টলতে টলতে সুরকার ফিরে এলেন। পিয়ানোর ওপর আছড়ে এসে পড়লেন।

কিন্তু সুর আর কানে এলো না। নীরব হ'য়ে গেছে সব। ভাইওল্যার তন্ত্রীর ঝঙ্কার কানে এলো না।

বেহালা হাতে নিয়ে জানালার পাশে এসে দাঁড়ান। হৃদয়ের দুঃসহ আবেগ, মনের বিষণ্ণ ব্যথার সুর বাজিয়ে গেলেন। মন দিয়ে অনুভব ক'রলেন শুধু, কানে সুর ভেসে এলো না।

নতুন সুরে বাঁধতে হ'লো নিজের মন। মুক্তির জয়গান ধ্বনিত করবার মহান দায়িত্ব তার হাতে এসেছে। অমর, অনন্ত মুক্তি-সঙ্গীতের পদধ্বনি যেন তিনি শুনতে পেলেন।

ইয়োরোপের আর এক দেশে তখন এই সুরকারের মত আর এক পুরুষের মুক্তির জয়যাত্রা সুরু হ'য়েছে। জনসাধারণের ত্রাতা তিনি। ধনতন্ত্রবাদের ধ্বংসস্তূপের ওপর মানুষের মুক্তি সংগ্রাম শেষ হবে। সুরকার সেই মুক্ত প্রাঙ্গনে মুক্তির সুর পৌঁছে দেবেন। নেপোলিয়নের উদ্দেশ্যে সুরকার তার 'তৃতীয় সিম্ফনী' উৎসর্গ ক'রলেন।

কিন্তু ঠিক সেই সময়ই সংবাদ এলো মুক্তি ফৌজ অবরোধ আর অধিকারের নেশায় পাগল হ'য়ে উঠেছে। নেপোলিয়ন রাজা ব'লে

ঘোষণা করেছেন নিজেকে। ক্রোধে অন্ধ সুরকার উৎসর্গের পাতাটি টুকরো টুকরো ক'রে ছিঁড়ে ফেলেন। উন্মাদের মত চীৎকার ক'রে উঠলেন ঃ পশু, আমি তোমাকে চিনতে পারি নি এতদিন।

'তৃতীয় সিম্ফনী'র নতুন নামকরণ হ'লো। 'এক মহান ব্যক্তির স্মরণে—দৈহিক জীবিত আছেন, কিন্তু তাঁর আত্মার মর্মান্তিক অপমৃত্যু ঘটেছে'।

সৃষ্টির নেশায় সুরকার মশগুল! একটার পর একটা। মুক্তিকামী মানুষের জীবন সংগ্রামের কাহিনী বর্ণিত হ'লো সে সঙ্গীতে। হতাশার মধ্য থেকে অভয় বাণী ধ্বনিত হ'লো। ঊষর জীবন পূর্ণ হ'য়ে ওঠে অমরাবতীর আশীষে।

স্বাস্থ্যোদ্ধারে এসে মহাকবি গ্যয়টের সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'লো সুরকারের। সুরের কবির সঙ্গে ভাষার কবির মিলনে সেদিন ধরিত্রী এক অবিমিশ্র আনন্দোৎসবে উদ্ভাসিত।

সুরকার বলেন ঃ মহান কবির সান্নিধ্যে এসে আমি ধন্য হলাম। বৃদ্ধ মহাকবি নেপথ্যে মন্তব্য করেছেন ঃ একটি অবাধ্য ব্যক্তিত্ব, তবে এরকম একনিষ্ঠ কোনও শিল্পীর সাক্ষাৎ আমি জীবনে পাই নি।

নাটকীয় এক ঘটনার আবর্তে প'ড়ে এই দুই মহান ব্যক্তির মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে গেল। একই পথে পাশাপাশি চলেছিলেন। কথা ও সুরের আদান প্রদান চ'লেছিল বোধ হয় দুজনার।

হঠাৎ নজরে এলো, বাগানের অপর প্রান্ত থেকে অস্ট্রিয়ার এক রাজ দুহিতা ও পারিষদবর্গ এগিয়ে আসছেন সামনে।

দু-পা পিছিয়ে পথ থেকে সরে দাঁড়ালেন গ্যয়টে। টুপি খুলে অভিবাদন ক'রলেন নত হ'য়ে।

সুরকার কিন্তু নির্বিকার। পা কিছুমাত্র থামলো না। মাথার টুপি টললো না। ধীর গতিতে রাজ দুহিতা ও পারিষদবর্গকে পেছনে ফেলে এগিয়ে গেলেন।

গ্যয়টে ধিক্কার দিয়েছেন। সুরকার কিন্তু অটল। শুধু বলেছেন ঃ

শিল্পীর চোখে রাজ পরিবারের প্রতি বিশেষ পক্ষপাতিত্ব শিল্পকেই অপ্রস্তুত ক'রবে। সম্রাট ও সম্ভ্রান্ত মানুষের কিছুমাত্র অভাব হবে না পৃথিবীতে, কিন্তু বিঠোফেন একজনই! আপনার সৌজন্যবোধ সম্পর্কে আমার কিছু বলবার নেই, কিন্তু আমি নিজেকে সঙ্কুচিত হ'তে দেব না।

তারপরের অধ্যায় সুরু করলেন সুরকার এক নতুন প্রেরণা নিয়ে। নিরলস সাধনায় আবার নিজেকে হারিয়ে ফেলেন। সৃষ্টির প্রেরণায় দিবারাত্রি পরিশ্রম ক'রে চলেন।

দীর্ঘ নয়টি বছর পার হ'য়ে গেল। 'নবম ও শেষ সিম্ফনী' শেষ হ'লো তারপর। পরিশ্রান্ত সুরকার পৃথিবীর মানুষের দরবারে উৎকণ্ঠা আর সংশয় নিয়ে সে স্বর্গীয় সুর-গাথা তুলে ধরলেন।

তারপর পৃথিবীর মানুষের কোলাহল থেকে দূরে স'রে গেলেন সুরকার। মর্তের প্রয়োজন মিটেছে, স্বর্গের আহ্বান শোনা যাচ্ছে।

তবু ধরিত্রী অশান্ত হ'য়ে উঠলো। কোলের শিশু পুত্রকে ছিনিয়ে নিলে মাতৃ হৃদয় যেমন বেদনা ও কান্নায় হাহাকার ক'রে ওঠে, ঠিক তেমনই প্রকৃতি অশান্ত হ'য়ে উঠেছিল সেদিন। ঝড় ঝঞ্ঝায় প্রতিবাদ উঠেছিল। কালো পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ বিষন্ন বেদনায় সারা শহরের বুকে অন্ধকার টেনে আনলো। মুহুর্মুহু বিদ্যুৎ চমকালো। প্রবল বর্ষণের মধ্যে প্রকৃতির কান্না নেমে এলো। এলো মেলো হাওয়ায় ভর ক'রে মর্মান্তিক এক শোক সঙ্গীত যেন উৎসারিত হ'লো: যেও না! তুমি যেও না! আমাদের রিক্ত ক'রে যেও না!!

পর পর বিদ্যুৎ চমকালো কবার। প্রচণ্ড গর্জনে দিক দিগন্ত কেঁপে কেঁপে উঠলো। রুগ্ন ঘরটি চমকে উঠলো সে আলোতে। দরজাটি সশব্দে বেয়াড়া হিমেল বাতাসে বন্ধ হ'য়ে গেল।

সুরকারের পাণ্ডুর মুখে একটি ক্ষীণ হাসি ভেঙ্গে পড়ে। ধীরে চোখ দুটি মেলে ধরলেন সামনে। মুষ্টিবদ্ধ বাহুটি যেন দরজাটি খুলতে চাইলো। পর মুহূর্তেই সেটি বিছানাতে ঢ'লে প'ড়লো।

অমর সুরকার, অপরাজেয় স্রষ্টা বিদায় নিলেন এ পৃথিবী থেকে।

চুপ ক'রে শুনছিলাম। অন্ধ বৃদ্ধ শিল্পীর কথায় কেমন তন্ময় হয়ে গিয়েছিলাম। হারিয়ে ফেলেছিলাম নিজেকে।

বৃদ্ধের কথায় হুঁশ ফিরে আসে। কিছুটা ন'ড়ে চ'ড়ে বসেন। তারপর হাসতে হাসতে বলেনঃ আমি নিশ্চয়ই এক অপ্রাসঙ্গিক আলোচনার অবতারণা ক'রেছি। উপলব্ধি, বোধ আর অনুভূতির প্রসঙ্গ উঠেছিল, হয়তো আমি কিছুটা অন্য প্রসঙ্গে এসে প'ড়েছিলাম। আপনাকে নিশ্চয়ই খুব বিরক্ত ক'রলাম।

জবাবে বলিঃ আপনার কাছে দু-দণ্ড ব'সে আপনার কথা শুনে আমি ধন্য হলাম। আপনি প্রকৃত শিল্পী। আজকের এই সন্ধ্যা জীবনেও বিস্মৃত হবো না।

ঘড়ি দেখে উঠে পড়লাম। অনেকটা সময় এখানে কেটে গেল। কিন্তু এত ভালো সময় মানুষের কাটে কই?

আমার সঙ্গে পা চালিয়ে গেট পর্যন্ত এগিয়ে এলেন বৃদ্ধ ভদ্রলোক। একরকম ছুটে এলেন তাঁর প্রৌঢ়া স্ত্রী। আমার কোটের গর্তে একটি তাজা গোলাপ পরিয়ে দিয়ে খিল খিল ক'রে হেসে উঠলেন।

আন্তরিক স্নেহে বৃদ্ধ আমার হাতে ঈষৎ চাপ দিলেন। সুন্দর হেসে বললেনঃ আউফ ভিডারজেহেন!

মাথা নত ক'রে বলিঃ আউফ ভিডারজেহেন!

গেট পেছনে রেখে পথে নেমে আসি। প্রৌঢ়া মহিলা হাত নাড়ছেন। মৃত চোখ দুটি তুলে বৃদ্ধ ভদ্রলোক হয়তো আমার পায়ের শব্দ শুনছেন তখনও।

সবুজ গাছপালায় ও সুন্দর ফলে ফুলে পরিপূর্ণ ছোট্ট বাড়ীটি বড় রমণীয়। লাল টালির ছাতের পিছনে সারিবদ্ধ গাছগুলো হাল্কা হাওয়ায় দুলছে। ওপরে মুক্ত আকাশ। সেখানে সন্ধ্যা নামছে।

আমি নিকলকে পছন্দ করি। একটি পরিপূর্ণ চতুর চরিত্র থাকা সত্ত্বেও তার শিল্পীমন ও সুন্দর ব্যবহার আমাকে মুগ্ধ ক'রেছে। সামান্য কোন ঘটনা, তুচ্ছ কোনও কিছুর বর্ণনাও নিকলের অতি সুন্দর।

তার ফরমাশ মত কিছু ভারতীয় বয়ন শিল্পের নক্সা, শাড়ী ও ছিট কাপড়ের ডিজাইন আমি সংগ্রহ ক'রেছি। নিকল সেগুলি পেয়ে উচ্ছ্বসিত। বালুচরী শাড়ীর ডিজাইন তাকে মুগ্ধ ক'রেছে। জামদানি শাড়ীর নক্সা দেখে সে অভিভূত।

সন্ধ্যেটা আমার কাছে ছিল ক্লান্তিকর। একা একা পথে ঘুরে বেড়ানো আমার ভালো লাগে না। গায়ে প'ড়ে আলাপ জমিয়ে সবার সঙ্গেই দায়িত্বহীন কথাবার্ত্তাতে আমি অভ্যস্ত নই।

ব্যবহারিক ভদ্রতার ঘোমটা টেনে মাপা মাপা কথা, ঠোঁটের মিঠে স্বচ্ছল হাসি, প্রতিবাদের প্রবল ইচ্ছাকে সংযত ক'রে মৌন সম্মতি; শেষকালে ট্রাউজার্সের ভাঁজ বাঁচিয়ে আট-টায় ডিনারের জন্যে তাড়াহুড়ো ক'রে উঠে পড়াতে আমি অভ্যস্ত নই। দরজার বাঁকে ঘুরে দাঁড়িয়ে পাতলা হেসে, মাথা হেঁট ক'রে 'গুটে নাইটে' ব'লে, লাল কার্পেটে মোড়া সিঁড়ি বেয়ে স্মার্টলি পথে নেমে আসাও আমার ঠিক আসে না।

প্রাত্যহিক অভ্যস্ত জীবন প্রণালীর গণ্ডি ছাড়িয়ে বিদেশে এসে অনেকের অনেক অসুবিধের কথা শুনেছি। কিন্তু অহরহ যেটি আমাকে পীড়ন করে, সে এখানকার—কুলটুর। যত্রতত্র কুলটুরের মৌসুম আমাকে বিব্রত করে।

পিতা মৃত্যু শয্যায়। পুত্র এলেন দেখতে। পুত্রবধূও হয়তো এসেছেন সঙ্গে। আর সঙ্গে এসেছে সুন্দর মোড়কে ফুল। মাথা নত ক'রে পুত্রের কিছুক্ষণ বসে থাকা। ঘর থেকে বেরিয়ে আসা তারপর।

আমার প্রশ্ন, সবই তো বুঝলাম, কিন্তু ফুলটা কিসের? পরে খতিয়ে বুঝতে হয়েছে ওটি এদেশের কুলটুর।

নাচের উঠোনে কোন সুন্দরীকে দেখে তার সঙ্গে যদি ঠ্যাঙ্গ ছোঁড়াছুঁড়ি করবার বাসনা নিয়ে কেউ এগিয়ে যান, প্রবল অনিচ্ছা-সত্ত্বেও তাঁকে ফিরিয়ে দেওয়া সম্ভব হবে না সে সুন্দরীর। লঘু সঙ্গীতের সঙ্গে তাল রেখে অনভ্যস্ত পায়ে নরম দেহটি দুবাহুতে নিয়ে তিনি যখন কায়দায় মশগুল, তখন তরুণীর বিষণ্ণ চিত্ত, ঠোঁটে চাপা বিরক্তি আর কিছুটা নির্লিপ্ত পদক্ষেপ। তবু একবার মুখ ফুটে তার বলা সম্ভব নয়ঃ মাপ ক'রবেন, আপনার সঙ্গে আমি নাচবো না।

কারণ সুস্পষ্ট—কুলটুর।

তবে আমার মত যদি বাঙ্গাল হন, অতি বিনয়ের সঙ্গে তুচ্ছ এক অজুহাতের আশ্রয় হয়তো নেবে সে সুন্দরী। বলবেঃ আমার শরীরটা খারাপ। আমাকে মাপ ক'রবেন, আজ আমি নাচবো না। এতে এটিকেট বজায় রইলো, কুলটুরে হাত পড়লো না।

পর মুহূর্তেই যদি সে সুন্দরীর স্বামী বা প্রেমিক এসে হাজির হন সেখানে, প্রবল আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও তাদের ডাকে সাড়া দেবে না সুন্দরী। লঘু ফক্সট্রটের আহ্বান তাকে ফিরিয়ে দিতে হবেই। শরীর খারাপের অজুহাতটাই চালিয়ে যেতে হবে সে সন্ধ্যেতে। বুঝতে হবে ওটা কুলটুর।

টলার সাহেবকে ডিনারে ডেকেছিলাম এই সেদিন। নানান কিছুর সঙ্গে প্রচুর পরিমাণ প্যাপেরিকা স্নেৎসেল ও সাওয়ার ক্রাউট্ গেলা হয়েছিল। ও দুটোতে আমার অরুচি নেই। কিন্তু দিন দুই বিছানায় পড়েছিলেন টলার সাহেব। ঝাল ও টক দুটোই নাকি টলার সাহেবের খাওয়া বারণ।

আমি লজ্জায় সরু হ'য়ে গেছি। পরে আমার কানে এসেছে, আমি নাকি আগ্রহের সঙ্গে খাইয়েছি, যত্ন করে এটা সেটা এগিয়ে দিয়েছি, আমাকে ক্ষুণ্ণ করবার ভয়ে তিনি বাধা দিতে পারেন নি। আমি স্তম্ভিত। এটাকেও কি আমাকে বুঝতে হবে কুলটুর?

এদিক দিয়ে বিচার ক'রলে নিকলকে আমার যথেষ্ট বেশী স্বাভাবিক ব'লে মনে হয়। কুলটুরের আস্তর এর মনে মৌরসী পাট্টা ক'রে বসেনি।

সেই রেস্তরাঁ। সেই চেয়ার। নিকলের পূর্বের জায়গায় কোণা মেরে বসা। আমাকে দেখে এক রকম লাফিয়ে উঠলে সে। সঙ্গে একটি সুদর্শন যুবক ব'সে আছেন। আর পাশে এক তরুণী। অপরিচিত দুটি মুখ। নিকলের পাশে এসে বসি।

পরিচয় হ'লো। অপরিচিত যুবকের নাম রুডল্‌ফ্‌। মেয়েটি নিকলের বান্ধবী।

আলাপের প্রারম্ভে, পরিচয়ের প্রথম সূত্রপাতে রুডল্‌ফ্‌-এর কথায় আমি অভিভূত হ'য়ে পড়ি।

সুন্দর বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা রুডল্‌ফ্‌-এর। চোখ দুটিতে অলস দৃষ্টি। ঠোঁটে সুন্দর হাসি টেনে বললেন: আপনাদের দেশের ছবি দেখলাম কান্‌সে। এমন একটি মহান চিত্র সাম্প্রতিক কালে আমি দেখিনি। সত্যজিৎ রায়কে আপনি জানেন?

প্রশ্নের জবাব আমাকে দিতে হ'লো না। রুডল্‌ফ্‌ আপন মনে 'পথের পাঁচালী'র কাহিনী ব'লে চলে।

বাঙ্গলা দেশের অখ্যাত এক গ্রামের, অতি নগণ্য মানুষের চিত্ররূপ যে কি ভাবে এই বিদেশী যুবককে নাড়া দিয়েছে তা দেখে হতবাক হ'তে হ'লো। ফোটোগ্রাফির কথায় উচ্ছ্বসিত। পুকুরের পাড় দিয়ে, মেঠো পথে সঙ্গীতের সঙ্গে তাল রেখে মিঠাই ওয়ালার চলনভঙ্গি ও পেছনের কুকুরটাও রুডল্‌ফ্‌-এর দৃষ্টি এড়ায়নি। ঝড় বাদলের পর সেই মরা ব্যাঙটাও!

রুডল্‌ফ্‌ শুধু এই ছবি দেখে উচ্ছ্বসিত নয়, অভিভূত। আরও অনেক কথা। বহু কিছু।

কিন্তু আমি ভেবেছি অন্য কথা। এই ছবিটির সার্থক রূপ দিতে গিয়ে যে পরিমাণ নৈরাশ্য ও হতাশার পাঁচালী ঘাঁটতে হ'য়েছে স্রষ্টাকে, সে তথ্যের হদিশ জানেন ক'জনায়?

ডিস্‌ট্রিবিউটর-এর দল পরস্পর চোখ ঠারাঠুরি ক'রে 'প্রোজেকশন্‌ রুম' থেকে বেরিয়ে এসেছেন। কপর্দক দিয়ে ছবিটি শেষ করবার ভরসা দেননি। মহা মহা দিকপাল, অপর্যাপ্ত আদিরসের ব্যবহারে দেশের তরুণ চিত্ত নিয়ে যাঁরা সিনেমায় 'হিটে'র ফাটকা খেলেন, তাদের কেউ কেউ টালিগঞ্জের ফ্লোর-এ ব'সে মন্তব্য করলেনঃ সব লক্ষ্য ক'রছি! বিদগ্ধ সমালোচক নেপথ্যে মাথা ঝেঁকে মন্তব্য ক'রলেনঃ ছবি শেষ না হ'লে কিছু বলা মুস্কিল, তবে বেশ 'নিয়ো' 'নিয়ো' গন্ধ পেলাম। নিয়ো-রিয়্যালিজম বলতে আমি বুঝি···! ইত্যাদি।

আর বামে ঘেঁষা বুদ্ধিজীবী! তাঁরা ক'রলেন কি? ধূসর চুলে আঙুল বুলিয়ে ঠোঁটে হেসে একেবারে ধ'রে ফেললেন। বললেনঃ ও সব 'নিয়ো-টিয়ো' নয়। পুরোপুরি প্লেজিয়্যারিজম্‌। আইজেন্‌ষ্টাইনের সেই ছবিটা? ঐ ছবিটা?···কি নাম যেন?···ইত্যাদি!

অর্দ্ধসমাপ্ত ছবি নিয়ে এই দুঃসাহসী মানুষটি কিন্তু থামলেন না। বিরুদ্ধ সমালোচনা আর বিদ্রূপের তিনি বহু উর্দ্ধে।

গভীর রাত। চোখে ঘুম নেই মানুষটির। 'সিনারিও' টেনে বার ক'রেছেন। লিখেছেন, কেটেছেন, আবার নতুন ক'রে গড়েছেন।

নীরব মৃত পুকুরে আচমকা কোনও বিক্ষেপ তরঙ্গের সঙ্গে কত মিঠে সুর ঝঙ্কার সারা পরিবেশকে আরও নিবিড় করে? স্বীয় আত্মজার বিয়োগ ব্যাথায় পিতার কণ্ঠ কত সহজ ভাবে ধ্বনিত হবে? তিনবার, তিন পর্দ্দায় 'ও বউ হলো কি'র অভিব্যক্তি হবে কি সুরে?

বিশ্রাম নেই এই মানুষটির। এক গাঁ থেকে আর এক গাঁয়ে, এক হাট হ'তে অন্য হাটে অজ্ঞাত উপেক্ষিত মানুষের মধ্যে থেকে অভিনেতা নির্বাচন ক'রেছেন। প্রখর রৌদ্রে এক হাঁটু জল কাদা ভেঙ্গে মাঠে মাঠে ঘুরেছেন। বিভূতিবাবুর দেখা কাশবন আর কতদূর? তবে এ সংগ্রাম সত্যজিৎ রায়ের একার নয়। মহৎ ও সুন্দর সৃষ্টির পেছনে হয়তো এই একই ইতিহাস।

সুন্দর অসুন্দরের কাছে, সুর অসুরের হাতে মার খেয়েছে সৃষ্টির

গোড়া থেকেই। শুচিতা অশুচিতার সামনে চিরকালই অপ্রস্তুত। কিন্তু হার স্বীকার করেনি। বহু বাধা ও ক্লেশের পর মাথা সোজা ক'রে দাঁড়িয়েছে সে ঠিকই।

কি ভাবছো হের জেন ? নিকল প্রশ্ন ক'রলে।

নিকলের কথায় সম্বিত ফিরে আসে। রুডল্‌ফ্‌-এর পরিচয় পেলাম। চলচ্চিত্রের সম্পাদক। প্যারীতে দীর্ঘদিন কাটিয়েছেন। পাকাপাকি ভাবে দেশে ফিরে এসেছেন এবার।

অপরিচিতা মেয়েটি কিছুমাত্র অসাধারণ নয়। সুন্দরী নয় মোটেই। তবু আর পাঁচজন মেয়েদের মধ্যে এ যেন কিছুটা ব্যতিক্রম। আমার মুখের দিকে হাঁ ক'রে চেয়ে থাকে। চোখাচোখি হ'লে এক লহমা হাসে। অতি সাধারণ পোষাক। প্রসাধনের বালাই নেই তেমন। দেহ বিভ্রমে' চটুলতা নেই। কণ্ঠস্বরটি শ্রুতিমধুর।

আলাপ হ'লো। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী। উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞানের। নিকলের দূর সম্পর্কের আত্মীয়াও।

আমার মোটামুটি পরিচয়টুকু জানা হ'লো। বুঝলাম, এবার স্ত্রীর ওপর হাত পড়বে।

প'ড়লোও ! এক লহমা হাসি ঠোঁটের কোনে মিলিয়ে গেল। বিয়ারের মগটি টেবিলে ঘষতে ঘষতে বলে ঃ আপনার স্ত্রী ভারতে আছেন বুঝি ?

জবাব তো আমার প্রস্তুতই। হেসে টাই-এর গেরো কিছুটা আলগা ক'রে আমার সাজানো কথায়, বানানো গল্প করলাম। আগে ক'রতাম সকারণে, আজকাল মন্দোদরীর ছবি টেনে বার করি অকারণেও।

নিকল হাত বাড়িয়ে আমার ব্যাগের ছবিটি চাইলে। আপন মনে বলে ঃ ভারতীয় মেয়েদের চেহারায় এমন সুন্দর কমনীয়তা আছে ! আমার কিন্তু বেশ ভালোই লাগে তোমাদের দেশের মেয়েদের।

মেয়েটি বলে ঃ ভারতীয় মেয়েদের আমি অনেক দেখেছি। আপনাদের দেশের মেয়েদের পোষাক বড় সুন্দর।

ফোটোগ্রাফটি অনেকক্ষণ ধ'রে খুঁটিয়ে দেখলে মেয়েটি। মন্দোদরী দেবীর সৌন্দর্যের প্রশংসায় ঠোঁটে তার যেন আগল রইলো না।

হায় মন্দোদরী দেবী! জানি না, কোন্ খানে তোমার ঘর! কে তুমি? তোমার কি ইতিহাস? তোমার সৌন্দর্যের ফিরিওয়ালা হ'য়ে এই বিদেশের তামাম অঞ্চলে যে প্রচার ক'রে চলেছি সে সংবাদ তোমার কাছে অজ্ঞাতই র'য়ে গেল।

তাকিয়ে দেখি মেয়েটির হাত থেকে ছবিটি গিয়ে পৌঁচেছে রুডল্‌ফ-এর হাতে।

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইলো রুডল্‌ফ্। বাঁকা ছুরির মত ভ্রূভঙ্গি কপালের প্রান্তে ভেঙে পড়ে। বাম হাতের আঙুলে কপালে কবার মৃদু আঘাত ক'রলে। তারপর ক্ষিপ্রতার সঙ্গে আমার দিকে ঘুরে ব'সলে। কি যেন ব'লতে গিয়ে থামলে। আবার ছবিটি নিরীক্ষণ ক'রলে কয়েক মুহূর্ত। তারপর বলেঃ এ মেয়েটিকে আমি দেখেছি। এই শহরেই আছেন ইনি।

নিকল হেসে বলেঃ বিয়ারেও তোমার নেশা হয় নাকি রুডল্‌ফ্?

খিল খিল ক'রে হেসে উঠলো মেয়েটি।

আমি হতবাক হ'য়ে রুডল্‌ফ-এর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি। লোকটা বলে কি?

প্রবল বেগে মাথা নেড়ে সোজা হ'য়ে ব'সলে রুডল্‌ফ্। কিছুটা ঝুঁকে প'ড়ে বলেঃ কি আশ্চর্য মিল! আমার কিন্তু ভুল হবে না হের জেন। এনাকে আমি দেখেছি। রেল ষ্টেশনে না গ্রাণ্ড হোটেলে মনে ক'রতে পারছি না। এতটা ভুল আমি ক'রবো? আপনি কিছু লুকোচ্ছেন না তো হের জেন?

হাসি পেল। কি জবাব দেব এ কথার?

নিকল বলেঃ ভারতের মেয়েদের তুমি বড় দেখেছো ব'লে মনে হয় না! প্রায় সব মেয়েরাই সে দেশে শাড়ী পরে। তুমি ভুল ক'রেছো ওখানেই।

আমার হাতে ছবিটি ফিরে এলো। ব্যাগে পুরে পকেটে রাখি। শুধু রুডল্ফ-এর একটানা বিস্ময়োক্তি ঃ কি আশ্চর্য মিল!

নিকল আর মেয়েটি উঠে প'ড়লো। 'পাঙসিওন'-এ আমাকে পৌঁছে দিল রুডল্ফ্ তার গাড়ীতে। মন্দোদরী দেবীর ফোটোগ্রাফটি মুহূর্তের জন্যেও রুডল্ফ্ ভুলতে পারলো না দেখে অবাকই হ'লাম কিছুটা। শুধু আমার দিকে বিস্মিত নেত্রে তাকিয়ে থাকে। আপন মনে বলে ঃ আমার এতটা ভুল হবে? মেয়েদের ছবি দেখে দেখে চোখ পচে গেল। আমি এ ফ্রলাইনকে খুঁজে পাবই।

আমাকে হাসতে দেখে কিছুটা বিমূঢ় হ'য়ে পড়ে। বিস্ময় ভরা চোখ তুলে বলে ঃ তাজ্জব ক'রলেন আমাকে।

রুডল্ফ-এর পাগলামো দেখে হাসতে হাসতে ঘরে ফিরে আসি।

মজুমদারের দোকানে আড্ডা গেড়েছিলাম পরদিন। ইদানীং সময় হাতে পেলে হামেশাই এনার এখানে আসা-যাওয়া ক'রছি। অতি সুন্দর ব্যবহার, আন্তরিক স্নেহশীলতায় সহজ এক আকর্ষণ আছে। আমি মুগ্ধ। আর উনি আমাকে পেয়ে যেন ধন্য।

একটি প্রসঙ্গ আমাকে বারবার নাড়া দেয়, এই মানুষটি দীর্ঘকাল বিদেশে প'ড়ে রয়েছেন কেন? বহু কথায়, নানা আলোচনায় এটুকু বুঝেছি 'কপাল' বা 'কেরিয়ার'-এর তাগিদে বোম্বের গোয়ানিজ হোটেলের মর্মান্তিক ঝাল তরকারী গলাধঃকরণ ক'রে, জাহাজের খালাসীদের খাতায় নাম লিখিয়ে দূরদেশে পাড়ি জমাবার মত কোনও মুখরোচক ঘটনার ঘটকালি এনার জীবনে ঘটেনি।

ক্যামেরার দোকান দেবার জন্যে এত দূরদেশে আসবার দরকার কি? কলকাতার ধর্মতলাতে এটি তো নির্বিঘ্নে সমাধা হ'তো। গলাবন্ধ কোট প'রে প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়তে আসা, হিন্দু হস্টেল, গারো পাহাড়ে হাতি শিকার, দেশের বাড়ীর জলসাঘর-এ দরবারী-কানাড়া, আর ইংলণ্ডে আইন প'ড়তে যাবার সঙ্গে আজ নিউরেমবার্গে ক্যামেরার

দোকানে টেলি-ফোটো লেন্স-এর খরিদ্দারের সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলার কোন যোগসূত্র খুঁজে পাইনে।

আমি অবশ্য প্রশ্ন ক'রিনি কোনও। মামুলী কথা জানতে চেয়েছি। আগ্রহ প্রকাশ করিনি।

তবে এদেশের মেয়েদের প্রতি মজুমদারের বিশেষ পক্ষপাতিত্ব আমার চোখে প'ড়েছে। হেসে হেসে শোনালেন সেদিন। বললেন : দেখ সেন, মোটর দৌড়, ঘোড় দৌড় বা পিকনিকের আসরে আমেরিকান কোনও মেয়েকে তোমার ভালো লাগবে। আজেবাজে গল্পে সন্ধ্যে কাটানোর পক্ষে ফরাসী বান্ধবীই প্রশস্ত। কিন্তু সংসার, ঘর বাঁধতে চাও যদি তবে জর্মন মেয়েদের তুলনা নেই।

হালকা কথাটি আমি গভীর ভাবে গ্রহণ ক'রেছিলাম। ভুলে গিয়েছিলাম এদেশেরই একটি মেয়েকে তিনি বিয়ে করেছিলেন। তাই দ্রুত জবাব এসেছিল আমার ঠোঁটে। ব'লেছিলাম : বাঙ্গালা দেশের মেয়েরা কি দোষ ক'রলে ? আমার দেশে সংসার নেই ? ঘর সেখানে ক'রছে না ?

কথাটা ব'লেই মনে হয়েছে ভুল ক'রলাম। মজুমদারের মৌনতায় সে ধারণা আমার আরও দৃঢ় হ'লো। আরও বুঝলাম, সামান্য কথার খেই ধ'রে অনেক কথা ব'লতে চেয়েছিলেন। আমার বেফাঁস জবাবে সে প্রসঙ্গ মুহূর্তে ওবার গুটিয়ে গেল। কিছুটা অপ্রতিভ হ'লেন। মাটির দিকে চেয়ে রইলেন অনেকক্ষণ।

লজ্জিত হ'য়েছি। সহজ করবার খাতিরে বলি : তর্ক আমার চরিত্রের এক ব্যসন বলতে পারেন। আমি ঘর গুছোতে চাইনি ! আমার দৃষ্টিকোণ··· ।

বাধা পেলাম। ম্লান হাসলেন। সিগারেট ছাইদানে ডুবিয়ে দিয়ে ধীরে সংযত কণ্ঠে বললেন : মিউনিক দেখলে কেমন ? আবার কোথাও যাবে নাকি ?

অতি সাধারণ কথার জবাব দিতেও আমার কয়েক মুহূর্ত বিলম্ব হ'লো। বললাম : মাসের শেষে বার্লিন যাবার কথা আছে।

কিছুটা যেন সহজ হন মজুমদার। হেসে বললেনঃ এক ঢিলে তিন পাখী মারা, রথ দেখা আর কলা বেচা, সেই সঙ্গে পাঁপড় খাওয়াও চ'লবে তোমার। ঘুরে এসো।

পরিষ্কার হ'লো না কথাগুলো। কৌতূহলের সঙ্গে প্রশ্ন করিঃ কিছুটা সহজ ক'রে বলুন। পাঁপড় আর বাড়তি একটি পাখী সব গোলমাল ক'রে দিচ্ছে।

হো হো ক'রে হেসে উঠলেন মজুমদার। বললেনঃ আমেরিকাতে গেছ তুমি? রাশিয়াতে যাওনি নিশ্চয়ই!

বললামঃ না। কেন বলুন তো?

স্নিগ্ধ হেসে বললেনঃ বার্লিনে তুমি সব পাবে। আমার দেখা বার্লিন অবশ্য তুমি আজ আর পাবে না। আজ তার অন্য চেহারা। নিউইয়র্ক দেখবে একদিকে, আর এক দিকে মস্কো। 'কুরফুরস্টেনডাম' হলো নিউইয়র্ক, আর 'স্ট্যালিন আলী'র সঙ্গে তুলনা চলবে মস্কোর।

ঘড়ি দেখে লাফিয়ে উঠতে হ'লো। একটি সিগারেট হাতে তুলে দিয়ে মজুমদার বলেনঃ কাল সন্ধ্যেতে এসো আমার বাড়ীতে, জমিয়ে গল্প করা যাবে। ডিনার তুমি আমার ওখানেই সারবে।

কিন্তু কোথায় ডিনার! স্যুপ কই? এদিক থেকে ওদিকে ঘুরে আসা কই? ছোট বড় বিচিত্রিত প্লেটকে ঘিরে কাঁটা চামচের মিছিল কোথায়?

এ যেন ডিনার নয়—আহার। মজুমদারের আপ্যায়নে 'হেল্‌ফ্‌ ইওরসেল্‌ফ্‌'-এর বাষ্প মাত্র নেই। সুন্দর বিনয়ে, অতি সুন্দর অনুরোধ যেনঃ এসো, দুটি মুখে দাও।

সুন্দর ফুরফুরে সাদা ভাত। আলু ভাজা, একটু ঘি। মুগের ডাল। আর প্রচুর পরিমাণ মাস্টার্ড্‌-এর ব্যবহারে গা-মাখা গা-মাখা মাছের পাতুরি। মাংসের কোর্মা। বাঁধাকপির টক। পায়েস-এ শেষ।

টেবিলের হাল দেখে হাততালি দিয়ে উঠি। বিস্ময়ে ভেঙ্গে পড়ে বলি ঃ আপনি ক'রেছেন কি ? এত কিছুর ব্যবস্থা করলেন কি ক'রে ?

ভারী খুশি হ'য়ে হেসে উত্তর দিলেন মজুমদার ঃ ব্যবস্থা আর কি। দৈবাৎ কখনও তোমাদের কারো দেখা পেলে বাড়ীতে ধ'রে এনে সামান্য একটু সেলিব্রেট করি। একঘেয়ে খেয়ে খেয়ে হাঁপিয়ে প'ড়েছো। ভাত তোমার নিশ্চয়ই ভালো লাগবে।

জবাবে বলি ঃ আপনি আগে থেকে যদি আমাকে জানান দিতেন, ধুতি পাঞ্জাবী প'রে আসতাম। হাত ডলাডলি না ক'রে নতজানু হ'য়ে প্রণাম করতাম আপনাকে। আপনি আমাকে ঠকিয়েছেন।

অবিমিশ্র এক খুশির হাসিতে সারা পরিবেশ ভরিয়ে তোলেন মজুমদার।

তবু কেমন যেন পেট ভ'রলো তো মুখ ভ'রলো না। মুগের ডালে সাদা জিরের সোম্বার কই ? টকে সর্ষে ভাসে কই ? মাছের পাতুরীতে যে ফালি ফালি কাঁচা মরিচের চিহ্নমাত্র নেই !

এ যেন কেমন কৃপালনীজীর 'শেষের কবিতা'র ইংরেজী অনুবাদ। শেষ অবশ্য হ'লো বটে, তবে কবিতা মোটেই হ'লো না।

তবে ডালেতে ঝোলেতে, এটাতে সেটাতে মৌলিকতার যেটুকু অভাব ছিল, মজুমদারের আন্তরিক ব্যবহার, অতি সুন্দর আপ্যায়নে সেটুকু পূর্ণ হ'লো। রসনা-চয়নে সামান্য যেটুকু চ্যুতি ছিল, সেটুকু অক্লেশে ঢাকা পড়ে গেল টেবিলের রস রচনায়।

এক চামচ পায়েস মুখে তুলে মজুমদার বলেন ঃ আল্লস্ কেমন দেখলে ?

মুহূর্তে বিস্বাদে মুখটি ভ'রে উঠলো। পায়েস-এ মিষ্টি কিন্তু ঠিকই ছিল। কিছুটা আড়ষ্ট জবাব আমার ঃ ভালোই তো ! আল্লস্ বড় সুন্দর !

আমার বিস্বাদে ভরা মুখটা বিস্ময়ে ভ'রে উঠলো তারপর। বিষাদের এক ঘনঘটা চোখে মুখে নেমে আসে মজুমদারের। ম্লান হাসি।

শূন্য প্লেটে আঁচড় কাটা। সুন্দর মুখশ্রী ঘিরে একটি করুণ ব্যথার সুর যেন ছড়িয়ে পড়ে। আমার মুখের ওপর চোখ তুলে বলেনঃ বছর দুই আগে ভিয়েনা থেকে ফেরবার পথে আল্পস্-এর পায়ের তলায় আমার স্ত্রীকে আমি জীবনের মত রেখে এসেছি! আমার আল্পস্ বড় ভালো লাগতো। কিন্তু আজ সেখানে যেতে আমার ভয় করে।

শীতল স্পর্শ অনুভব ক'রলাম সারা দেহে। ঝুঁকে প'ড়ে বলিঃ কোন দুর্ঘটনা।

কথা কেড়ে নিয়ে শুষ্ক মুখে বলেনঃ ঠিক তাই! আমার স্ত্রী পেটের পীড়ায় ভুগছিলেন। এক পরিচিত সার্জন-এর কাছে পরামর্শে গিয়েছিলাম। জানুয়ারী মাস-এর প্রবল ঠাণ্ডা তখন। প্রয়োজনীয় নির্দেশ নিয়ে ফেরবার পথে আল্পস্-এ এলাম বেড়াতে।

অস্ট্রিয়ার মধ্য দিয়ে আল্প্সে দু'দিন কাটিয়ে টিরল হ'য়ে মিউনিকে আসবো এই রকম ঠিক ক'রেছিলাম!

আল্পস্ থেকে ফেরবার পথে মাঝ রাস্তাতে দিনটা কেমন বিগড়ে গেল। ধোঁয়াটে হ'য়ে উঠলো চারদিক। তুষার প'ড়তে সুরু ক'রলো। পথ চিনে চলা মুস্কিল হ'য়ে উঠলো। পিছলে যেতে লাগলো গাড়ীর চাকা।

একটা বাঁকের মুখে গাড়ীটা কয়েকটি পাক খেয়ে গড়াতে গড়াতে একটা কিছুতে আটকে গেল। নিদারুণ কিছু ঘটে গেল বুঝলাম। জ্ঞান হারালাম সঙ্গে সঙ্গে।

কতক্ষণ এভাবে ছিলাম জানি না। কিসের স্পর্শে আমার চেতনা ফিরে এলো। চোখ খুলে দেখি অন্ধকার নেমেছে চারদিকে। অবিরাম তুষার প'ড়ছে তখন। আমার কোটের আস্তিন ধ'রে ডানদিকে কে যেন আমাকে টানছে। অসহ্য যন্ত্রনায় সারা দেহ অবশ। সামান্য রকম নড়বার ক্ষমতা আমি হারিয়েছি। অতি কষ্টে ঘুরে দেখি একটি বিরাট 'সেণ্ট বার্ণাড' আমার কোটের আস্তিন ধ'রে নাড়া দিচ্ছে। আল্পস্-এ মানুষের একমাত্র বন্ধু।

কুকুরটার গলায় কি যেন একটা বাঁধা। বুঝলাম মদ। অতিকষ্টে বোতাম খুলে সেটি হাতে নিলাম। মুহূর্তে অদৃশ্য হ'য়ে গেল কুকুরটা। তার উদ্‌ভ্রান্ত চীৎকার ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল।

নিজে খেলাম কিছুটা। প্রচণ্ড যন্ত্রণায় দেহ অবশ। পাশ ফিরতে গিয়ে বুঝলাম আমার কোট রক্তে ভিজে গেছে। পাঁজরগুলো বামদিক থেকে যেন আর্ত্তনাদ ক'রে উঠলো।

অন্ধকার! নিজের হাত ভালো ক'রে দেখা যায় না। আমার স্ত্রীর কোন সাড়াশব্দ নেই। বাম হাত সরানোর উপায় নেই। ডান হাতে অতিকষ্টে নাড়া দিলাম। কিছুটা ঝুঁকে আমার সামনে এসে প'ড়লো। দেহে কোন সাড় নেই। নিজের সমস্ত শক্তি সংহত ক'রে একবার শুধু চীৎকার করি।

অল্পক্ষণ পরে আবার কুকুরের ডাক কানে এলো। উদ্‌গ্রীব হ'য়ে বাইরের অন্ধকারের দিকে ফিরে তাকাই। শুধু একটি নয়, অনেকগুলো কুকুরের চীৎকার।

কুকুরের পেছনে মানুষ। উদ্ধারকারী দলকে ডেকে আনছে সেণ্ট বার্ণাড। বহু জোরালো টর্চের তীব্র আলোতে চারদিক উদ্ভাসিত হ'য়ে পড়ে।

আমার স্ত্রী প্রাণ হারিয়েছিলেন আগেই। আশ্চর্য! বাইরে সামান্য কোনও আঘাতের কিন্তু প্রকাশ ছিল না। হাসপাতালে যেতে হ'লো আমাকে। পাঁজরের তিনটি হাড় আর বাম হাতের কব্জি ঠিক হ'তে পুরো তিনমাস লাগলো। তারপর বাড়ী ফিরে এলাম।

প্রথমে মনে হ'য়েছিল পারবো না। পারবো না একা থাকতে। মাথাটা খালি। নিলামের হাটে নিজেকে ফুরিয়েছি নিঃশেষ ক'রে। দিনের বেলাতেও অন্ধকার ঘরের মধ্যে চুপচাপ ব'সে থাকতাম।

সময় আর সময়। সময়ই মনকে শাসনে আনে। আজ আমার এলার্জি হ'লে ডাক্তার দেখাই। সামান্য জ্বরে ওষুধের স্তূপে ভরে ওঠে আমার টেবিল।

নৈরাশ্যের এক শূন্য হাসিতে নীরব ঘরটি ভরিয়ে তোলেন মজুমদার।

খাবার টেবিল ছেড়ে সোফায় ফিরে আসি। একটি সিগারেট ধরিয়ে বলি ঃ দেশে ফিরে যেতে ইচ্ছে হয় না আপনার ?

বেশ কিছুক্ষণ পর জবাব এলো ঃ না! চেষ্টা ক'রেছিলাম, পারিনি।

জবাবে আমি বিস্মিত হ'য়েছি। নিজের অজ্ঞাতেই প্রশ্ন ক'রেছি ঃ বাধা কিসের ?

স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন কিছুক্ষণ সোফায় এসে বসলেন। তারপর। বাম হাতের তালু নিরীক্ষণ ক'রতে ক'রতে জবাবদিহির সুরে বললেন ঃ সে অনেক কথা সেন! সে দীর্ঘ কাহিনী তোমার হয়তো ভালো লাগবে না। এসব কথানা তুললেই আমার ভালো লাগবে।

মজুমদারের কণ্ঠে প্রাণশক্তির অজস্রতা একেবারে নিঃস্ব হ'য়ে গেল। শূন্য দৃষ্টি। শুষ্ক মুখে একটি বিষণ্ণ কঠিনতা ফুটে ওঠে।

মানসিক এক ক্লান্তি নিয়ে বাড়ী ফিরলাম সে রাত্রে। বিছানায় এপাশ-ওপাশ ক'রলাম। ঘুম আসে না। বারান্দায় এসে বসি। একটার পর একটা সিগারেট ফুরিয়ে গেল। তবু মজুমদারের রিক্ত হাসির অনুরণন আমার কান থেকে গেল না। প্রচ্ছন্ন অভিমানের যেন এক সুর শুনেছি কথাতে। বিষণ্ণ এক ক্ষোভ দেখেছি ঠোঁটের কোনের হাসিতে।

রাত গভীর। মুখর শহর নীরব। হিমেল আঁধারে কুয়াশার ওড়নায় নীয়ন আলো অব্যক্ত। নিলীয়মান গির্জার মাথা পেরিয়ে দূরের আকাশে চাঁদ অনভিব্যক্ত।

চিঠি লিখতে ব'সেছিলাম।

এ কাজ ঠিক আমার আসে না। বিশেষ ক'রে আমার ছোট বোন মিনাকে ছু'কলম চিঠি লিখতেও হিমশিম খেতে হয়। মিনার লেখা চিঠি আমার হাতের কাছেই আছে। একথা সেকথার পর লিখেছে : শ্রীহীন চেহারা নিয়ে তামাশা করাটা ভাল্‌গ্যার্‌, কারণ সে বেচারীর নিজের কোন হাত নেই। কিন্তু তোমার মর্মান্তিক হাতের লেখা আমাকে পীড়ন করে, বিস্মিত করে, উদ্বিগ্ন করে আমাকে। ভবিষ্যৎ তুমি ভেবে দেখেছো ? মুদির দোকানের লাল খেরো খাতায় হিসেব লেখা হয়তো চলে, কিন্তু তোমার হাতের লেখা যে কোন শ্রেষ্ঠ রোম্যান্টিক বয়ানকে প্যাথেটিক্‌ ক'রে তুলতে পারে সহজেই।

সুতপাকে চেন তুমি ? চেন নিশ্চয়ই। ক'বছর আগেও যার বাবার চোখে ধূলো দিয়ে 'এভোগ্যাডরোর হাইপথেসিস্‌' বুঝিয়ে দিয়ে আসতে। 'চালর্স ল' বোঝানোর তাগিদে সপ্তাহ ধ'রে সিচুয়েশন তৈরী ক'রতে—সেই সুতপা। আমাকে লেখা তোমার চিঠি প'ড়তে দিলাম, বেচারী চেষ্টা ক'রেছিল, পারেনি।

চিঠিটি হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বললে : তোমার দাদা কি কর্‌পোরেশন্‌ স্কুলে প'ড়েছিলেন ?

তোমার চিঠিতে একটি নতুন শব্দ পেলাম—'জালানা'। আমাকে বুঝতে হ'লো তুমি লিখতে চেয়েছো 'জানালা'। তোমার 'ভুল' বানান ভুল। ধ্বনিগত মিল থাকলেও ভুলের সঙ্গে শূলের ফারাক তোমার জানা দরকার, ইত্যাদি।

তাই আলগা কাগজে খসড়া ক'রে মিনাকেই লিখতে ব'সলাম প্রথমে।

কিন্তু লেখা হ'লো না। ফোন এলো। অপর প্রান্ত থেকে গলা পেলাম রুডল্‌ফ্‌-এর। কিছুটা উদ্বিগ্ন কণ্ঠ! অসংলগ্ন একটানা কথা। অপ্রস্তুত'ও যেন কিছুটা। বলেঃ হের জেন, আমি সে ফ্রলাইন-এর সাক্ষাৎ পেয়েছি। দোকানে সওদা ক'রতে গিয়ে 'রোলট্রেপে'র ডগায় ওনাকে দেখে দৌড়ে গেলাম। প্রসাধনের দোকানে সওদা করবার ছুতোতে ওনাকে অনুসরণ ক'রে ঠিক পাশে এসে দাঁড়ালাম। ঝুঁকে প'ড়ে কনুইতে সামন্য আঘাত ক'রলাম ইচ্ছে ক'রে।

এতে কাজ হ'লো। আলাপ হ'লো। দু'চার কথার পর আপনার কথা বললাম। ভদ্রমহিলা আপনাকে চিনলেন না। আপনার সঙ্গে সামান্য পরিচয় তো দূরের কথা, আপনার নামও উনি কোন কালে শোনেন নি। আমার অবস্থাটা ভাবুন একবার।

...আপনি ওনার নাম ব'লেছেন মন্দোদরী, কিন্তু উনি প্রচণ্ড চ'টে গেলেন মনে হ'লো। অন্য একটা নাম ব'ললেন, সে নামটা এখন আর আমার মনে নেই।

আপনার সম্পর্কে নানান প্রশ্ন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা ক'রলেন। যেটুকু আমার জানা আছে ব'ললাম। কিন্তু আমার ভয় হ'চ্ছে, আপনাকে না বিপদে ফেলেন। আপনার ঠিকানা উনি নিয়েছেন। কিন্তু আমার কি দোষ ব'লুন তো? আমার দেখা মেয়েটির ছবিই যে আপনার ব্যাগে ভরা আছে তাতে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। এতটা ভুল আমার হবে?

আমার উদ্বিগ্ন কণ্ঠঃ তারপর?

জবাব এলো রুডল্‌ফ্‌-এর। বলেঃ তারপর আর কি! অল্পেই হয়তো মিটে যেতে পারতো, কিন্তু যখন দেখলাম কিছুতেই উনি আপনাকে চিনতে চাইছেন না, তখন আপনার সঙ্গে ওনার আসল সম্পর্কের কথাটি পাড়লাম। ব্যস, ক্ষেপে আগুন। একদম বদলে গেলেন। অন্য রকম ব্যবহার ক'রলেন আমার সঙ্গে। পালিয়েই আসছিলাম, এক রকম আদেশের সুরে আপনার ঠিকানা চেয়ে বসলেন।

ওটা দিয়েই ভুল ক'রলাম, কি ব'লেন? আপনার কোন বিপদ আপদ হবে না তো হের জেন?

হাসি পেলো। অপরপ্রান্ত থেকে ব্যথিত কণ্ঠ ভেসে এলো: আপনি হাসছেন?

বললাম: দেখুন, না হেসে আমি থাকতে পারছি না। আপনার সম্পূর্ণ ভুল। শাড়ী আর কালো চুল আপনাকে ঠকিয়েছে। তবে আপনার দোষ নেই, সব চীনে মেয়েদেরই আমার একরকম লাগে। ঠিকানা দিয়েছেন দিয়েছেন। আমার এখানে হামলা ক'রতে এলে আমি বুঝবো।

অপ্রস্তুত রুডল্‌ফ্‌ বলে: মাথাটা আমার খালি হ'য়ে গেছে একদম। এতবড় আহাম্মকের কাজ জীবনে কখনও করিনি।

রিসিভার নামিয়ে রেখে এক চোট হেসে নিলাম। বিদেশে এসে আমার দেশের কোন মেয়েকে আমার খাতিরে বিব্রত হ'তে দেখে সঙ্কুচিত হ'লামও কিছুটা।

দিন দুই পর কাজ সেরে ফিরছিলাম। দোতলার করিডোরে পাঙসিওনের গৃহকর্ত্রীর সঙ্গে দেখা হ'লো। তার মুখে খবর পেলাম এক ভারতীয় ভদ্রমহিলা আমার সঙ্গে দেখা ক'রতে চান। ওনার ঘরে অপেক্ষায় আছেন। জানতে চাইলেন আমার কামরায় তাঁকে পাঠিয়ে দেবেন কিনা।

রুডল্‌ফ্‌-এর ফোনের কথা মনে প'ড়লো। অজানা ভয়ে বুকটা কেমন দুলে উঠলো। একটি শীতল স্পর্শ অনুভব ক'রলাম শিরদাঁড়ায়। অবশ্য মুহূর্তে সে ভাব কাটিয়ে উঠলাম। অতি সহজ কণ্ঠে বলি: অশেষ ধন্যবাদ আপনাকে! আমার কামরাতে আসতে বলুন।

ঘরে এসে ঢুকলাম। সিগারেট একটা ধরিয়ে নিয়ে পায়চারী ক'রলাম কিছুক্ষণ। বাসি কাগজ বিছানার ওপর ফরফর ক'রে উড়ছিলো, সেগুলো গুছিয়ে টেবিলে রাখলাম। পাজামা একটা প'ড়েছিল চেয়ারে। ঠিক জায়গায় সেটি নিয়ে রাখি। আকাশ-পাতাল

ভাবতে থাকি। রুডল্ফ্-এর আহাম্মকির জন্যে রাগও হ'লো। শাড়ী পরা ভারতীয় মেয়ে? বাঙ্গালী, পাঞ্জাবী না মারাঠী?

এমন সময় দরজায় টোকা প'ড়লো। পর্দ্দার ফাঁক দিয়ে সাদা শাড়ীর আঁচল নজরে এলো। অতি স্বাভাবিক কণ্ঠে ভেতরে আহ্বান ক'রে এগিয়ে এলাম দরজার দিকে।

জীবনে কতবার আমি অবাক হ'য়েছি জানি না, কিন্তু এমন ঘটনা আমার জীবনে ঘটেছে ব'লে মনে হ'লো না।

অপরিচিতাকে দেখে চমকে উঠলাম। ভূত দেখলাম যেন। সিগারেট কেসটি হাত থেকে খসে প'ড়লো। অস্ফুট এক বিস্ময়োক্তি ঝ'রে প'ড়লো ঠোঁট থেকে। পায়ের তলার কার্পেট দুলছে। দৃষ্টিতে দুরন্ত এক বিভ্রান্তি আচ্ছন্ন ক'রে ফেলে। এ আমি কাকে দেখছি! স্বপ্ন দেখছি নাকি!!

একেবারে তৈরী হ'য়েই এসেছেন। মনে মনে যুদ্ধ সাজ প'রেই। আমার মুখে কথা নেই। ব'সতে ব'লতেও ভুলে গেলাম।

কণ্ঠে কিছুমাত্র জড়িমা নেই। কণামাত্র দ্বিধা নেই। আমার আপাদমস্তক এক নজর দেখে নিলেন। পর মুহূর্তেই অপরিচিতার খাড়াই প্রশ্ন আমার কানে এলো। বললেনঃ আপনার নাম মিঃ সেন?

আমার ঠোঁটে ভাষা নেই। জবাব এলো না কণ্ঠে। বিস্ময়ের ঘোর আমার কাটেনি তখনও। স্তব্ধ হ'য়ে অপলক দৃষ্টিতে শুধু তাকিয়ে থাকি। এ কি ক'রে সম্ভব! ফোটো কি কখনও কথা বলে?

আবার সেই কণ্ঠ। তির্যক কথা বলা। আমার চোখে চোখ রেখেই ব'ললেনঃ আপনি আমার নামে বদনাম ক'রছেন কেন? কি ব'লেছেন বাইরে?

তৈরী হ'য়ে নিলাম। এখনও মুখ না খোলা বোকামো হবে। হেসে সম্পূর্ণ উড়িয়েই দিতে চাইলাম। বললামঃ বুঝেছি, আমার বন্ধু রুডল্ফ্ আপনাকে ব'লেছে তো? তার ফোন আমি পেয়েছি। সে

অনুতপ্ত হ'য়েছে। মাথার কালো চুল আর শাড়ী তাকে বিভ্রান্তিতে ফেলেছে। আপনাকে অপ্রস্তুতের এক শেষ হ'তে হ'য়েছে। তার হ'য়ে আমি ক্ষমা চাইবো আপনার কাছে। দোষ তার নয়, এতে কোন হাতই ছিল না আমার। সামান্য এক ভুল এই বিভ্রান্তির সৃষ্টি ক'রেছে। আপনি দাঁড়িয়ে কেন? বসুন!

বসবার কোনও আগ্রহ দেখলাম না অপরিচিতার। আমার কথাতেও খুব একটা কাজ হ'লো ব'লে মনে হ'লো না। সেই তাকানো। দেহবিভ্রমে তির্যক এক ভঙ্গি। কণ্ঠস্বরে নিচুপর্দ্দার বিন্দু-মাত্র আভাস নেই। ব'ললেন: আপনার বন্ধুর ভুলের ঘাড়ে দায়িত্ব চাপাচ্ছেন, এ সম্পর্কে আমার কিছু বলবার নেই। তবে একটি সিলি-রিকোয়েস্ট্ করবো আপনাকে। নির্ভুল সেই ছবিটি দেখতে পারি?

এখন উপায়! কি ব'লবো! ক'রবো কি! বেলুনের মত চুপসে গেলাম। ড্রয়ারের হাতল টানি। বালিশের তলা হাতড়াই। ব্যস্ততার সঙ্গে এটা দেখি, ওটা খুলি।

শীতল এক পাতলা হাসি কানে এলো। চাপা এক বিদ্রূপের আভাস পেলাম কণ্ঠে। বললেন: আপনি ফাম্বল ক'রছেন। ব্যাগটি বোধ হয় আপনার পকেটে আছে। ছবিটি তাতেই তো ভরা থাকে জানি।

মারাত্মক এক বাঁকের মুখে গাড়ির একটা চাকা যেন বেরিয়ে গেল। কিসের স্টিয়ারিং! কোথায় ব্রেক! সম্পূর্ণ হাতের বাইরে। প্রচণ্ড এক খাদের সামনে আমি যেন দুর্বার গতিতে এসে আছড়ে পড়লাম।

জবাবে কি ব'লেছিলাম জানি না। তবে কাল বিলম্ব না ক'রে ব্যাগ খুলে ছবিটি হাতে তুলে দিলাম।

অপরিচিতার চোখে মুখে বিদ্রূপের রেশটুকু বিস্ময়ের মাঝদরিয়ার প্রচণ্ড জলোচ্ছ্বাসে বিলীন হ'য়ে গেল। অস্ফুট এক কাতরোক্তি ঠোঁট থেকে ঝরে প'ড়লো।

আর আমি তো ভেসে গেছিই। তৃণখণ্ড আঁকড়ে ধরা বৃথা। সোফার হাতল ধ'রে ঘামতে থাকি।

বাঘা বাঘা ঝুঁদে টেক্‌নিক্যাল আর অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেটিভ্‌ অফিসারের অজস্র প্রশ্নবাণের অতি সুন্দর মহড়া নিয়েছি বহুবার। বিপদজনক অস্ত্রোপচারের দিনে আমি মায়ের পাশেই ছিলাম এই সেদিন। কই বুকতো এভাবে দোলেনি। তালু তো শুকিয়ে ওঠেনি। কিন্তু আজ পায়ের তলা শির শির ক'রছে কেন? মাথাটা ঝিম ঝিম ক'রছে কিসে?

এবার যেন কণ্ঠ নয়—গলা। প্রশ্ন নয়—এক্‌স্‌প্ল্যানেশন্‌। ধীরে কিছুটা টিপে টিপে কথা বলা। ব'ললেন: এ ছবি আপনি পেলেন কোথায়? এটাকেও কি ভুল ব'লবেন আপনি?

মরিয়া হ'য়ে গেছি আমিও। সম্পূর্ণ বেপরোয়া। বললাম: আপনি কিন্তু এখনও বসলেন না।

চোখে মুখে যেন ঝিলিক খেলে গেল আমার কথায়। ঝিলমিল ক'রে উঠলো কানের ঝুমকো। অচঞ্চল দৃষ্টি মেলে বললেন: আপনার সঙ্গে নাটক ক'রতে বসিনি আমি।

সহজ হাসি ঠোঁটে টেনে বলি: নাটক হয়তো হয়নি। কিন্তু নাটুকে নাটুকে গন্ধ পেলাম। তবে সেটার সুরু এখানে নয়, বহুদূরে। আপনার বাড়ীর চায়ের টেবিল থেকে নয়, পর্দা উঠেছে ভোলা দত্তের প্রেস থেকে। দর্শকের চেয়ার থেকে প্রথম দৃশ্যের সে পটভূমি হয়তো খুব নয়নাভিরাম নয়, কিন্তু শেষ দৃশ্যের শেষের দিকে আপনি সব মাটি ক'রতে ব'সেছেন।

অপরিচিতার ভ্রূলতায় ঝড়ের সংকেত নেমে আসে। বললেন: নয়নানন্দের খাতিরে আপনার এখানে আমার আসা নয়, সেটি আপনার জানা দরকার।

জবাবে বললাম: সে আভাস আপনার নয়নের ঈশান কোণেই স্থির হ'য়ে আছে। তবে প্রতিবাদের বর্শা উঁচিয়ে এভাবে আপনার

এসে পড়াটা কি ঠিক? আপনার ধৈর্য কম। সব কথা যদি আপনি শুনতে চান, তাহ'লে আমি ব'লতে রাজি আছি। আমি ব'লবো সবটাই ভুল। কি ধর্মে আপনার বিশ্বাস আছে জানি না, তবে যে কোন কুলগুরুর হাঁটু জাপটে শপথ ক'রতে পারি, সত্য বই মিথ্যা বলিব না। ভুল, হ্যাঁ ভুলই তো। তবে আমার নয়, আপনার তো নয়-ই। ভুল হ'য়েছে ভোলায়। সে পাপিষ্ঠ তার বউবাজারের চেয়ারে ব'সে এটি নির্বিঘ্নে সমাধা ক'রেছে। ভ্রান্তির সুরু বিষুবরেখার ওপারে। নিউরেমবার্গ-এ নয়, কলকাতায়। এখানে বসে সে ভুল আমার হাতে গড়া হয়নি। পকেটের ব্যাগও আমার কিছুমাত্র দোষ করেনি।

অপরিচিতার চোখদুটি জ্বলজ্বল ক'রে উঠলো। তেজালো কণ্ঠে বললেন: কি মহৎ উদ্দেশ্যে আপনি এদেশে এসেছেন জানি না, কিন্তু আলিপুরের বার লাইব্রেরীতে আপনার জায়গা ছিল। ভোলানাথ নিয়ে আপনি থাকুন। সিদ্ধি খেয়ে গায়ে ছাই মাখুন। কিন্তু আমার বাড়ীর উঠোনে এসে নন্দীর মত নাচতে সুরু ক'রলে, ভৃঙ্গীর মত দাঁত খিচোলে আমি আপত্তি ক'রবো না ব'লতে চান? এ সব আপনি কি লিখেছেন? আমার নাম মন্দোদরী দেবী? দৈত্যকুলের সঙ্গে আপনার সহজ এক মিতালী থাকে, থাকুক। অশোক বনের গ্রেটা গার্বোর সঙ্গে আপনি কোর্টশিপ ক'রতে পারেন স্বচ্ছন্দে। তবে আমার ছবি নিয়ে যাচ্ছেতাই সব ব'লে বেড়াবেন আর আমি সহ্য ক'রবো? নাম দিয়েছেন মন্দোদরী দেবী। আমার নতুন নামকরণের অধিকার আপনাকে দিয়েছে কে?

ভূপতিত চতুর মুষ্টিযোদ্ধা রেফারীর তর্জনীর সামনে ইচ্ছে ক'রে কিছু দম নিয়ে অনিবার্য মুহূর্তে যেমন উঠে দাঁড়ায়, ঠিক তেমনি আমি কিছুক্ষণ সময় নিলাম। ব'ললাম: দেখুন, আপনার আসল নাম জানবার আমার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই। আগ্রহ তো নেই-ই। অ্যাগ্রিগেটের ফেরে প'ড়ে গ্রেস মার্কের পেছনে ছুটবে ইতরজনে। মন্দোদরী ফেলে সুলোচনা বা সুনয়নী আমি দিতে পারতাম স্বচ্ছন্দে,

কিন্তু সেটা বাহুল্য হ'তো। 'সু' বর্জিত নামই আমার পছন্দ হ'লো। আপনি হয়তো ছবি আঁকতে জানেন না, তাই কনট্রাস্ট্ সম্পর্কে আপনার কোন ধারণাই নেই। বাগদাদের সুন্দরী বেগমের পাশে হাবসী খোজার একটি আলাদা এ্যাপিল আছে। আমার নামটা কি এমন দোষ ক'রলে বুঝি না। সব সব গন্ধ অবশ্য নেই। লঙ্কায় আর যাই থাক সুবারী ছিল না। নামটি অতিমাত্রায় মৌলিক। পুরোমাত্রায় অ্যারিস্টক্র্যাট্। ছবিটি আমার যখন হাতে এলো, এই নাম দেওয়া নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ ভেবেছিলাম। কি অবস্থায়, কার ফেরে প'ড়ে রবি ঠাকুর 'নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ' লিখেছিলেন জানি না…।

আমাকে বাধা দিয়ে মাথা নেড়ে বললেন: আপনাকে জানতে হবে না, থামুন।

বললাম: না না আমাকে ব'লতে দিন। পদার্থ বিজ্ঞানের ছাত্র আমি, তবে রস বিজ্ঞানে অপদার্থ। কবিতা আমার আসে না। আনাড়ী রেডিওলজিস্ট্-এর আসল গলদ বুঝি কিন্তু গোলাম আলীর 'আড়ানায়' 'কানে কুণ্ডলয়া' বুঝি না। কয়েলের তার খুলে খুলে যাওয়া যেমন সহজে ধরতে পারি, 'বাজুবন্ধ খুলু খুলু যায়' ঠিক ধাতস্থ ক'রতে পারি না। তবু অমৌলিক আমি মৌলিক এক কাজ ক'রে ব'সলাম। আপনার নাম ক্ল্যাসিক থেকেই পেড়ে নিলাম।

—ক্ল্যাসিক থেকেই পেড়ে নিলেন? নাম আর আপনি খুঁজে পেলেন না?

হেসে বলি: খুঁজে তো পেলামই। রবি ঠাকুরের নাম খগেন দত্ত হ'লে ব'লতে পারেন কি ক্ষতি হতো? 'সি মজুমদার'-এর দোকানে শাড়ীর পাড় বা ব্লাউজের মারাত্মক ছাঁট বাছাবাছির কিছু মানে বুঝি, কিন্তু নাম বাছাবাছি নিয়ে মারামারির কোন অর্থ বুঝি না। শুধু আপনি কেন, আমার জ্যাঠামশাইকেই ধরুন…

আমাকে বাধা দিয়ে ব'ললেন: আপনি থামবেন! ধ'রতে আমি আপনাকেই এসেছি। আপনার বক্তৃতা শুনতে নয়।

অপ্রাসঙ্গিক কথা তুলে আপনি আসল বক্তব্য থেকে দূরে স'রে যেতে চাইছেন।

হেসে বলি : প্রাসঙ্গিক কথাটা আর কি? কি ব'লবেন আপনি?

গ্রীবা নেড়ে বললেন : কি ব'লতে চাইছি আপনি জানেন না? আপনার ব্যাগে আমার ছবি গেল কি ক'রে সে কথা আপনি আমাকে এখনও বললেন না।

সহজ হেসে বলি : আপনি কিন্তু এখনও ব'সলেন না।

কিন্তু আমার চেষ্টা বৃথা। অবিশ্বাসের দৃষ্টি চোখে লেগেই রইলো। বললেন : ব'সতে আসিনি। আপনার বক্তব্য আপনি শেষ করুন। আমার হাতে সময় কম। এ ছবি আপনি পেলেন কোথায়?

বললাম : ভোলা আমাকে পাঠিয়েছে।

দ্রুত প্রশ্ন এলো : মহাপুরুষটি কে?

এবার যেন কিছুটা ধরতাই পেলাম। ব'ললাম : ভোলা আমার বন্ধু। এদেশে এসে নানা কথার শেষে আমার নতুন বিপদের কথা প্রসঙ্গক্রমে জানিয়েছিলাম তাকে। ফেরৎ ডাকে তার যে জবাব পেলাম সেই খামেই আপনার ছবিটি আমার হাতে এলো। আমার স্মরণশক্তি খুব খারাপ নয়। ভোলার চিঠির বয়ান আমার স্পষ্ট মনে আছে। ভোলা লিখেছিলো :

তোমার প্রতি একটি বিশেষ ধরণের কৌতূহল, ইচ্ছা বা আগ্রহকে সমূলে বিনাশ ক'রবার দাওয়াই আমি সঙ্গে পাঠালাম। এই ছবিটি তুমি যত্রতত্র দেখিয়ে বেড়াতে পার। লাগসই যে কোনও কথা প্রয়োজন হ'লে ব'লে যাবে। এতে অযথা সময় নষ্ট হবে না। অর্থপূর্ণ অলস প্রসঙ্গ উঠবে না। তোমার সাথে এক টেবিলে ব'সে কফি গেলবার তৃষ্ণা, এ ছবি দেখলে যে কোন বেহিসাবী ললনার বিতৃষ্ণায় ভ'রে উঠবে। অপেরায় সে পিছু নেবে না। সিনেমার দু'খানা টিকিট সে কিনে আনবে না। সামান্য এই ছবিটি তোমার হবে দুরন্ত হাতিয়ার।

এটা তুমি পরীক্ষা ক'রেই দেখো, দেখবে স্ট্রেপটোমাইসীনের মত কাজ ক'রবে।

একটু থেমে আবার ব'ললাম ঃ এই ভাবেই আপনার ছবি আমার হাতে আসে। বাকিটুকু আপনার জানা আছে। তার জের এখনও আপনি নিজেই টেনে চ'লেছেন।

অপরিচিতা বিস্ময়ের সুরে বলেন ঃ কিন্তু আপনার বন্ধুই বা আমার ছবি পেলেন কোথায় ? এ সব কথা আপনি আমাকে বিশ্বাস ক'রতে বলেন ?

কৃত্রিম রোষের আভাস প্রকাশ করি। বলি ঃ বিশ্বাস করা না করা সম্পূর্ণ আপনার ইচ্ছা। আমার এখ্‌তিয়ারের বাইরে। ভোলাই বা আপনার ছবি পেলো কোথায়, সে তথ্য এই মুহূর্তে আমার পক্ষে বলা কঠিন। আপনার প্রয়োজন থাকলে সে সংবাদ আমি ফেরৎ ডাকেই আনিয়ে নিতে পারি।

সারা মুখে অবিশ্বাসের হাসি ভরিয়ে তোলেন অপরিচিতা। ব'ললেন ঃ আপনি দেখছি গল্প ফেঁদে বসলেন। এদেশের রাধিকারা আপনার সঙ্গে প্রেম করবার জন্যে কাফে আর রেস্তরাঁ আলো করে বসে আছে, এসব কথা আপনি কাকে শোনাচ্ছেন ? নিজেকে আপনি কি ভাবেন বলুন তো ?

—আপনার হাতে সময় কম ব'লেছিলেন।

—হ্যাঁ, সময় আমার কমই। আপনার সঙ্গে বাজে কথায় সময় নষ্ট করবার সময় আমার নেই। তবে যাবার আগে একটি কথা আপনাকে আমি ব'লে যেতে চাই, আপনার তরফ থেকে ভবিষ্যতে কখনও যদি কোনও কথা আমার কানে আসে আমি আপনাকে ছাড়বো না।

জবাবে হেসে বললাম ঃ আমি ধরলে তো। আপনি আমাকে যাচ্ছেতাই সব কথা শোনালেন। চেড়ীদের সঙ্গে কোর্টশিপ ক'রতে ব'ললেন অশোক বনে। নন্দী-ভৃঙ্গির সঙ্গে তুলনা ক'রলেন আমাকে।

তাতে আমার খারাপ লাগেনি। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, আপনাকে দেখে সবাই যে ছুটোছুটি সুরু ক'রবে, ধরবার জন্যে পাগল হবে এ ধারণা আপনার হ'লো কেন? নিজের সম্পর্কে উচ্চ ধারনা থাকা ভালো, তাই ব'লে অপরকে তুচ্ছ ক'রে গাছের মগডালে ব'সে ডানা ঝাপটানোর মধ্যে কিছুমাত্র বাহাদুরী নেই।

অপরিচিতা রোষে ফেটে প'ড়লেন। বললেন: আপনার সাহস তো কম নয়?

হেসে বললাম: তাতে ক্ষতি নেই। ওটির ওপর কারো ব্যক্তিগত মালিকানা নেই। সাহস কি দোষের? দুঃসাহসটাই বাড়াবাড়ি। মাপ ক'রবেন, অযথা সময় হয়তো আপনার নষ্ট হচ্ছে। আজে-বাজে কথায় সময় নষ্ট করলে আপনার চ'লবে কেন? সবার শেষে এটুকু আমাকে স্বীকার অবশ্য ক'রতেই হবে, আপনাকে অযথা বিব্রত ক'রেছি। অপ্রস্তুত ক'রেছি আপনাকে। আপনি আমাকে ক্ষমা ক'রবেন।

আর অপেক্ষা নয়। অপরিচিতা ঘুরে দাঁড়ালেন দরজার দিকে। ছবিটি ব্যাগে পুরে নিলেন মুহূর্তে। কিছুমাত্র সৌজন্য বোধের প্রয়োজন যেন নেই। কিছুটা সঙ্কুচিত প্রশ্ন আমার: আপনি চ'লে যাচ্ছেন? সামান্য ভদ্রতা করবার সুযোগ কিন্তু আপনি দিলেন না। এক পেয়ালা কফি—

—প্রয়োজন নেই।

—অন্য কোনও কিছু?

শুষ্ক হেসে ব'ললেন: আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ।

পর্দা সরিয়ে ঘর ছেড়ে আমিও বেরিয়ে আসি। সিড়িতে ওনার পা প'ড়লো। আমি আছি পেছনে। কিছুটা মাথা চুলকে বলি: আপনার নেই, কিন্তু আমার হাতে সময় আছে। আপনার আস্তানা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে পারি স্বচ্ছন্দে।

ঘুরে দাঁড়ালেন। মৃদু হাসি ঠোঁটে ভেঙে পড়ে। আপাদমস্তক

একবার দৃষ্টি বুলিয়ে ব'ললেন: আস্তানা পর্যন্ত এগিয়ে দেবার লোকের অভাব কি আপনার? কিন্তু সারা পথ কানের কাছে কথার ক্যানেস্তারা পিটলে আমার ভালো লাগবে না।

বাঁ হাতের তালু নিরীক্ষণ ক'রে বলি: আপনার আপত্তি থাকলে...

বাধা দিয়ে ব'ললেন: আপত্তি নয়, বিপত্তির ভয় পাই। বহু বালা আপনি দেখেছেন ব'লে মনে হ'লো, সে কথা জানেন ভালো আপনি-ই। কিন্তু সবাইকে অবলা মনে করলে আপনাকে ঠকতে হবে।

হেসে ফেললাম। বললাম: পাগল হ'য়েছেন আপনি, অবলা ব'লবো আপনাকে? আপনি দস্তুর মত সবলা।

তির্যক এক চাউনী মেলে ধ'রলেন আমার মুখে। টিপে টিপে ব'ললেন শেষে: হ্যাঁ, কিছুটা বেশী মাত্রায়।

তরতর ক'রে সিঁড়ি বেয়ে বাঁকের মুখে অদৃশ্য হ'য়ে গেলেন তারপর।

ঘরে ফিরে এসে কাগজ কলম টেনে নিয়ে লিখতে ব'সলাম ভোলাকে।

ফেরৎ ডাকেই সে চিঠির জবাব এলো। একথা সেকথার পর ভোলা লিখেছে

...কাগজের অফিসে ছবি আসা দোষের নয়। ডাক আসছে অহরহ, ছবি ছাপতে আসে অগুণতি। তোমাকে আমি যে ছবিটি পাঠিয়েছিলাম, সেটির কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে। পুরোনো কাগজ দেখে সে ধারণা আমার দৃঢ় হ'লো। মেয়েটির নাম অমলিনা রয়। য়ুনিভার্সিটির বিপদজনক ইতিহাসের ছাত্রী। চেহারাটি আমার ভালো লেগেছিল। তাই ব্লকের কাজ শেষ হ'লে কাজে আসবে মনে ক'রে ছবিটি তোমার কাছে পাঠাই। যে কারনে বহু ছবি আমার

হাতে যাওয়া আসা করে, সেই নিয়মেই এ ছবিটি আমার হাতে এসেছিল।

যাক, ভালোয় ভালোয় অল্পের ওপর দিয়ে ফাঁড়া কেটেছে জেনে নিশ্চিন্ত হ'লাম। তোমার চিঠি পাবার পর কিছু খোঁজ পত্তর করে আমার আক্কেল গুড়ুম হ'য়ে গেল। মেয়েটি যাচ্ছেতাই রকমের বড়লোক। ওর এক ভাই ভারত সরকারের কোন চাকরীতে টোকিওতে আছেন। আর এক ভাই দিল্লীতে যে টেবিলে ব'সে কাজ করেন, ক্যাবিনেটের খোদ কর্ত্তাদের সই-টই সেখানে নাকি হামেশাই দেখা যায়।

তোমাকে শায়েস্তা করবার ইচ্ছে থাকলে তাড়া ক'রে আন্ত্যনেয়র পর্যন্ত ওনাদের হাত পেঁছিবে স্বচ্ছন্দে। বন্ বা বন কোথাও গিয়েও নিষ্কৃতি নেই। পূবে হাঁটা দিয়েও লাভ নেই। ক্রুশ্চেভও তোমার প্রতি সহিষ্ণু হবেন না। অমলিনাকে মলিন ক'রেছো তুমি? বিশ্ব নারী সংস্থা থেকে জীনিভাতে কনফারেন্স, কিছুমাত্র বিচিত্র নয়।

তোমাদের এই কাহিনী নিয়ে কলকাতার ইংরেজী কাগজে কিউবিস্ট চুমা বোসের দেড় কলম ব্যাপী পত্রাঘাত, রবিবারের চায়ের টেবিলে কি ভীষণ টেম্পো'আনবে আমি ভাবতে পারিনা।

বালিশে ঘষা খেয়ে ফুরিয়ে যাওয়া ভ্রূযুগল তুলে জামিয়ারে জড়ানো জামাইবাবুকে তোমার সেই কাঁকুলিয়া রোডের ললিদি নিশ্চয়ই বলবেনঃ বুলুদা, প'ড়লেন তো সব! মিণ্টুর পেটে পেটে এতো!

এমনকি রাইটার্স বিল্ডিংস্-এ দিল্লীর প্রোটোকল্ দপ্তরের জরুরী পত্র তোমার হাড় হাড্ডির তালাশে আসলে অবাক হবার কিছু নেই। মন্ত্রার ঘরে তোমার নামে হয়তো ফাইল খোলা হবে। তাতে লেখা থাকবে ঃ সাবমিটেড্ টু এইচ. এম. ফর্ হিজ্ কাইণ্ড পেরিউজ্ল্। মহামান্য মন্ত্রী মহাশয় ক্ষেপে আগুন হ'য়ে যাবেন

তোমার ওপর। ফাইলেই হয়তো অর্ডার দেবেন: আই. জী. টু স্পাক্! তাহলে?

আমার সামান্য ভুলের জন্যে তোমাকে এ ভাবে মাশুল দিতে হ'য়েছে দেখে আমি লজ্জায় সরু হ'য়ে গেছি। কিন্তু কি অসম্ভব এই যোগাযোগ বলতো? কি অবিশ্বাস্য ঘটনা। এ দৈব নয়— দুর্বিপাক।

দুবার চিঠিটি প'ড়লাম। প্রবল শীতেও আমি যেন ঘামতে থাকি।

বার্লিন।

এখানে এসে প্রথম যে বৈচিত্র্য আমার চোখে প'ড়লো সে এখানকার বিমানঘাঁটি। অন্যত্র অন্য শহরে, অন্য কোনো খানে, বিমান ঘাঁটি দেখেছি লোকালয় থেকে কিছুটা তফাতে। শহর থেকে দূরে। কিন্তু পশ্চিম বার্লিনের বিমানঘাঁটি 'টেম্পেল-হোফ' শহরের মাঝখানে।

কর্ম মুখর বিমানঘাঁটি। এলাহি কাণ্ড। প্রতি মুহূর্তে বিমান আসছে-যাচ্ছে। লোকের যাবার যেমন বিরাম নেই, লোক আসারও যেন শেষ নেই এখানে। কারণ অবশ্য আছে। পশ্চিম বার্লিনের সঙ্গে পশ্চিম জগতের প্রধান যোগাযোগ 'টেম্পেল-হোফ'।

বিরাট শহর বার্লিন। সাম্প্রতিক ইতিহাসের পাতায় এই বার্লিনের এক বিশেষ স্থান আছে।

নেরোর যেমন রোম রোমানদের নয়, হিটলারের তেমনি বার্লিন জর্মনদের নয়।

হারেমের বিলাস শয্যায় নীল সুরার মদির নেশার সঙ্গে নৃত্যরতা উলঙ্গ নারীর দেহভঙ্গি উপভোগ ক'রেছেন নেরো। হিংস্র সিংহের মুখে নিরীহ মানুষকে ফেলে দিয়ে আনন্দের উত্তেজনায় নিজের হাতের আপেল কামড়ে ধরতেন। আগুনের হলকায় সমগ্র রোম নগরী জ্বলছে, সারা দিকদিগন্তে মানুষের মর্মস্পর্শী হাহাকার আর মায়েদের কান্নায় যখন আকাশ-বাতাস হা হা ক'রে উঠেছে, তখন বীণা টেনে নিয়েছেন তিনি। উন্মত্ত এক পাশব সঙ্গীতের বীভৎস আনন্দে তাঁকে আত্মহারা হ'তে দেখা গেছে। ইতিহাসে এই রকম লেখা আছে।

রোমের ইতিহাস পুরাতন। নেরোর কাহিনী মান্ধাতার আমলের। কিন্তু বহু শতাব্দীর মৃত ধ্বংসস্তূপের কবরের মধ্যে থেকে প্রাগৈতিহাসিক

এই মানুষটি যেন আবার জন্ম নিলেন নতুন ক'রে। ইন্ নদীর তরঙ্গ রাশিতে সেদিন আনন্দোৎসব দেখেছেন যাঁরা, তাঁরা ভুল ক'রেছেন। পৃথিবীর প্রচণ্ড হতাশা আর উৎকণ্ঠা উদ্বেলিত হ'য়ে উঠেছিল সে জলোচ্ছ্বাসে। এ মানুষ আরও বীভৎস। আরও বেপরোয়া। আরও প্রস্তুত।

নতুন পটভূমিতে এই নতুন মানুষ দেখা দিলেন নতুন ক'রে। ইতিহাসের চাকা ঘুরেছে। সভ্যতার বিবর্তনে অনেক গিয়েছে, এসেছে অনেক। হারেম নেই। আরও ভয়ঙ্কর নাচঘর আছে। হিংস্র সিংহের প্রয়োজন ফুরিয়েছে। তার পাশব ক্ষুধায় দুনিয়ার মানুষকে নির্মূল করা অসম্ভব। গবেষণাগারে পৃথিবীকে চুর ক'রে দেবার চেষ্টা চলে। শিশুর হৃৎপিণ্ডে যার হাত পৌঁছেছে, বীণার তন্ত্রীতে ব'সে টান দেবার তার সময় কোথায়?

ধীরে ধীরে নিজের শক্তি সংহত করেন। রাজনৈতিক চোরাগলির খাড়াই পিছিল পথে, অতর্কিতে আক্রমণ ক'রে এক একটি শত্রুকে বিনাশ করেন।

লক্ষ লক্ষ মানুষ চ'লেছে একদিকে। তীর্থস্থানে নয়, কারাগারে। সামান্য সন্দেহে হাজার হাজার নিরীহ মানুষ প্রাণ হারালেন। গ্যাস চেম্বারে ইহুদী নিধন-যজ্ঞ চলে রাত্রি দিন।

হিটলার অপরাজেয়। জনসাধারণ অসাধারণ নয়। বুদ্ধিজীবী দেশ ছেড়ে চ'লে গেলেন। ল্যাবরেটারী শূন্য, বৈজ্ঞানিক পলাতক। পাণ্ডুলিপি শেষ হ'লো না, ইয়োরোপের অন্য দেশে এসে স্তব্ধ সাহিত্যিক আকুল উৎকণ্ঠা নিয়ে লক্ষ্য করেন, ফিউরের সম্পর্কে কাগজের পাতায় সামান্য কোথাও বিক্ষোভ নেই। তিল মাত্র প্রতিবাদ নেই কারো। পৃথিবীর ঘুম ভাঙ্গেনি। আমেরিকার পথে পথে তিনি যখন বিভ্রান্ত হ'য়ে ঘুরছেন, তখন খবর এলো তাঁর বই জড়ো ক'রে বার্লিনের রাস্তায় আগুন লাগানো হচ্ছে। অনন্যোপায় হয়ে আত্ম-হত্যার পথই বেছে নিলেন তিনি। দুঃখবাদী চিত্রকর তুলি ফেলে

দেশ ছেড়ে পালালেন। উদ্ধত রিভলভরের সামনে ব'সে, হিম্‌লর্‌-এর চোখ দুটি তিনি আঁকতে পারলেন না সুন্দর করে। ইতিহাসের অধ্যাপক, নীট্‌শেও যার অজ্ঞাত নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের অলিন্দ থেকে লাফিয়ে প'ড়ে জীবনের ওপর যবনিকা টেনে দিলেন। এত করুণ রাজনৈতিক আত্মহত্যা ইতিহাসে বিরল।

পৃথিবীর ঘুম হয়তো ভাঙলো না, কিন্তু ফিউরের-এর চোখে ঘুম নেই। এই বার্লিনকে কেন্দ্র ক'রে সুরু হয় সভ্যতার বিরুদ্ধে তার ভয়াবহ পরিকল্পনা। পৃথিবীকে গ্রাস করবার জন্যে সে উন্মত্তপ্রায়।

সমুদ্রের অতল গহনে অক্টোপাসের যেন স্থির হ'য়ে দেখা শেষ হ'য়েছে। এবার সেই সরীসৃপ তার ক্ষুধার্ত্ত বাহু বিস্তার ক'রলে।

একের পর এক দেশ শ্মশান হ'লো। কত জনপদ বিধ্বস্ত হ'লো। সহস্র সহস্র মানুষের শোণিতে সবুজ ফসলের মাঠ রঞ্জিত হ'লো। পাকা গম ও তাজা শিশু এক সঙ্গে জ্বলতে লাগলো।

ঐতিহাসিক প্যারী অবরুদ্ধ। সে জ্ব'লছে। ল্যুভর-এর আর্ট গ্যালরীতে দা-ভিঞ্চির মোনালিসা হিংস্র নেকড়ের পদধ্বনি শুনে কেঁদে উঠলো। আফ্রিকার বন্য কালো মেয়ের কোলে রক্তাক্ত শিশুপুত্র থরথর ক'রে কাঁপছে। ফিউরের-এর দেহের নীল রক্তের অবিমিশ্রতার কুলকুল প্রবাহে সে তো সামান্য কোনও বিক্ষেপ তোলেনি, তবে এই মর্মান্তিক হনন কেন?

আঘাত আসে পূর্বদিকে। রুশিয়ার বিরাট শিল্প ও খনিজ সম্পদ ইউক্রেনের শস্য ক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে প'ড়লো আক্রমণ। মর্মান্তিক ভুলের সুরু এখান থেকেই।

অজেয় পানৎসার বাহিনীর সাঁড়াশি অভিযান স্তালিনগ্রাডের গ্রানিটের প্রাচীরে আঘাত খেয়ে থমকে দাঁড়ালো একদিন। তারপর সুরু হ'লো দুরন্ত পিছু হাঁটার পালা।

একদিকে রুশ সৈন্য, অন্য প্রান্তে ইংরেজ ও আমেরিকান বাহনী যুদ্ধের সমস্ত ভয়াবহতাকে ঠেলে নিয়ে এলো জর্মনির আপন ভিটেতে।

ভয়ঙ্কর যুদ্ধের শেষ হ'লো রাশিয়ার বার্লিন বিজয়ে। ফিউরের-এর আত্মহত্যা ও নতমস্তক, হতযশ সেনানায়কদের শর্তহীন আত্মসমর্পণে।

শক্তি মদগর্বে মানুষ যে কত ক্রূর, কত হিংস্র হ'তে পারে, অসহায়ের প্রতি অত্যাচারে সে যে কত ভয়াবহ হ'য়ে উঠতে পারে, তার অজস্র নিদর্শন রেখে গেলেন ফিউরের ও তার মুষ্টিমেয় আজ্ঞাবহ সহচর।

কিন্তু সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই আজ। ফিউরের নেই, বার্লিনের আজ অন্য হাল।

যুদ্ধ শেষে জর্মনি বিভক্ত হ'লো চারভাগে। পূর্বভাগ রাশিয়ার দখলে গেল। পশ্চিমের তিনভাগ ইংরেজ, ফরাসী ও আমেরিকানদের হাতে এলো। বার্লিন প'ড়লো রুশিয়ার অধিকৃত অঞ্চলে। কিন্তু তাও ভাগ হ'লো চারভাগে। 'পশ্চিম বার্লিন' পশ্চিম জর্মনির এলাকা। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে এই ছোট্ট জায়গাটির গুরুত্ব অপরিসীম।

বার্লিন আজ পৃথিবীর শান্তিপ্রিয় মানুষের এক মস্ত সমস্যা।

বার্লিন যেন ঘুমন্ত ভিস্যুভিয়াস্। ছাই চাপা আগুন জ্ব'লছে এখানে ধিকি ধিকি। জঠরে ভয়াবহ লাভা সঞ্চিত হ'চ্ছে প্রতিদিন। আগামী কোনও একদিন হয়তো এর জ্বালামুখ প্রচণ্ড আবেগে উৎক্ষিপ্ত হবে। সে সর্বনেশে লাভা স্রোত দুরন্ত বেগে ছড়িয়ে প'ড়ে নতুন কি ইতিহাস রচনা ক'রবে কে জানে?

যুদ্ধে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয় বার্লিন। পথে পথে, প্রতিটি বাড়ির ঘরে ঘরে, সিঁড়িতে, দালানে ও প্রাসাদের কার্নিশে জর্মন সেনা রুশ সৈনিকের সঙ্গে মরণ পণ সংগ্রাম ক'রছে।

বার্লিনের পতনে বিজয়ী রুশ সৈনিকের জয়যাত্রার বিবরণ আছে বহু। কাহিনী আছে প্রচুর। কিন্তু সাধারণ জর্মন সেনাদের প্রতিরোধ সংগ্রামের কথা কোথাও চোখে পড়ে না। নেতারা সেদিন পলাতক। পাশে ছিল না কোন মার্শাল বা সেনানায়ক। তবু সে

প্রতিরোধ বিস্মিত ক'রেছিল শত্রুদের। স্তম্ভিত হ'য়েছিলো বিজয়ী রুশ।

বিচ্ছিন্ন টুকরো টুকরো বিভক্ত সেনাদের পাশে সেদিন ছিল কে? ফিউরের নয়। নীলরক্তের প্রবাহ তাদের ধমনীতে প্রেরণা দেয়নি। নীট্‌শেতে তার ব্যাখ্যা নেই। মার্ক্সবাদে তার নতুন কোনও উল্লেখ নেই নিশ্চয়ই।

বিপন্না মা'কে উদ্ধার করবার প্রেরণা আসে অন্তর থেকে। দেশকে রক্ষা করবার শক্তি আসে মাটি থেকে। ফ্যাসিজম সেখানে অর্থহীন। কমিউনিজম-এর কেতাব সেখানে অবান্তর। স্টালিনগ্রাডে রুশ সৈনিকের প্রতিরোধ, কমিউনিষ্টদের লড়াই নয়—দেশের মানুষের সংগ্রাম। বার্লিনে প্রতিরোধী জর্মন সেনাদের সংগ্রামে ফ্যাসিস্টদের কোন ভূমিকাই ছিল না। ছিল অতিসাধারণ মানুষের স্বদেশপ্রাতির স্বতঃস্ফূর্ত্ত অভিব্যক্তি।

তাই স্টালিনগ্রাডের রুশ সৈনিক চান্সেলরীর কার্নিশে রক্তাক্ত জর্মন সেনার ঠোঁটে লেগে থাকা হাসিটি সেদিন হয়তো ঠিক চিনেছিলো।

এক যুগ পার হ'য়ে গেছে তবু ধ্বংসস্তূপের স্বাক্ষর ও মর্মান্তিক সেই সংগ্রামের দাগ আজও মিলিয়ে যায়নি। মেশিনগানের গুলির দাগ বাড়ির দেওয়ালে হামেশাই চোখে পড়ে। ট্যাঙ্কের গোলার আঘাতে এক একটি এলাকা ধ্ব'সে শুধু ধ্বংসস্তূপ হ'য়ে আছে।

কিন্তু আমেরিকানদের হাতে প'ড়ে পশ্চিম বার্লিনের আজ অন্য অবস্থা। আধুনিক ধরনের নতুন নতুন বাড়িতে ছেয়ে গেছে শহরের চারদিক। কোটি কোটি ডলার ব্যয় ক'রে আমেরিকান কায়দায় তৈরী হ'য়েছে রাস্তাঘাট!

যুদ্ধপূর্ব বার্লিনের শ্রেষ্ঠ রাজপথ 'লাইপৎসিগার স্ট্রাসে' আজ পূর্ব বার্লিনের রুশ এলাকায়। তাই পশ্চিমে গড়া হ'য়েছে বিরাট রাজপথ—'কুরফুরস্টেনডাম'। আড়াই মাইল লম্বা। কলকাতার চৌরঙ্গীকে অতিসহজেই হার মানায়।

পথের দুধারে হালফ্যাশনের ছ'তলা আটতলা বাড়ী। কাচে মোড়া নীয়ন আলোর আবরণে আপাদমস্তক সজ্জিত। কিছুদূর অন্তর অন্তর ল্যাম্পপোস্ট, তাতে ছ'টা ক'রে বিরাটকায় বালব্ সুন্দর কাচের আবরণে ঢাকা। ন'টা ক'রে ফুট চারেক লম্বা ফ্লুয়োরেসেণ্ট টিউব, চাঁদের মত ঝুলছে।

ফুটপাতের এক পাশ ঘিরে দুর্মূল্য কাফে-টেরাসে। সমস্ত পথ আলোয় আলোময়। দু'পাশের ফুটপাতে লোকের ভিড়। টেবিলে টেবিলে নরনারীর কলগুঞ্জন। বিরাম বিহীন সিনেমা থিয়েটার। কাচের শো কেশ। সব মিলিয়ে প্রাচুর্য ও চূড়ান্ত আধুনিক পদ্ধতির চোখ ধাঁধানো উগ্র এক মোড়ক বিশেষ।

পশ্চিম থেকে পূবে চ'লে গেছে বিরাট একটি রাজপথ। চারটে চৌরঙ্গী পাশাপাশি রাখলে বোধহয় এতখানি চওড়া হবে। নাম, '১৭ই জুন স্ট্রীট।'

এ রকম নামকরণের পেছনে সামান্য একটু ইতিহাস আছে। কয়েকবছর আগে পূর্ব বার্লিনের কমিউনিস্ট সরকারের বিরুদ্ধে এখানে এক আন্দোলন হয়। বিক্ষোভ উঠেছিল পশ্চিমে। তারিখটা ছিল ১৭ই জুন। তারই স্মৃতিতে এই রাজপথের নতুন নামকরণ।

'১৭ ই জুন ষ্ট্রীট' সোজা ঢুকে গেছে পূর্ব বার্লিনের রুশ এলাকায়। সীমানার ওপরে খুব পুরোনো বিরাট একটি গেট্। অনেকটা পুরোনো দিল্লীর গেটের মত। নাম 'ব্রাণ্ডেনবার্গার গেট।' মাথার ওপরে ঠাণ্ডা বাতাসে রক্ত পতাকা দোল খাচ্ছে।

এ পারের চেহারা সম্পূর্ণ অন্য ধরনের। সামান্য পথের ব্যবধান। কিন্তু মনে হ'লো যেন নতুন দেশে এলাম।

পশ্চিম বার্লিনে যেমন 'কুরফুরস্টেনডাম', পূবে তেমন 'স্টালিন আলী'। বার্লিনের শ্রেষ্ঠ রাজপথ 'লাইপৎসিগার স্ট্রাসে' এখনও বিধ্বস্ত। পথটি সংস্কার ক'রে ওঠা সম্ভব হয়নি এখনও।

তবে 'স্টালিন আলী'ই কম কিসে? প্রশস্ত রাজপথ, সুন্দর বড়

বড় বাড়ি। বিরাট দোকানঘর। তবু প্রভেদ অনেক। নীয়ন আলোর চোখ ধাঁধানো বিজ্ঞাপন নেই। নেই কাচের সমারোহ। নাইট ক্লাব কোথায় গেল? ফুটপাতে কাফে-টেরাসে কই?

পশ্চিমে বলেঃ পূর্ব বার্লিন গরীব, এটা ওদের দৈন্য। পূবের লোককে ব'লতে শুনেছিঃ এটা দোকানদারদের দেশ নয়, কোনও প্রয়োজনই নেই বিজ্ঞাপনের। মজুমদারের কথা মনে পড়ে। পাঁপড় ও বাড়তি একটি পাখির হিসাব যেন মিলে গেল। পশ্চিমের 'কুরফুর-স্টেনডাম' হ'লো নিউইয়র্ক। পূর্বের 'স্টালিন আলির সঙ্গে তুলনা মেলে মস্কোর। কোনটাই এখানকার নয়। এ দেশের নয় কিছুই। হুটোর একটাও জর্মনির অস্তিত্ব স্বীকার করে না।

বার্লিন যুদ্ধ শেষ হয় চান্সেলরীর পতনে। এই চান্সেলরী ছিল হিটলারের কর্মস্থল। আর তার নীচে মাটির তলায় বাঙ্কার তৈরী করে থাকতেন তিনি। সঙ্গে ছিল ইভা ব্রাউন। এইখানেই নাকি হিটলারের আত্মহত্যা। দেহটিও নাকি ছাই করে ফেলা হয় এখানেই।

মরণ পণ সংগ্রামের পর চান্সেলরী দখল ক'রে ডিনামাইট দিয়ে বাড়িটি উড়িয়ে দেয় রুশ সৈন্যেরা। আর এই বাড়ির ইট আর পাথর তুলে নিয়ে গিয়ে তৈরী করা হলো বিরাট এক মনুমেণ্ট। বার্লিন বিজয়ের স্মরণে আর নিহত রুশ সৈনিকের স্মৃতিতে স্থাপিত হ'লো এক মনুমেণ্ট।

হু'পাশে হু'টি ট্যাঙ্ক। বার্লিনে এই হুটি ট্যাঙ্কই নাকি প্রথম প্রবেশ করে।

চান্সেলরীর ধ্বংসস্তূপ রুশ এলাকায়। কিন্তু মনুমেণ্টটি গড়া হ'য়েছ পশ্চিম বার্লিনে। হু'জন রুশ সেনা রাত্রিদিন এই মনুমেণ্ট পাহারা দিচ্ছে। সুন্দর সুগঠিত ভারী দেহ। কাঁধের সঙ্গে টমিগান ঝোলানো।

অনেকক্ষণ সময় গেল এখানে। মনুমেণ্টের পেছনে কিছু দূরে ভুতুড়ে বাড়ির মতন আজও দাঁড়িয়ে আছে জর্মনির কলঙ্ক! সভ্যতার হুরন্ত জিজ্ঞাসা, বিধ্বস্ত আধপোড়া 'রাইখস্টাক'।

পূর্ব বার্লিনের মধ্যে অনেকটা দূর চ'লে গেলে 'ট্রেপটাও পার্ক'। হিটলারের আমলে এই পার্ক ছিল বার্লিনবাসীদের হৈ-হুল্লোড় ও আমোদের কারখানা। বার্লিন বিজয়ের পর যে সব সৈনিক জীবিত ছিল, তারা শহরের পথ থেকে, বাড়ির সিঁড়ি থেকে, প্রাসাদের অলিন্দ থেকে কুড়িয়ে নিয়ে এলো তাদের বন্ধু, তাদের কমরেডদের দেহাবশেষ।

সে শবযাত্রার বিরাম ছিল না। এমন মর্মান্তিক দৃশ্যের তুলনা নেই। দেশের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্যে, প্রিয়জন থেকে বহুদূরে, বহু সহস্র মাইল পেরিয়ে, বিদেশে এই সাত হাজার তরুণের মহামৃত্যুর তুলনা নেই।

'ট্রেপটাও পার্কে'র সমস্ত আমোদের উপকরণ উপড়ে ফেলে দিয়ে সাত হাজার তরুণ সৈনিকের কবর দেওয়া হয় এখানে।

একটি বিরাট কবর। কবরের এক পারে একটি মর্মর মূর্তি। মায়ের মূর্তি। তুহাতে বুক চাপড়ে ধ'রে নৈরাশ্যের কান্নায় ভেঙে প'ড়েছেন। পাথরে খোদাই করা তু'দিকে তু'টি বিরাট সোভিয়েট পতাকা। মৃতের সম্মানে অবনমিত।

পতাকার নীচে তুদিকে তুজন সৈনিকের পাথরের মূর্তি। হাঁটু গেড়ে বসা, ডান হাতে রাইফেল, আর এক হাতে হেলমেট্ ধরা। মাথা নত ক'রে শ্রদ্ধা জানাচ্ছে।

তু'টি মূর্তির মাঝখান দিয়ে চওড়া সিঁড়ি নেমে গেছে পাথরের বাঁধানো শ্মশানে। মাঝখানে বিরাট লম্বা কবর। তু'পাশে পথ। পথের ধারে ধারে চৌকো স্তম্ভ। প্রত্যেক স্তম্ভের গায়ে খোদাই করা যুদ্ধের ক'বছরের ইতিহাস।

অন্য পারে তিনতলা উঁচু এক স্তম্ভের ওপর বিরাট এক কালো পাথরের মূর্তি। এক সোভিয়েট তরুণ দাঁড়িয়ে আছে। ডান হাতে তার খোলা তলোয়ার। বাঁ হাতে কোলে নিয়েছে সুন্দর ছোট্ট একটি মেয়েকে। মেয়েটি তু'হাতে তরুণকে আঁকড়ে ধ'রেছে ভয়ে। তরুণের

সমস্ত দেহে সাহস ও দৃঢ়তা ফুটে উঠেছে। সুদূর আকাশে তার দৃষ্টি নিবদ্ধ।

স্তম্ভের মধ্যে একটি ঘর। কবরের অনুকরণে গড়া। আর একটি স্মৃতিস্তূপ। দেয়ালে আঁকা ছবি। রাশিয়ার বিভিন্ন মানুষের ছবি। সকলের দৃষ্টি কবরের দিকে। বেদনার সঙ্গে দুরন্ত এক দৃঢ়তা আছে চোখেমুখে। সেখানে লেখা—'দেশ থেকে বহু দূরে তোমরা প'ড়ে রইলে, কিন্তু আমরা চিরদিন তোমাদের শেষ শয়নের পাহারায় রইলাম'।

ধীর পদক্ষেপে ঘর থেকে বেরিয়ে আসি। বেলা গড়িয়ে গেছে অনেকক্ষণ। সূর্য ঢলে গেছে পশ্চিমে। কবরের আর এক প্রান্তে সারি সারি সবুজ গাছের পাতায় নরম আলো ঝলমল ক'রছে। সূর্য যেন মুঠো মুঠো সোনা ছিটোচ্ছে।

এই ঐতিহাসিক শ্মশানে ভয় নেই। কাপুরুষতা নেই। শ্রদ্ধায় প্রাণমন ভরপুর হ'য়ে ওঠে। হৃদয় আপ্লুত হয়। তবে কান্না?

মা তো কাঁদবেই! নীরব সে কান্না, হিমেল বিষণ্ন বাতাসে ভর ক'রে সারা চরাচরে সে তো হা হা ক'রে ফিরবেই।

আমার মাথা নত হ'য়ে এলো।

ব্যস্ত কুরফুরস্টেনডাম।

যে কারণে আড়িয়াদহ হয় এঁড়েদা, পাণিহাটি বহু মানুষের ঠোঁটে পেনেটি, সেই একই কারণে এদেশের স্থানীয় লোকে কুরফুরস্টেনডামকে ছোট ক'রে বলে, 'কুডাম'।

পথে নামতে আমার বেশ কিছু দেরী হ'য়ে গেল। বাসি গালদুটি শাসনে আনাই ক্লেশকর। এই শীতে গালে জল লাগাবো কি? বৈদ্যুতিক ক্ষুর অবশ্য ছিল হাতের কাছেই। তবে ভরসা পাইনি তা দিয়ে।

লেনিন ব'লেছেন, সোশ্যালিজম-এর সঙ্গে বিদ্যুৎ শক্তির মিলনে কমিউনিজম-এর জন্ম। আমি সোশ্যালিজম-এ বিশ্বাসী কিনা ভেবে দেখিনি, আর এক শ্রেণীর অতি আধুনিক বাঙ্গলা কবিতার মত কমিউনিজম আমার কাছে দুর্বোধ্য।

তবে আগ্রহ না থাকলেও কৌতূহল ছিল যথেষ্ট। তাই গোরাদাকে প্রশ্ন ক'রেছিলাম একদিন।

ফাইলোলজির কৃতী ছাত্র। গোরাদা অধ্যাপকদের ছিলেন প্রিয় পাত্র। হঠাৎ একদিন কানে এলো গোরাদা ভাষাতত্ত্ব ছেড়ে মানুষের তত্ত্ব-তাবাসে লেগে গেছেন। ফিললোজি ছেড়ে ধ'রেছেন পলিটিক্স।

দেখা হ'য়েছিল খিদিরপুর ডকে। সুন্দর দেহটি মলিন। কোম্পানীর কিছু যন্ত্রপাতি খালাসের তদারকে গিয়েছিলাম। সঙ্গে অফিসের মহার্ঘ গাড়ী ছিল। তকমা আঁটা সোফার ছিল সঙ্গে। আর সেই মুহূর্তে আমি দুরন্ত সাহেব। একেবারে হাতে পায়ে পহেলা নম্বর অফিসার। কিন্তু গোরাদাকে এড়িয়ে যেতে পারলাম না।

সেদিন শুধু ব'লেছিলাম: গোরাদা, এ সব আপনি কি ক'রছেন? ভাষাতত্ত্বের ছাত্র ছিলেন আপনি, ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন বেছে নিলেন শেষকালে? থিসিস্‌টাও শেষ ক'রলেন না আপনি?

আমার কথা সম্পূর্ণ এড়িয়ে গেলেন গোরাদা। ঠোঁটে হেসে ব'ললেন : তোমার নিশ্চয়ই তাড়া আছে, আমার হাতেও কিছু কাজ আছে। একদিন বাড়িতে এসো।

গোরাদার বাড়িতে যাওয়া সম্ভব হয়নি। আর একদিন দেখা হ'লো কবীর রোডের বাঁকে। ব'ললাম ঃ গোরাদা, আপনাকে আমার প্রয়োজন আছে। আমার বোন মিনাকে আপনি জানেন, কাল সে আমাকে 'গবেট' ব'লেছে। ডায়ালেক্‌টিক বস্তুবাদ, আপনি আমাকে সহজ ক'রে বোঝাবেন ?

গোরাদা আমাকে এক রকম গ্রেপ্তার ক'রে নিয়ে গেলেন বাড়িতে। এতটা খুশী হ'তে কখনও দেখিনি তাঁকে। এক কাপ চায়ের পর জুত হ'য়ে ব'সলেন। ব'ললেন তারপর ঃ ডায়ালেক্‌টিক বস্তুবাদ সম্পর্কে প্রশ্ন ক'রেছো, এখন ডায়ালেক্‌টিক কথাটা তোমার জানা দরকার। কথাটা এসেছে গ্রীক থেকে, 'ডায়্যাল্‌এগো' ওর অরিজিন। ওটার অর্থ হ'লো দ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়ে প্রগতি। আদতে ব্যাপারটা মোটেই নতুন নয়, সেই মান্ধাতার আমল থেকেই "dialectics was the art of arriving at the truth by disclosing the contradictions in the argument of an opponent and overcoming these contradictions…" মেট্যাফিজিক্‌স্‌-এর সঙ্গে কিন্তু গুলিয়ে ফেলবে না মিণ্টু—বরং এই ধরো—

প্রথমে কিছুটা সহজ, অনেকটা যেন বোধ্য। কিন্তু তারপর আমি দিশেহারা। গোরাদা আমাকে এক ঝটকায় পেড়ে ফেললেন। ইতিহাসের পরিবর্তনের অন্তহীন প্রবাহ, ক্রমবিকাশের অসমান গতি, ফুয়েরবাখের বস্তুবাদ, এঙ্গেল্‌সের, 'Anti-Duhring', quantitative changes to qualitative changes,' প্রায় ঘণ্টা দেড়েক গোরাদা অনর্গল ব'লে গেলেন।

হেসে হেসে ব'ললেন শেষে ঃ বিজ্ঞানের সঙ্গে সাম্যবাদের সমন্বয়ে ডায়ালেক্‌টিক বস্তুবাদের চূড়ান্ত সার্থকতা। তবে আমাকে প্রথম থেকেই

বলতে হবে। সুরু করতে হবে গোড়া থেকেই। কিছুটা সহজ ক'রে বলা দরকার তোমাকে। এখন তুমি হেগেলকেই ধর... !

হেগেলকে ধরা গেল না। কারণ অফিসের সময় হ'য়ে গেল। উঠতে হ'লো।

দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে গোরাদা বলেন: বিজ্ঞানের ছাত্র তুমি, যুক্তিবাদী মন তোমার। ভোর বেলাটা আমি বাড়িতেই থাকি, ছুটির দিন সকাল সকাল চ'লে এসো। দেখেছো মিণ্টু, ফুয়েরবাখ প্রশ্ন ক'রেছেন ঠিক, ওনার উত্তরগুলোই ভুল। এঙ্গেল্‌সের 'Dialectics of Nature' ধ'রবো সামনের দিন। মজা পাবে।

মজা আমি সেদিন হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছি। সেই-ই আমার প্রথম ও শেষ দিন। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ বোঝা আমার শেষ হয় নি। সাম্যবাদের সরল ব্যাখ্যা আমার অজ্ঞাতই র'য়ে গেল।

তবে বিদ্যুৎশক্তি বুঝি। আর সেটা নিয়ে নাড়াচাড়াও করি। বিদ্যুৎশক্তিতে আমার প্রচুর বিশ্বাস। দেশের সমৃদ্ধি, মানুষের শ্রীবৃদ্ধি করে বিদ্যুৎশক্তি। পৃথিবীর নব নব সৃষ্টিকে সার্থক গতি দিয়ে যাচ্ছে সে প্রতিনিয়ত।

কিন্তু আমার পাণ্ডুর মুখশ্রীকে সুন্দর ক'রে তোলবার তাগিদে বৈদ্যুতিক ক্ষুরের আশ্রয় নিতে আমি ভয় পাই। যুক্তি হয়তো হাতে এমন কিছু নেই। তবু একশো দশ ভোল্টের বৈদ্যুতিক ক্ষুরের হাতে আমার অসহায় গালটি ছেড়ে দিতে ভয় পাই। কি জানি সামান্য তার ভ্রূক্ষেপ, আক্ষেপ বা বিক্ষেপে যদি দাঁড়ায়, তাহ'লে ?

এক পাত্র কফি নিয়ে ব'সলাম কুডামের এক কাফে-টেরাস। ভোর বেলাতেই চারদিক যেন গমগম ক'রছে। জমজমাট চারদিক। তরুণ তরুণীদের কল-গুঞ্জন, পথচারীর উচ্ছল হাসি উল্লাসের যেন বিরাম নেই। টুরিস্টও আসে এখানে অনেক। রাজনৈতিক দালালও আসে বিস্তর। পিতার দানে স্থাপিত কলেজে মূর্খ পুত্রের কমিটির মিটিং-এ

ভুল ইংরেজীর হৈ চৈ যেমন মেনে নিতে হয়, উৎকট আমেরিকান ওস্তাদি তেমনই গা-সহা হ'য়ে গেছে বার্লিনে।

গত রাত্রে রুডল্‌ফ্‌-এর আসবার কথা ছিল। নিকলের এই বন্ধুটি অল্পদিনে আমাকে কেমন জয় ক'রে ফেলেছে। তার কথামত তারই পরিচিত হোটেলে উঠেছি। মিউনিকে তার হাতের কাজ সেরে এখানে আসার কথা। আমার সঙ্গে এই রকমই কথা আছে।

আমার ঠিক মুখোমুখি এক বৃদ্ধ এসে ব'সলেন। পুরোনো দিনের সেকেলে মানুষ। মাথায় টুপি। ঠোঁটে সিগার। চোখে গভীর দৃষ্টি।

আলাপ হ'লো। এ রকম আলাপে আমি অভ্যস্ত হ'য়ে গেছি। নির্লিপ্ত কণ্ঠ, অতি সাধারণ তুচার কথার আদান প্রদান। এখানেই জন্ম, কর্মও এখানে। কথায় কথায় পথে নেমে আসি।

ব'ললাম ঃ যুদ্ধের ভয়ঙ্কর দিনগুলো আপনি এখানেই কাটিয়েছেন? বার্লিন অবরোধের সময় আপনি ছিলেন এখানে ?

বৃদ্ধ মৃতু হাসলেন। ব'ললেন ঃ আমার জন্মভূমি ছেড়ে যাবো কোথায় ?

আমার আবার প্রশ্ন। ব'ললাম ঃ সেই ভয়ঙ্কর দিনগুলোর কথা আমার জানতে ইচ্ছে করে। সমস্ত শহর শুনেছি ধ্বংস হ'য়েছিল। একটি বাড়িও নাকি খাড়া ছিল না বার্লিনে ?

কয়েক মুহূর্ত পর বৃদ্ধ ব'ললেন ঃ একটা বাড়ি খাড়া না থাকলেও আমার কিছু বলবার ছিল না। আমার বাড়ি ধ্বংস হ'লেও আমার কিছু অভিযোগ থাকতো না। সামান্য কয়েক দিনে অনেক নিরীহ মানুষের অমূল্য জীবন নষ্ট হ'য়েছে দেখেছি। আমার তুই পুত্রকে আমি হারিয়েছি। মেশিনগানের গুলিতে আমার স্ত্রীও নিহত হ'য়েছেন এই বার্লিনেই। কিন্তু এই শহরে কত পবিত্র জীবন আট বছর ধ'রে নির্মূল হ'য়েছে তার সংখ্যা বার্লিন যুদ্ধে নিহত ও নিপীড়িত মানুষের চেয়ে কিছুমাত্র কম নয়। ৩৩'শ থেকে ৪০'শ এই বার্লিনের পথেঘাটে, বাড়িতে আর বন্দী শিবিরে কি মর্মান্তিক ধ্বংসলীলা চ'লেছিল সে খবর

জানেন? আমার তুই পুত্রই ছিল সৈনিক। চ্যান্সেলরীর কার্নিশে রুশ সৈনিকের গুলিতে একজন নিহত হয়। আর একজনের মৃত্যুর সঠিক রহস্য আমার জানা নেই। তবে রণাঙ্গনে সৈনিকের মৃত্যু অতি সাধারণ ঘটনা। কিন্তু আমার ভাই টনিকে রাস্তার ওপর গুলি ক'রে মারা হয়েছিল এই বার্লিনেই।

থামলেন কয়েক মুহূর্ত। নীচু গলায় বলেন আবার: আজও আমার চোখের সামনে ভাসছে! সেদিন ছিল বুধবার, আমার জন্মদিন। কলেজ থেকে ফেরবার পথে টনি একখানি রেকর্ড নিয়ে এলো। ব'লেছিলো, তোমার জন্মদিনে এক তুরন্ত উপহার সঙ্গে এনেছি। রাইখস্টাক-এ আগুন লাগানোর আসল রহস্য যদি শুনতে চাও, এসো। গ্রামাফোনে রেকর্ড লাগানো হ'লো। রেকর্ডের প্রথমে লা ত্রাভিয়াতার তু-তিনটি গৎ, তারপরেই শুরু হ'লো—'রাইখস্টাক অগ্নিকাণ্ডের সত্যরূপ'। প্রচণ্ড উত্তেজনার মধ্যে রেকর্ড শোনা শেষ হ'লো। আতঙ্কে টনির গলা টিপে ধ'রলাম। চীৎকার ক'রে উঠলাম: বল্ এ রেকর্ড তুই কোথায় পেলি? এই সর্বনাশ তুই কোথা থেকে আন্‌লি?

ক্ষোভে তুঃখে ভেঙে প'ড়েছিল টনি। ব'লেছিলো: বিশ ফেনিগ-এ রাস্তা থেকে কিনে এনেছি। এ রেকর্ড আমি নষ্ট করতে দেব না। শৈশব থেকে সত্যি কথা ব'লতে শিখিয়েছো, আজ এ সত্যকে তুমি বাধা দিতে পারবে না।

সেই রাত্রেই গেষ্টাপো টনিকে ধ'রে নিয়ে গেল। ঘরের সমস্ত কিছু চুরমার ক'রে দিয়ে গেল। ভ্যান থেকে হয়তো পালাতে গিয়েছিল টনি, আমার ভাইয়ের ওপর একসঙ্গে নয়টি রাইফেল গর্জে উঠেছিল, জানেন।

কয়েক মুহূর্তে উত্তেজনার যেন শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেলেন মানুষটি। একটি তুঃসহ ব্যাথা যেন টনটন ক'রে উঠলো।

বুঝলাম এই বৃদ্ধ সাধারণ মানুষ নন। একটু থেমে বললেন: এ শুধু আমার শোক নয়, বার্লিনের প্রায় প্রতিটি পরিবারের এই মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা।

কথায় কথায় অনেকটা পথ এসেছিলাম। কাচ মোড়া এক চকমকে দোকানের সামনে এসে দাঁড়ানো গেল। বৃদ্ধ হেসে বললেন ঃ আপনার সঙ্গে দু'চার কথা বলে ভালো লাগলো। আরও কিছুক্ষণ আপনার সঙ্গে থাকতে পেলে খুশী হতাম, কিন্তু আমাকে একবার ষ্টেশনের দিকে যেতে হবে। আমার নাতনীর আজ আসবার কথা বার্লিনে।

করমর্দন ক'রে বিদায় নিলেন বৃদ্ধ। উল্টোমুখো পথ ধরতে হ'লো আমাকে।

কাঁহাতক আর পথে পথে ঘোরা চলে! লাঞ্চের আগে হোটেলে ফিরেই বা কি লাভ। চারমাথার মোড়ে দাঁড়ালাম কিছুক্ষণ। শহরের ব্যস্ততা দেখতে থাকি তাকিয়ে তাকিয়ে।

হঠাৎ নজরে এলো। প্রথমে আমার বিশ্বাস হয়নি। চোখের ভুল মনে ক'রেছিলাম। কিন্তু এবার আরও স্পষ্ট, অনেকটা নিকটে। 'চোখে সর্ষে ফুল দেখা' বোধ হয় একেই বলে।

তাই 'চলে নীল শাড়ী নিঙাড়ী নিঙাড়ী পরান সহিত মোর' আমার ঠোঁটে এলো না। বরং নিজের অজান্তেই ঠোঁট থেকে ঝরে প'ড়লো ঃ খাইছে।

উদ্ধত রিভর্লভারের সামনে এগনো নয়। বেপরোয়া কোনও মোটরের সামনে পড়েছি বলেও মনে হ'লো না। শুধু মনে হ'লো, আমার সামনেটা খালি। ব্যাক্ নেই, হাফ ব্যাকও নেই, স্ট্যানলি ম্যাথুজের পায়ের মারাত্মক একটী বল যেন আমার পেছনের জাল কাঁপানোর জন্যে তীব্র বেগে ছুটে আসছে। আমি পজিশন্ নিয়ে উঠতে পারছি না।

সেই ঝাঁজালো কণ্ঠ। সেই তির্যক চাউনী। অমলিনা রয় আমার প্রায় মুখোমুখি এসে দাঁড়ালেন। বললেন ঃ এখানেও আপনি আমার পিছু নিয়েছেন?

হেসে ফেলতে হ'লো। বললাম ঃ পিছু নয়, সুমুখ নিয়েছি

বলুন! আপনি দেখছি হাসালেন আমাকে। দুই প্রান্ত থেকে মুখোমুখি এসে দেখ হ'লো, এটাকে আপনি বলবেন পিছু নেওয়া? আপনার ভয়ে হাঁটাচলা বন্ধ করবো নাকি! ভূগোলে বলে...।

কথা কেড়ে নিয়ে বললেনঃ থামুন আপনি। আপনার কাছে জিয়গ্র্যাফি-র লেস্‌ন্‌ নেবার সময় নেই!

—আপনার পথ আমি আটকে নেই। স্বচ্ছন্দে আপনি যেতে পারেন। সময়ের অজুহাত মেয়েরা পৃথিবীর সর্বত্রই বেশ রপ্ত ক'রেছে দেখছি। তবে থামলেনই যখন তখন কিছুটা সময় নষ্ট আপনাকে আমি করতে বলবো। আপনার সঙ্গে আমার কিছু প্রয়োজন আছে।

—কি বলবেন আপনি?

—ঐ মন্দোদরীর ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলতে চাই।

—তার মানে?

—ভোলার চিঠি পেয়েছি! আমার পকেটেই সে চিঠি ভরা আছে। সেটি আপনার দেখা দরকার।

আমার কোন প্রয়োজন নেই!

—কিন্তু আমার আছে। আপনি এক মিথ্যে ধারণা নিয়ে যাবেন, এ আমি হ'তে দেবো না। গোটা ব্যাপারটা জানলে আপনার সব পরিষ্কার হ'য়ে যাবে। সহজ লাগবে সব কিছু।

—নতুন ক'রে সহজ করবার ইচ্ছে আমার নেই।

—কিন্তু আমার যে আগ্রহ!

—মাপ করবেন, পথ ছাড়ুন।

—পথ আমি ছাড়বো না। আমার নিজের বিবেক ব'লে একটা পদার্থ আছে। অহেতুক এক মিথ্যে ধারণা নিয়ে আপনি যাবেন, আর আমি অপ্রস্তুতই হ'য়ে থাকবো; এটা আমি মানতে রাজি নই। আমার সেদিনের কথা আপনি বিশ্বাস করেন নি। আমার কোনও কথাই আপনি শুনতে রাজি নন। অকারণ এই ভুলের বোঝা বাড়িয়েই বা কি লাভ ব'লতে পারেন? এটা আমাদের মিটিয়ে নেওয়া দরকার

—কি আর মিটিয়ে নেবো ?

—দেখুন, পৃথিবীর কত বড় বড় সমস্যা, মারাত্মক সব ভুল বোঝা-বুঝি আলোচনার মাধ্যমে সহজ ও স্বচ্ছ হ'য়ে আসে। আর আমাদের এই সামান্য ব্যাপারটা মিটিয়ে নেওয়া যায় না? ছবিটি আমার পকেটে কি ভাবে এলো সে ঘটনা আপনার জানা দরকার।

—আপনি একটার পর একটা ঘটনার ঘটকালি ক'রে চলেছেন।

—সুযোগ পেয়েছেন বলছেন। কিন্তু অঘটন কিছু ঘটেনি এ দাবী আমি করবোই।

—সামান্য এই ছবিটি আপনার কোটের পকেটে সীমাবদ্ধ থাকলে হয়তো আমার ক্ষতি হ'তো না, কিন্তু এভাবে রটনা করবেন আপনি ?

—রটনা, এ সব আপনি কি বলছেন ?

—রটনা নয় ? আপনার দায়িত্বহীন কথাবার্ত্তা আমাকে কি ভাবে বিব্রত ক'রেছে আপনি জানেন ? ছবিটি নিয়ে ফিরে এলাম আপনার ঘর থেকে। পথে একটি মেয়ের সঙ্গে দেখা হ'লো। যেচেই আলাপ ক'রলেন আমার সঙ্গে। তারপর আপনার বন্ধুর মত তিনিও রাস্তার মধ্যে একটা সিন্ ক'রলেন। আরও কতজনের কাছে আপনি কত কি ব'লেছেন, কে জানে। আমি তো আপনার কোন কিছুতে বাধ সাধিনি, তবে কেন আপনি আমাকে ধাওয়া করেছেন বার্লিনে, বলতে পারেন ? জবাব দিন ?

—ধাওয়া কথাটা খারাপ, আর ওটা করা ভালগ্যার। আপনাকে আমি ধাওয়া করিনি। পথে আর দশজনের সঙ্গে যে কারণে সাক্ষাৎ হয় আপনার সঙ্গে সেই একই নিয়মে দেখা হ'লো। ভালোই হ'লো। ভোলার চিঠিটা আপনাকে পড়ানোর সুযোগ পেলাম। কিন্তু আপনি এমন উত্তেজিত হ'য়ে কথা বলছেন রাস্তার লোকগুলো আমাদের দেখছে। একটা পুলিশ দেখছি এদিকে এগিয়ে আসছে। খৈনি টিপতে টিপতে নয়, চুয়িং-গাম্ চিবোতে চিবোতে।

অনুমান মিথ্যে নয়। পুলিশটি সত্যি এগিয়ে এলো। তেরছা চোখে একবার আমাকে দেখে নিয়ে মন্দোদরী দেবীর থুড়ি অমলিনা রয়ের সামনে ঝুঁকে প'ড়ে জানতে চাইলো সে কোনও কিছুতে সাহয্য ক'রতে পারে কিনা।

চোখে মুখে প্রথমে কিছুটা হতবুদ্ধির ভাব। পরমুহূর্তেই কৌতুক ও কৌতূহলের এক স্বচ্ছ হাসিতে মুখটি ভরিয়ে তোলেন অমলিনা রয়। বললেন: ধন্যবাদ! আমার বন্ধু আমার সঙ্গেই আছেন। অশেষ ধন্যবাদ আপনাকে।

আর একবার সেই তেরছা চাউনী। সন্দেহভরা দৃষ্টি। পুলিশটি মাথা নত ক'রে বিদায় নিয়ে চ'লে গেল। পুলিশ দেখছি সর্বত্রই সমান।

বেশ একটা উপভোগের হাসি আছে চোখের কোনে। আঙুল তুলে বললেন: দেখলেন আপনাকে আমি বিপদে ফেলতে পারতাম। ঘানি টানানোর চাবিকাঠি ছিল আমার হাতের মুঠোতে।

হেসে বলি: আমার কিন্তু হাসি পাচ্ছে।

—হাসি পাচ্ছে কেন? আপনাকে আমি বিপদে ফেলতে পারতাম একথা আপনি বিশ্বাস করেন না?

—একেবারেই! বিপদে তো ফেলেছেনই। আপনার অসাধ্য কোনও কর্মের কথা চিন্তা করাও আমার কল্পনাতীত। কিন্তু আমার হাসিটি ওখানে পায়নি!

—হাসি আপনার পেলো কোথায়?

-ঐ পুলিশটা আমাকে হাসিয়েছে। আমি আপনাকে জানি না, আপনিও আমাকে ছাই চিনেছেন, কিন্তু ঐ পুলিশটি আপনাকে চিনেছে ঠিক! 'একদম রোক্কে, জানানা হ্যায়' বলে আমার দিকে কেমন তেড়ে এলো দেখলেন না? মেয়েদের সম্পর্কে তুনিয়ার সব পুলিশের কি আশ্চর্য স্বাভাবিক শিভ্যাল্‌রি।

– কিন্তু আপনার সুবুদ্ধির উদয় হবে কবে বলতে পারেন? রাস্তা জুড়ে এভাবে হৈচৈ তুলে খুব সুবুদ্ধির পরিচয় দিচ্ছেন?

—আমারও ঠিক একই প্রশ্ন। আমরা রাস্তায় কেন? চলুন না কোনও কাফে-টেরাসে।

—আমার কফির তেষ্টা নেই।

—তেষ্টা নেই, চেষ্টা করবার ভান ক'রবেন। ভোলার চিঠিটা আপনার দেখা দরকার।

—ওসব দেখে আর কি লাভ!

—লাভ হয়তো নেই, কিন্তু আমি লোকসান থেকে বাঁচবো। চিঠি পড়া শেষ হ'লে আপনি কাফে ছেড়ে চ'লে যাবেন, আমি বাধা দেবো না। শুধু তাই নয়, ঘুরতে ঘুরতে অন্য কোথাও, অন্য কোন খানে যদি কোনও দিন দেখা হয়, সেদিন আপনি আমাকে না চিনলেও আমার কোনও অভিযোগ থাকবে না। সামান্য ভ্রূক্ষেপ না করলেও আমার খারাপ লাগবে না সেদিন। আপনাকে কথা দিচ্ছি আমি আপনার পথ আটকাবো না।

অমলিনা রয় নীরব। ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে এলেন আমার সঙ্গে। ভেবেছিলাম ভিজেছেন, মন হয়তো আর্দ্র হয়েছে কিছুটা। কিন্তু ফস ক'রে প্রশ্ন করলেন: ধরলাম আপনি অনেস্ট্, সো হোয়াট্, কি সম্পর্ক! আপনার সঙ্গে আমার কিসের খাতির ব'লতে পারেন?

—আবার শুরু ক'রলেন আপনি! তর্ক আমি ক'রতে পারি। তবে কুতর্ক আর কুযুক্তি ক্লান্তিকর। আপনার সঙ্গে সম্পর্ক আমি পাতাতে চাই না। তবে খাতিরটা দোষের নয়। ওটা নেহাৎই খাতিরের খাতিরে খাতির। কুলটুরের বুকের ওপর দিয়ে হেঁটে বেড়াচ্ছেন, এ সব আপনাকে ব'লে দিতে হবে?

কফি নিয়ে বসা গেল কাফে-টেরাসে। ভোলার চিঠিটা ওনার হাতে তুলে দিয়ে নিজে কফির পাত্রে ডুবে গেলাম।

আমার কফি শেষ হ'লো, কিন্তু অমলিনা রয়ের ভোলার চিঠি শেষ হ'লো না। চোখে মুখে কখনও বিস্ময়, কখনও কৌতূহল।

ঠোঁটে পাতলা হাসির টুকরো কখনও কখনও। বেশ কয়েকবার প'ড়লেন। বেশ খুঁটিয়ে খুঁটিয়েই প'ড়লেন। খসে পড়া উলের ঘর কাঁটাতে আলগোছে তুলে নিতে যে মনোযোগ ও স্থির দৃষ্টির প্রয়োজন ওনার আঁখিতে যেন অনেকটা তারই আভাস পেলাম।

চিঠিটি ভাঁজ ক'রলেন। খামে রাখলেন। মাথা নত ক'রে আমার হাতে তুলে দিলেন। শূন্য দৃষ্টি। ভাবলেশহীন চাউনী।

পকেটে রাখি চিঠিটা। নীচু গলায় বললেনঃ দেখুন মিঃ সেন, ইংরেজীতে একটা কথা আছে···

বাধা দিয়ে বলিঃ একটা নয়, অনেক কথা আছে। এখন সে কথা থাক। আপনার কফি ঠাণ্ডা হ'চ্ছে।

কফি শেষ হ'লো। ছেড়ে চলে এলাম কাফে-টেরাসে। চুপচাপ। কোনও কথা নয়। পথে নেমে বললামঃ আপনি যাবেন কোনদিকে ?

উত্তর নয়, পাল্টা প্রশ্ন এলো। বললেনঃ আপনি তো আমাকে কোনও প্রশ্ন করলেন না। চিঠিতো খালি পড়লামই। মতামতটি তো জানতে চাইলেন না ?

—ওসব জেনে আর কি লাভ !

—এ আপনার অভিমান।

—আপনার ওপর অভিমান ? আপনি বেশ মজার কথা বলেন দেখছি। উইদাউট্ টিকিটের প্যাসেঞ্জার টিকিট চেকারের ওপর অভিমান ক'রে হাওড়া থেকে দাম গোনে বুঝি ? দাবী বা অধিকার যেখানে অনুপস্থিত সেখানে অভিমানের প্রশ্ন ওঠে কি ? আপনার সাথে আমার কিসের সম্পর্ক। কিসের খাতির আপনার সঙ্গে বলতে পারেন ? ভোলার চিঠি আপনাকে আমি পড়তে দিয়েছি কন্‌সিলিয়েশন্ বা ক্ল্যারিফিকেশনের মন নিয়ে ঠিক নয়। সত্যি কথাটা আপনাকে জানাতে চেয়েছি শুধু। মিটিয়ে নেওয়া বা সহজ ক'রতে চাওয়া ঠিক সেই খাতিরেই। এখন মিটলো কিনা, আর সহজই বা হ'লো কতটা, সেটি জানবার কৌতূহল আমার নেই। আর তাতে কিছুমাত্র

হাতও নেই আমার। প্রথম দিন আপনি ব'লেছেন নাটক করবার শখ আপনার নেই। আর দেখুন, অভিনয়ও আমার ভালো আসে না। তবে এই মেলোড্রামার আড়বাঁশির আসল উৎস ধরতে পেরে আপনি কতটা আশ্বস্ত হ'লেন জানি না, তবে আমি নিশ্চিন্ত হয়েছি। ভোলা আমার অকৃত্রিম বন্ধু। আপনাকে অপ্রস্তুত করবার মানুষ সে নয়। আমাকে রিডিকিউল্ করবার তার তিলমাত্র আগ্রহ ছিল না। আপনার হোটেল আর কতদূর? আপনাকে একটা ট্যাক্সি ডেকে দেবো কি?

অমলিনা রয় মলিন। চলনে ক্লান্ত গতি। দ্বিধাজড়িত কণ্ঠস্বর: আপনাকে ধন্যবাদ! হোটেল আমি খুঁজে নেবো ঠিকই। কোনও প্রয়োজনই নেই ট্যাক্সির

ঠোঁটে হেসে বললাম: আমার পথ পূব মুখো।

নির্লিপ্ত এক হাসি ঠোঁটের কোনে ভেঙে পড়ে। আলতো চাউনী তুলে বললেন: বেশ তো, আপনি আসুন। নমস্কার!

আমার মাথা কিছুটা নত। বিদায় নিলাম একটি নমস্কারে!

ঢং ঢং ক'রে ঘড়িতে বারোটা বাজলো। মেঘলা দিন। ধূসর আকাশ। অপস্রিয়মান অমলিনা রয় বাঁকের মুখে অদৃশ্য হ'য়ে গেলেন। অগোছালো সেঁতসেঁতে ঠাণ্ডা বাতাসের পাগলামো সুরু হ'য়েছে। কফির টেবিলে ঝিম ধরেছে, কোনের দিকটা নির্জন। সন্ধ্যের জন্যে দম নিচ্ছে কাফে-টেরাসে।

আজ দুদিন রুডল্ফ্ বার্লিনে এসেছে। একই হোটেলে আছি, পাশাপাশি কামরায়। দুদিন ধ'রেই সে হাতের কাজ সারছে। সকালে চায়ের টেবিলে তাকে পাওয়া যায় না। লাঞ্চেও তাকে পাওয়া দুষ্কর। ডিনার শেষ ক'রে বহু রাত্রে সে হোটেলে ফিরছে। কি কাজ করছে সেই জানে।

কথা প্রসঙ্গে অমলিনা রয়ের কথা তার কাছে আদ্যোপান্ত বর্ণনা ক'রেছি। রুডল্ফ্ শুধু থ হ'য়ে শুনলে। তারপর আমাকে কৃত্রিম ভৎর্সনা করে বলেছে ঃ হাতের মুঠিতে এনে ছেড়ে দিলে? তোমার মগজে দেখছি কিছুই নেই।

সরল ও সহজ প্রকৃতির মানুষ রুডল্ফ্। কথাবার্ত্তায় চাপল্য আছে। অস্থিরতাও আছে সেই সঙ্গে। বেহিসাবী এই চপলতাটুকু আমার ভালো লাগে।

আমাকে মৌন দেখে ওর প্রগল্ভতায় পেয়ে বসে। বললে ঃ সত্যি কথা বলতে কি, ভারতীয় মেয়েদের যে এত সুন্দর দেখতে হয় আমার ধারণাই ছিল না আগে। মেয়ে দেখে দেখে চোখ প'চে গেল, কিন্তু অমন গড়ন, অমন চোখ··· ।

বাধা দিয়ে বলেছি ঃ খুব পছন্দ হ'য়েছে দেখছি। বল তো তোমার জন্যে ঘটকালি করি।

অপ্রস্তুত হ'য়ে রুডল্ফ্ উত্তর দিয়েছে ঃ আমার তো আর মাথা খারাপ হয়নি। অ্যানা তাহলে··· ! চল না যাই ফ্রাঙ্কফুর্ট-এ, আমার দেশের বাড়ী সেখান থেকে বড় দূরের পথ নয়। আমার স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ হবে। অ্যানা তোমাকে দেখলে খুবই খুশী হবে। বড় বড় শহরই দেখেছো এদেশে, ছোট জায়গা, গ্রাম, তুমি কিছুই দেখোনি এখনও। ওসব না দেখলে পুরো ছবিটা তুমি এদেশের পাবে না।

জবাবে বলেছি ঃ তোমার সঙ্গে ঘুরবো আমি, তোমার স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করবার আমার ইচ্ছে রইলো, কিন্তু তোমার হাত খালি হবে কবে ?

আজ কিন্তু সকাল থেকেই রুডল্ফ্ আমার সঙ্গে রইলো। কাফে-টেরাসে, কুডামের পথে পথে সারাটা সকাল ঘুরে বেড়ালাম।

লাঞ্চের পর আমার ঘরে বসেই নানা আলোচনা চলছিল। সন্ধ্যেতে সিনেমা না অপেরায় যাব তাই নিয়ে কথা চলছিলো।

নিজের কথাই থামিয়ে দিয়ে রুডল্ফ্ হঠাৎ ব'লে উঠলো ঃ তুমি রেজীতে গেছো ? বল হাউস রেজীতে ?

আমি মাথা নাড়লাম। অবাক হ'লো রুডল্ফ্। বলে ঃ বার্লিনের এই আজব নাচঘর তুমি দেখনি এখনও ? এমন মজার জায়গা নিশ্চয়ই জীবনে তুমি দেখোনি। বার্লিনে এসে রেজী দেখবে না সে কি হে ?

বললাম ঃ মেয়েরা আকাশে পা ছুঁড়ছে। মেয়েদের ঐ খেমটা নাচ আমার ভালো লাগবে না। অন্যত্র কোথাও চলো।

রুডল্ফ্ হেসে বলে ঃ মেয়েদের খেমটা নাচ অবশ্য আছে। কিন্তু এমন সব তাজ্জব ব্যাপার দেখবে যা জীবনে ভুলতে পারবে না।

বললাম ঃ নাইট ক্লাবে তুমি সন্ধ্যে নষ্ট ক'রবে ? তার চেয়ে এক বোতল মোজেল নিয়ে বসা যাক কাফে-টেরাসে। প্যারীতে তোমার স্টুডিও'র সেই বাকি কথাগুলো শোনা হয়নি।

মাথা দুলিয়ে রুডল্ফ্ বলে ঃ বলবো হে, বলবো। আজ কিন্তু ওখানেই চল। আর মোজেল তোমাকে আমি ওখানেই খাওয়াবো। আসলে তোমার হয়েছে বাতিক, কুডামের পথে পথে ঘুরে বেড়ানোতেই তোমার আনন্দ। বলবো সত্যি কথা ? হলফ ক'রে বলো তুমি বিশেষ একজনকে রাস্তায় খোঁজো না ? পথের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে তুমি কিসের সন্ধান করো আমি বুঝি না, না ?

হেসে ফেলতে হয় আমাকে। রুডল্ফ্-এর সহজ কথায় রাগ করবার

উপায় নেই। বলি ঃ তুমি অনেক কিছুই ভাবছো জানি, কিন্তু ওসব কথা আমি সম্পূর্ণ ভুলেই গেছি।

রুডল্‌ফ্‌ বলে ঃ অবশ্য তোমাকে আমি দোষ দেবো না। অ্যানার সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ হয় হামবুর্গ-এ। ছুটির পর প্যারীতে ফিরে গেলাম, কিন্তু কিসের স্টুডিও, কিসের প্যারী? টিকতে পারলাম না। মিথ্যে অজুহাত নিয়ে হামবুর্গে ফিরে এলাম। অ্যানার বাপ ছিল একজন সাংঘাতিক পাষণ্ড। ঐ একটা ফ্যাসিষ্ট বোধ হয় যুদ্ধের পরেও বুক ফুলিয়ে হামবুর্গের সর্বত্র হাঁটাচলা ক'রছিল। বলবো হে বলবো! চলই না একবার। অ্যানা বলে···

নিজের কথাকে জোরালো করবার জন্যে, আপন বক্তব্যকে সুন্দর ও রসগ্রাহী করবার খাতিরে রুডল্‌ফ্‌ তার স্ত্রী অ্যানার প্রসঙ্গ তুলবেই। বুঝি রুডল্‌ফ্‌ অ্যানাকে খুব ভালোবাসে। হাজার কাজের মধ্যেও সে রোজ চিঠি লিখে অ্যানাকে। বাড়ীর অবস্থা ভালো। কথাবার্তায় তাই মনে হয়। তবে মা-বাপের কাছে বৌকেই বা ফেলে রেখেছে কেন, বুঝি না। এ দেশে তো এ রকম রীতি নয়।

তুজনের মত একটি ফ্ল্যাট। একটি 'ওপেল' গাড়ী। একটি কুকুর, শোবার ঘরে তুটি সিঙ্গিল খাট। তার মাঝখানে একটি টেবিল, সেখানে একটি ফোন। ঘরের চারদিকে অতি সুন্দর ফুরফুরে পর্দ্দা। ভারী কার্পেট-মোড়া মেঝে। এক প্রান্তে রাখা রেডিও। ডিনার টেবিলে তুজনের মত ব্যবস্থা। প্রমাণ মাপের রিফ্রিজারেটর, অতি সুন্দর ডিনার সেট্ কাচের আলমারিতে রাখা। টেবিলে সাজানো ফল, সিঙ্গাপুরী কলাও। বাইরের ঘরে আরও লোভনীয় সোফা সেট্, আরও জমকালো টেলিভিশন। বুক শেল্‌ফ্‌ এক দিকে রাখা, তাতে অল্প কিছু বই। সচিত্র একটি বই কার্পেটের ওপর ফরফর ক'রে উড়বে। মোজা বোনবার সর্বাধুনিক প্যাটার্ন থাকবে যাতে।

সমস্ত পরিবেশ ঘিরে 'আমরা তুজনে', 'আমরা তুজনে,' ভাব।

রুডল্ফ্‌কে তেমন এক পরিবেশে মানাতো ভালো। আর সেটাই স্বাভাবিক! তার ভবঘুরে জীবন কিছুটা বেমানান।

হয়তো সবে দেশে ফিরেছে, নিজেকে গুছিয়ে নিতে ব্যস্ত। পাঁচজনের মত ছককাটা জীবন রুডল্ফ্‌-এর নয় জানি। সিনেমা জগৎ সর্বত্রই বুঝি সমান। অনেক কথা, আর মিথ্যে আশার এখানেও বোধ হয় শেষ নেই।

শেষ পর্যন্ত রুডল্ফ্‌-এর কথাতেই রাজী হ'তে হলো। বল হাউস রেজীতে যাওয়াই ঠিক হ'লো শেষে। বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয় নাকি সেখানে। আর অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের তাগিদে নতুন কিছু দেখতেই তো আমার বার্লিনে আসা।

নাইট ক্লাবের চোখ ঝলসানো সমারোহ, উদ্‌ভ্রান্ত যৌবনের চূড়ান্ত অপচয়, আর পেশাদারী তরুণীর বিলোল কটাক্ষের মধ্যে হয়তো নতুন কোনও মানুষের সাক্ষাৎ মিলবে। হয়তো অজ্ঞাত কোনও নতুন কাহিনী শোনা যাবে নিঃসঙ্গ কোনও মানুষের ঠোঁটে। কোনও মায়ের অনুতপ্ত হৃদয়ের বিষণ্ণ সুর হয়তো কানে আসবে রেজীর অতি নিকটেই। রুশ সীমানা থেকে পলাতক কোনও যুবকের মর্মান্তিক অভিজ্ঞতার গল্প হয়তো শোনা যাবে। কোলনের এক রূপাজীবার দেহে প্রথম কবে এক মার্কিন সৈনিকের পাশব অঙ্গীকার কি ভাবে তার সুন্দর জীবন বিষাক্ত বিষে ভরিয়ে তুললো, কি বিচিত্র জীবনেতিহাস তারপর, হয়তো জানতে পাবো।

আমার ঝুলিতে বহু কাহিনী, বহু অভিজ্ঞতা আজ সঞ্চিত হ'য়েছে। বহু মানুষের হাসি ও অশ্রু, আশা-নিরাশা ও শক্তি ও সাহসের নানা কথায় আমার থলি আজ ভরাট। হয়তো এখন ও কিছু জায়গা আছে। আরও কিছু স্থান আছে ঝুলিতে। সে শূন্যতা আমার ভ'রে তুলতে হবেই।

বল হাউস রেজী।

মাটির তলায় ট্রেন বদল ক'রতে ক'রতে অবশেষে এসে পৌঁছোলাম

আজব নাচঘরে। ঘড়িতে রাত সাড়ে আটটা। লোকজনের আসা সুরু হ'য়েছে অনেকক্ষণ। শুধু যুবক যুবতীর ভিড় নয়। বৃদ্ধেরা আছেন, বৃদ্ধারাও। প্রবেশ মূল্য এক মার্ক।

বিরাট এক নাচঘর। মাঝখানে অনেকখানি জায়গা নাচের জন্যে ছেড়ে দেওয়া। তিনদিকে কাঠের নীচু পাঁচিল ও তার পাশে রেস্তরাঁর ঢঙে তিন সারি টেবিল ঘিরে চেয়ার। অপর দিকে বিরাট স্টেজ্ নীচে অর্কেস্ট্রা।

বৈচিত্র্য কিছু আছে বৈকি। দুদিকের দেয়ালে নানা রঙের আলো। মাঝে মাঝে বদলাচ্ছে। সেখানে টাঙানো বিরাট বিরাট ছবি। ঠিক ছবি নয়, অর্দ্ধনগ্না নৃত্যরতা নারীর অবয়ব। তারার মত আলো ঝুলছে ছাদ থেকে। মোটা দাগের এক স্ফূর্তি যেন সমস্ত পরিবেশ ঘিরে রমরম ক'রছে। কোনের দিকের এক টেবিল দখল ক'রে মোজেল নিয়ে বসা গেল।

প্রত্যেক টেবিলের পাশে একটা পোস্ট্। তার ওপরে আলোর মধ্যে কালো দিয়ে টেবিলের নম্বর লেখা। দূর থেকে যে কোনও নম্বর পড়া চলে। প্রতি টেবিলে ফোন আছে। আরও আছে কমপ্রেস্ট্ এয়ার চালিত টিউব পোস্ট্। যে কোনও টেবিলের উদ্দেশ্যে চিঠি লিখে একটি প্ল্যাস্টিকের খাপে ভ'রে টিউবের মধ্যে ছেড়ে দিলে, এয়ার সাকশনে সেটি সেণ্ট্রাল স্টেশনে চ'লে যাবে। সেখান থেকে যাবে অ্যাড্রেসীর টেবিলে।

মেয়েদের সঙ্গে আলাপ করবার এ এক যান্ত্রিক মিডিয়াম। গ্যাঁড়াকল বলে কাকে ?

অল্পক্ষণের মধ্যেই টেবিল পূর্ণ হ'য়ে গেল। আমার কিছুটা দূরে দুটি ভারতীয় ভদ্রলোক আমার চোখে প'ড়লো। দেখে মনে হ'লো উদ্‌গ্রীব হ'য়ে মেয়ে খুঁজছেন।

এমন সময় শোঁ শোঁ শব্দ তুলে ঝপ ক'রে প্ল্যাস্টিকের পিয়ন এসে হাজির হ'লো। খাপের মধ্যে চিঠি। ২০৯ নম্বর টেবিল

থেকে এক সুন্দরী লিখছেনঃ সামান্য কিছু জর্মন ব'লতে পারেন আপনি ?

রুডল্‌ফ্‌ হাসছে। বলেঃ এ রকম মজার ব্যাপার দেখেছো কোথাও ? এ রকম আজব জায়গা আর কোথাও পাবে না।

চিঠির কোনও উত্তর না দিয়ে সিগারেট আর মোজেলের অনুভূতি উপভোগ করতে থাকি। কিন্তু প্ল্যাষ্টিক পিওন আমার মত নির্লিপ্ত নয়। আবার সেই শব্দ। সেই আগের মত চিঠি। এক সুন্দরী লিখছেনঃ আপনি চুপচাপ কেন ? আলাপ করতে ইচ্ছে হচ্ছে যে !

উত্তর দিলাম না এবারও।

ঠিক এই সময়ই নজরে এলো, ভারতীয় দুই ভদ্রলোক হৈ চৈ বাধিয়ে তুলেছেন। একজন বোধ হয় দাক্ষিণাত্যের উপকূল থেকে এসেছেন। খর্ব, লীনদেহী, আমোদের আহ্লাদে খিল খিল ক'রে হাসছেন। অপর জনও অবাঙ্গালী, সে একদম লাফাচ্ছে। ঘাড় গুঁজে হয়তো কোনও চিঠির জবাব লিখছে।

রুডল্‌ফ্‌ বলেঃ এক কালে এখানে এসে কত কি ক'রেছি। সে কথা ভাবলেও হাসি পায়। মেয়ে-পুরুষের হেঙ্গলামো দেখলে গা ঘিন ঘিন করে। অ্যানা একদিন ক'রেছে কি জানো··· !

ভারতীয় দ্বিতীয় ভদ্রলোক দেখলাম আমার টেবিলের কাছে এসে দাঁড়ালেন। বললেনঃ কি স্যার, আপনি দেখছি অনেক চিঠি পাচ্ছেন ! কই উত্তর তো দিচ্ছেন না। আমরা দুজনেই এসেছি প্যারী থেকে। রেজীতে আর কি দেখবেন আপনি, এর চেয়ে ঢের দেখে এলাম সেখানে।

প্যারী সম্পর্কে দু'চার কথা জিজ্ঞাসা ক'রলাম। কিন্তু সাংঘাতিক রকম হতাশ হলাম। দেখলাম ভদ্রলোক মেয়েদের খ্যামটা নাচ আর অশ্লীল অঙ্গভঙ্গী ছাড়া বিশেষ সেখানে কিছুই দেখেন নি। ফোর্লি দেখতে গিয়ে দূরবীন ভাড়া করে উলঙ্গ নারীর দিকে তাকিয়ে দিনের পর দিন কাটিয়ে দিয়েছেন। বস্তিলের নাম শোনেন নি। ল্যুভর

সম্পর্কে প্রশ্ন করতে খিল খিল করে হেসে বললেন: আপনি যাননি, কিন্তু খবর দেখি রাখেন বিস্তর। ল্যুভর্ আবার কি? এখানকার মেয়েগুলোও বেশ। কিন্তু আপনি অমন চুপচাপ কেন?

আবার বোধ হয় চিঠি এলো ওদিকে। আমার জবাবের অপেক্ষা না করেই নিজের টেবিলের দিকে দৌড়ে গেলেন। হৈ চৈ বাধিয়ে তুলেছেন দুজনে।

দু'রকমের মেয়েরা আসে রেজীতে। পুরুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাতে কুমারীরা ব্যগ্র হবেই। তাদের প্রধান উদ্দেশ্য স্বামী শিকার। আলাপের মাধ্যমে ঘনিষ্ঠতা হয়। তখন দুজনেই বিচার করে, বিয়ে ক'রলে সুখী হবে কিনা। যদি দুজনের একজনেরও মনে সন্দেহ হয়, ঘনিষ্ঠতা মিলিয়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে। শেষে শুধু থাকে দেখা হ'লে সামান্য একটু হাসা। সৌজন্যসূচক আঙুল নাড়া।

আর এক শ্রেণীর তরুণীর সাক্ষাৎ মেলে এখানে। স্বামী শিকার তাদের উদ্দেশ্য নয়। তাদের উদ্দেশ্য আমোদ। হৈ হুল্লোড় আর বেহায়াপণা। সে আমোদ শেষে এসে দাঁড়ায় প্রমোদে। বহু তরুণের হাত ফেরতা হ'য়ে সে হয়ে দাঁড়ায় জনসাধারণের ব্যবহার্য সামগ্রীবিশেষ। প্রচুর অভ্যাসে প্রলোভনের ক্ষমতা বাড়ে। আর তাদের শিকার বিকারগ্রস্ত পুরুষ মানুষ। তাদের বিলোল কটাক্ষে আমাদের দেশের নিরীহ ছেলেরাই বা কি কম খপ্পরে পড়ে?

সারা পরিবেশ ঘিরে ওয়ালজ-এর পাগলামো জমে উঠলো। তরুণ তরুণীদের ফোন আর চিঠি চালাচালি চলে বিরামবিহীন। জোড়ায় জোড়ায় নাচ চ'লেছে। ষ্টেজের ওপর নৃত্যছন্দে জলের ফোয়ারাটি বড় রমণীয়। সেই সঙ্গে হালকা আলোর কত বিচিত্র সমারোহ। এ এক আজব জায়গা। সব মিলিয়ে আমাকে যেন অবাকই ক'রেছে, বল হাউস রেজী।

এমন সময় আমার কোটের আস্তিনে আঘাত করলে রুডল্ফ্। টেবিলের ওপর ঝুঁকে প'ড়ে বিস্ফারিত নেত্রে শুধু বলেঃ হের জেন,

২২৮ নম্বর টেবিল তোমার নজরে এসেছে? আমার চোখকে আমি আর কত অবিশ্বাস ক'রবো বলতে পারো?

বেশ কিছুটা দূরে কোনের দিকের শেষ সীমানায় আমার দৃষ্টি স্থির হ'য়ে গেল।

টেবিলের মালিক আর কেউ নন— অমলিনা রয়। নৃত্যরতা জলের ফোয়ারাটির দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছেন। অবিমিশ্র এক খুশীর হাসি সারা চোখে মুখে জড়িয়ে আছে। শাদা শাড়ীর সঙ্গে মানিয়ে পরা বিচিত্রিত একটি পশমের খাটো ক্লোক। কানে লম্বাটে ধরনের মুক্তো বসানো কুণ্ডল। পাশে এক সুদর্শন জর্মন যুবক।

রুডল্‌ফ্‌ বলে: ফোন কর।

বিস্মিত হ'য়ে বলি: ক্ষেপেছো তুমি, একটা হাঙ্গামা বাধবে শেষে। অনেক হ'য়েছে, আর নয়।

রুডল্‌ফ্‌ বলে: এখানে ফোন করা দোষের নয়। বাইরের ফোন আর রেজীর ফোনে তফাৎ আছে। তোমার ইচ্ছে আছে জানি, এমন সুযোগ তুমি ছেড়ো না হের জেন। মেয়েদের তুমি ছাই চেনো। মেয়েদের মনটা অনেকটা...

কেমন যেন দুর্বুদ্ধি চাপলো মাথাতে। আমায় যেন কিসে পেলো। রিসিভারটি তুলে নিয়ে ডায়েল করি। অমলিনা রয়ের ফোন বেজে উঠতে দেখলাম। আমাকে কিছু বলবার আগেই চোস্ত জর্মনে প্রশ্ন করলাম: অল্প কিছু জর্মন ব'লতে পারেন আপনি? নাচ জানেন?

অপর প্রান্ত থেকে সুরেলা কণ্ঠ ভেসে এলো: আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ! এদেশের নাচের সঙ্গে আমার পরিচয় নেই। কোন্‌ টেবিল থেকে ব'লছেন আপনি?

আমার ডান দিকে এক যুবক অনেকক্ষণ রিসিভার ধরে বক বক ক'রছিলেন। কোনও এক বিশেষ তরুণীকে হয়তো ঘায়েল ক'রতে চাইছেন। নিজের পরিচয় গোপন ক'রে তার টেবিলের নম্বরটি অমলিনা রয়কে জানিয়ে দিলাম। অমলিনা রয়ের জবাব এলো:

আপনার সঙ্গে কথা বলে খুব খুশী হলাম, কিন্তু এদেশের নাচ আমার শেখা নেই। আমি নিতান্তই দুঃখিত।

আমি যেন কেন নিজেকে সংযত করতে পারি না। সোজা বাঙলাতেই বললাম : এদেশের নাচ না জানলেও ক্ষতি নেই, ভাঙড়া, টাঙড়া আপনার আসে কেমন ?

রিসিভারটি হাত থেকে যেন খসে পড়লো অমলিনা রয়ের। মাথা উঁচু করে সামনে-পেছনে এদিকে সেদিকে দেখলেন কিছুক্ষণ। সামনের মোটা ভদ্রলোকের বিপুল দেহকে সুমুখ করে আমি আড়াল করেছি নিজেকে। টেবিলের ওপর শুয়ে প'ড়ে রুডল্‌ফ্‌ কৌতূহলী দৃষ্টিতে বলে : কি কথা হলো ? অন্য টেবিলের নম্বর বললে কেন ? সহজ ব্যাপার জটিল করে তোলো কেন ? তোমার মতলব আমি কিছু বুঝি না।

রুডল্‌ফ্‌কে ইশারায় চুপচাপ থাকতে বললাম। দরজার অন্তরালে নিজেকে আড়াল ক'রে সামান্য মুখ বার ক'রে শিশুরা যেমন লুকোচুরি খেলে, রুডল্‌ফ্‌ সেই ভাবে অমলিনা রয়কে দেখছিলো।

ওয়ালজ্‌ থেমে এলো। কিছুটা যেন ঝিমিয়ে পড়লো নাচের উঠোন। টিউব পোস্টের শরণাপন্ন হলাম। কপাল ঠুকে লিখে পাঠালাম : সঙ্গের দশাননটি কে ?

টেবিলের নম্বরটি এবার গোপন করলাম না।

একটি প্রবল উত্তেজনা নিয়ে শুধু সময় গুনি। বেশ কিছুটা দেরি ক'রে প্ল্যাস্টিকের পিত্তন যান্ত্রিক আওয়াজে আমার টেবিলে এসে পড়লো। অমলিনা রয়ের এক লাইনের লেখা : এখানে এসেছেন কি দেখতে ?

জবাব পাঠালাম : কথা ঘোরাবেন না, সঙ্গের দশাননটির কি পরিচয় ? আপনিই বা কি দেখছেন এখানে ?

উত্তর এলো : আপনার কৌতূহলে রুচির বড় অভাব দেখলাম। দেখছি আর অবাক হচ্ছি। ভাবছি, পুরুষগুলো কত বেকুব হ'তে পারে

আবার জবাব গেল ঃ আপনারা তার রসদ যোগান দিলে পুরুষ মানুষগুলো কাঁহাতক আর স্থির থাকতে পারে। চুপচাপ ব'সে কেন? নাচলে আপনাকে আরও অনেক ভালো দেখাবে।

উত্তর এলো ঃ সবাই নাচলে নাচাবে কে?

উত্তর পাঠালাম ঃ কত জনকে নাচালেন?

জবাব এলো ঃ আপনার তাতে প্রয়োজন?

জবাব দিলাম ঃ ভোলার কাগজে নাকি এডিটোরিয়াল-এর পাশে আমার জন্য জায়গা হ'য়েছে। প্রশ্ন আমার নিজের নয়, সাংবাদিকের দৃষ্টিকোন থেকে জানতে চেয়েছি। আপনার নাচানাচির খবর দেশের বহু সবলারও মর্মবেদনার কারণ হবে।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে জবাব এলো ঃ অধিকারের সীমারেখা আপনি ছেড়ে এসেছেন বহু আগেই। আপনার মর্মান্তিক কৌতুক বন্ধ করুন। তর্ক করবেন না।

লিখে পাঠালাম ঃ তর্কটা আমার আসে। ওটা আমার ব্যসন, তাই বশে আনতে পারিনি। তবে কুতর্কের সঙ্গে পেরে উঠবো না। আপনার কথাগুলো বাতগ্রস্থ। বাতিক দোষের নয়, কিন্তু বাতব্যাধি অসহ্য।

চিঠি এলো এবার। অমলিনা রয় লিখেছেন ঃ বাতব্যাধির দাওয়াই আমি ওষুধের দোকানে খোঁজ করবো। কাল সকালে আপনার পাশের বন্ধুটিকে আমার হোটেলের লাউঞ্জে ঘুর ঘুর করতে দেখলাম। তখনই বুঝলাম আপনার কোনও মতলব আছে। ঐ ঢাকের কাঠিটি আমদানি ক'রলেন কোথা থেকে?

আমার জবাব ঃ আপনার কথায় মনে হ'লো দাওয়াইওয়ালার দোকানগুলো রোগ সারানোর পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু চিকিৎসকের প্রয়োজন আছে দেশে, একথা আপনার জানা থাকা দরকার। ছুনিয়ার লোক হোটেলের লাউঞ্জে ঘুর ঘুর ক'রছে আপনার জন্যে, এ আপনার হাস্যকর বিলাস।

জবাব ফিরে এলো না। ব্যস্ততার লক্ষণ দেখলাম ওদিকে। আসন ছেড়ে উঠেছেন অমলিনা রয়। সঙ্গের সঙ্গীটিও। চেয়ারের হাতলে রাখা পুরু ওভারকোটটি হাতে নিয়ে কাঠের পাঁচিলের অপর প্রান্তে চ'লে গেলেন। নাচঘর ছেড়ে চ'লে গেলেন অমলিনা রয়।

পরিশ্রান্ত বল হাউস রেজী।

অবসন্ন সঙ্গীতের এক ক্লান্ত রেশ সারা পরিবেশ শ্রান্তিতে ভরিয়ে তুলেছে। অনেক আসন খালি। অলস ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠছে শূন্য টেবিলের ছাইদান থেকে। সুর ও সুরায় বিভ্রান্ত মানুষের চোখে অবসাদ নেমে এসেছে। জলের ফোয়ারা এলোমেলো আলোর আবর্তে প'ড়ে আগের মত যেন হাসছে না।

দুর্বল হাসির শব্দে ফিরে তাকাই। কিছুটা দূরে খর্ব লীনদেহী মানুষটি শিষ্টাচারের শেষ সীমারেখা অতিক্রম ক'রেছেন এতক্ষণে। জড়ানো কথা। টাই খুলে গেছে গলার। অবিন্যস্ত মাথার চুল ছোট কপালটিকে ঢেকে ফেলেছে। সঙ্গে একটি মেয়ে। টকটকে লাল আঁটো পোষাক। শীর্ণ দু'বাহুর মধ্যে নির্লিপ্ত যুবতীর দেহটি টেনে নিয়ে পাগলের মত আদর করছে।

ঠিক যেন আদর ব'লে মনে হ'লো না। এ আমোদ নয়। প্রমোদও নয় এ। স্ফূর্তিরই বা এ কি অদ্ভুত প্রকাশ?

মনে হ'লো, জনবিরল প্রান্তরে এক মৃত পশুর উচ্ছিষ্ট দেহে দিশেহারা হ'য়ে গেছে লোভাতুর এক বুভুক্ষু শৃগাল।

কাল প্রভাতে হয়তো ইনি বার্লিন ছেড়ে চলে যাবেন। অন্য কোথা, অন্য কোনো খানে। ফ্রাঙ্কফুর্ট, হামবুর্গ বা বন্ থেকে লোভনীয় চাকরী নিয়ে দেশে ফিরে যাবেন আগামী কোনও একদিন। শীততাপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে আকর্ষনীয় চেয়ারে বহাল হবেন কলকাতায়, বম্বে বা দিল্লীর কোনো খানে।

অনেক কিছুই সঙ্গে নিয়ে যাবেন ইনি। বৃদ্ধ পিতাকে দেবেন বহু

দূর দেশ থেকে আনা, বহু ক্লেশে পাওয়া নিজের মহার্ঘ সার্টিফিকেট। জুরিখ থেকে ঘড়ি নেবেন নিজের জন্যে। লোভনীয় লাইকা ক্যামেরা ছোট ভাইয়ের হাতে তুলে দেবেন।

কিন্তু স্ত্রীকে দেবেন কি? সেটি হয়তো ইনি অতি সহজেই নিয়ে যাবেন সঙ্গে। এদেশের লোক বাধা দেবে না। দুর্ধর্ষ শুল্ক অফিসার তার কোনও হদিশ পাবে না। কোলোনের এক অন্ধ গলির সেঁতসেঁতে ঘরের উষ্ণ বিবর্ণ এক সুন্দরীর দেহের বিষাক্ত কীট নির্বিঘ্নে এনার পক্ষে হয়তো তার স্ত্রীর দেহে তুলে দেওয়া সম্ভব হবে।

—এবার ফেরা যাক হের জেন। রুডল্ফ্-এর ক্লান্ত কণ্ঠস্বর।

ঘড়ির দিকে তাকানো অসম্ভব। তারিখ পাল্টে গেছে অনেকক্ষণ। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াই। ওভারকোটটা হাতে তুলে নেই। পথের উদ্দেশ্যে পা বাড়াই।

পেছনে পড়ে রইলো নাচঘর। পরিশ্রান্ত ফোয়ারার অফুরন্ত চূর্ণ বারিধারা পেছনে ফেলে এলাম। ছেড়ে চ'লে আসি অবসন্ন বল হাউস রেজী।

পর্দ্দা সরিয়ে আমাকে দেখে কেমন যেন একটা হোঁচট খেলেন অমলিনা রয়। কয়েক মুহূর্ত পর অস্ফুট স্বরে বললেন : আপনি···!

সংকোচের হাসি টেনে বলি : আপনার আপত্তি থাকলে এখননি আমি ফিরে যেতে পারি।

বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বলেন : আমার আপত্তি থাকলে ফিরে যেতে পারেন। এই কথা বলতে এসেছেন আপনি?

মাথা নেড়ে বলি : একেবারেই।

হাতটা খ'সে পড়ে পর্দ্দার প্রান্ত থেকে। দ্বিধা জড়িত কণ্ঠে বলেন : আমি কি আসতে ব'লেছি আপনাকে?

ঠোঁটে হাসি টেনে বললাম : বলেন নি, বলা উচিত ছিল।

দু'পা পিছিয়ে একটু সরে দাঁড়িয়ে বলেন : আপনি অবাক করলেন আমাকে। ভেতরে আসুন।

পর্দ্দা সরিয়ে ঘরে প্রবেশ করি। ঠিক প্রবেশ নয় অনুপ্রবেশ। মাঝারী গড়নের সুন্দর সাজানো ঘর। প্রয়োজনীয় আসবাবে ঠাসা। ঽম বিছানার ওপর [illegible] রঙের পাতলা চটি খাতা। পাশে খোলা কলম।

সোফায় এসে বসলাম। সুমুখে সোফার হাতল ধ'রে এসে দাঁড়ালেন অমলিনা রয়। পরনে গেরুয়া রঙের তাঁতের শাড়ী। সবুজ পাড়। কালো একটি পশমের চাদর গায়ে জড়ানো। দুইপ্রান্ত ঘেঁষে মাথার চুল আঁটো ক'রে বাঁধা। মাটির দিকে স্থির দৃষ্টি রেখে বললেন : আমার কামরা খুঁজে পেতে আপনার অসুবিধে হয়নি?

—পরশু নাচ ঘরে আপনার কাছেই আপনার খবর জানতে পেলাম। বন্ধুটিকে জেরা ক'রে হোটেলের হদিশ খুঁজে পেতে দেরী হ'লো না। কাজের খাতিরে এই হোটেলের কারো কাছে সে

এসেছিলো। আপনাকে সে দেখেনি। আপনার কামরা খুঁজে পেতে আমার মোটেই দেরী হয়নি। কিন্তু আপনি খুশী হয়েছেন ব'লে মনে হচ্ছে না।

সামান্য ঠোঁটে হাসলেন অমলিনা রয়। বললেন: তাতে আপনি খুশী হবেন কতটুকু? অপরকে বিব্রত ক'রে আপনি আনন্দ পান, অন্যকে রাগিয়ে দিয়েই আপনার তৃপ্তি।

বললাম: আমি কিন্তু নিরুপায় হ'য়ে আপনার এখানে এসেছি। বিপদে প'ড়েই আপনার শরণাপন্ন হয়েছি। অতি মাত্রায় হাঁপিয়ে পড়েছি আমি।

ঠোঁটের হাসি গোপন করবার ব্যর্থ চেষ্টা ক'রে অমলিনা রয় সোফায় এসে বসেন। শাড়ীর আঁচলের এক প্রান্ত সোজা ক'রতে ক'রতে বলেন: দৌড়োতে গেলেন কি দেখে?

জবাব দিলাম: দৌড়োনো দোষের নয়। তবে এই ভারি ভারি শীতের পোষাক, অনভ্যস্ত সাহেবীয়ানা, উৎকট ভাষা আর সাদা সাদা মানুষের ভিড়ে দম বন্ধ হবার উপক্রম। আপনার সঙ্গে দু'দণ্ড ব'সে তাই বাঙ্গলায় বক বক ক'রতে এলাম।

অচঞ্চল দৃষ্টি মেলে বললেন: কবার দেখা হ'য়েছে আপনার সঙ্গে, কিন্তু আপনার এলোমেলো প্রলাপের স্রোতে আলাপের কোনও সুযোগ ঘটে ওঠেনি।

বাধা দিয়ে বললাম: একেবারে ভুল কথা। মামুলি কায়দায়, মান্ধাতার আমলের ঢঙের আলাপ আমি অত্যন্ত অপছন্দ করি। লয়রাজ ওস্তাদের সুরের ক্লান্তিকর জের টানার মত সে আমার কানে অসহ্য। হাতের কাজের লোক আমি, আবেগের চেয়ে বেগে আমি আস্থাশীল। তাই এক লাফে হুড়মুড় ক'রে আপনার হোটেলে আসতে আমার বাধে নি।

তুচ্ছ হেসে বললেন: আপনার এই বেহিসাবী বেগ হয়তো দোষের নয়, কিন্তু আবেগের কোনও প্রয়োজন নেই ব'লতে চান?

বললাম ঃ হয়তো আছে। অন্যত্র, অন্য সময়ে সে ভাবা যাবে। সারাক্ষণ তা নিয়ে নাড়াচাড়া ক'রবে, আঁকিয়ে, লিখিয়ে আর গাইয়ে। কিন্তু এই মুহূর্তে আবেগ বা বেগে আমাদের প্রয়োজন নেই। অবশ্য সভ্যতার জ্বালা অনেক। পেশাদারী ভদ্রতা তার কুটীর শিল্প। এটিকেট-এর কন্‌ভার্টার্‌-এ বিলাপ তাই আলাপ হিসাবে পরিবেশন করা হ'চ্ছে। নিতান্ত বিরক্তি প্রকাশ পাচ্ছে ঠোঁটে হাসা আসক্তিতে। বিবেক সেখানে নির্বাসিত, আশ্চর্য ভাবে অনুপস্থিত। আপনার সঙ্গে আমার আলাপ হয়নি বলতে চান ?

হাসি এবার যেন আর চাপা সম্ভব হলো না অমলিনা রয়ের। বাঁ হাতের মধ্যমাটি নিরীক্ষণ করা শেষ ক'রে চোখ তুলে বলেন ঃ তাহলে বিবেকের দংশনেই আপনার আমার এখানে আসা ?

মাথা নেড়ে বলি ঃ ওটার উৎপত্তি অনুতাপ থেকে। ভাবপ্রবণ মানুষের হাস্যকর আত্মপ্রবঞ্চনা। আমার কাছে নেহাৎই সময়ের বেহিসাবী বাজে খরচ। যাক সে কথা, আমি এসেছি পেটের টানে, আপনার এদেশে আসা কেন ?

পূর্বের মত হেসে বললেন ঃ প্রাণের টানে আসিনি, সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।

কৃত্রিম শঙ্কা প্রকাশ করি। বলি ঃ এতেও আমার দুঃশ্চিন্তা গেল না। উচ্চতর গবেষণা আমার কাছে আরও ভয়াবহ মনে হয়। আজ কাল ধাত্রীবিদ্যা শিখতে আসার বহর কিছুটা ক'মেছে, 'সোস্যাল স্টাডি-র মরশুম। আপনার কি ঐ রকম কোনও মতলবে আসা ?

—আপনার কি মনে হয় ?

—বলা মুস্কিল ! আপনাদের মত ফার্স্ট ক্লাসের মনের খবরে আমি নাগাল পাব না। এক ফরাসী মহিলার সঙ্গে আলাপ হ'লো, অল্প ক'দিনের জন্যে বেড়াতে এসেছেন এখানে। প্রসঙ্গক্রমে জানলাম, গ্রীক ডায়োনিসাস পূজো পার্বণের ওপর গবেষণা ক'রছেন। আপনার হয়তো হাইডেলবার্গ-এর প্রাচনতম মানুষের হাড়হাড্ডি থেকে নতুন

কিছু সংগ্রহ করবার তাগিদে আসা! টমসন, ম্যাথিয়ে আর লেফেভ্‌র শেষ ক'রে তেষ্টা মেটেনি, তাই নতুন পরিচ্ছেদ উন্মোচন ক'রতে হয়তো বা আড্ডা গেড়েছেন প্যারীতেই।

খুশীর এক পাতলা পর্দ্দা চোখে মুখে ভেঙে প'ড়লো। আগ্রহ ভরা টসটসে চাউনী। বললেনঃ লেফেভ্‌র আপনি পড়েছেন?

নীচু গলায় কিছুটা ঝুঁকে প'ড়ে বলিঃ কাউকে বলবেন না, বার্ক পর্যন্ত আমার পড়া নেই। আনাতোলা ফ্রাঁন্স, ডিকেন্স আর হ্যুগোর নভেল থেকেই ফরাসী বিপ্লব সম্পর্কে আমি হাত পা ছুঁড়ি।

—কিন্তু ঐ সব নভেল নাটকে ইতিহাস কোথায়? গল্পের খাতিরে ইতিহাসকে উপহাস ক'রতেও ওদের বাধেনি। বিস্ময়ে যেন ভেঙে প'ড়লেন অমলিনা রয়।

—আমি তো মাষ্টারী করবার কাজ নেবো না। ছাত্রদের রসাতলে দেবার ভয় নেই। ক্রুজেড যুগ আপনারা জানুন ভাল ক'রে, আমি 'আইভ্যান্ হো'তেই খুশী থাকবো। ম্যাথিয়ে বা লেফেভ্‌র আমার জানবার কথা নয়, ভবানীপুরের সস্তা চায়ের দোকানে যাতায়াত থাকলে নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও যেমন রেশ কোর্স-এর ঘোড়ার হদিশ জানতে হয়, আমার ছোট বোন মিনার তাড়নায় অনেকটা যেন সেই খাতিরে আমাকে এসব শুনতে হ'য়েছে। কার্লাইলই আমি ছাই পড়েছি।

চতুর হেসে অমলিনা রয় বলেনঃ আপনার বিনয় আছে জানি, অতি বিনয়ীদের কিন্তু আমার ভয় হয়।

—আপনার মুখে ফুল চন্দন পড়ুক বলবো না, রুজ-লিপ্‌স্টিকেও আপনার আসক্তি আছে ব'লে মনে হচ্ছে না, আপনি আমাকে অবাক করেছেন। একটি অবাধ্য চরিত্র হিসাবে আমার শুনাম বহুদিনের। আমার চরিত্রে বিনয় দেখলেন আপনি? তবে আপনার যে বিনয়ের যথেষ্ট অভাব আছে এ কথা আমি বলবই। প্রথম দিনের সাক্ষাৎ আমি জীবনে ভুলবো না।

জোরে বেশ টেনে টেনে বললাম কথাগুলো।

—অন্যায় আমি কিছু করিনি। অমলিনা রয় সঙ্কোচের সঙ্গে বলেন।

অসঙ্কোচেই আমার ঠোঁট থেকে কথা নেমে এলো। বললাম: ন্যায় অন্যায়ের প্রশ্ন নয়। আপনার ওভাবে বেমক্কা এসে পড়াটা যে কোনও পুরুষ সিংহের কাছেও মারাত্মক।

হেসে ফেললেন এবারে: আপনি ভয় পেয়েছেন?

বিস্ফারিত নেত্রে বলি: ভয় নয়, মৃত্যুকেও আমি অতটা সর্বনেশে মনে করিনে। আপনাকে ঘরে ঢুকতে দেখে আঁৎকে উঠেছিলাম সেদিন। বারনাম জঙ্গল ডান্সিনান পাহাড়ে এগিয়ে আসলে ম্যাক্‌বেথের বোধ হয় ঐ হাল হ'য়েছিল। তবু ধাক্কা সামলানো যাবে মনে ক'রেছিলাম কিন্তু ফটোগ্রাফটির নিখুঁত হদিশ আপনার জানা থাকা দেখে সঙ্গে সঙ্গে সেই মর্মান্তিক চিকিৎসকের কথা মনে প'ড়লো। ধরাশায়ী হলাম। ম্যাকডাফের ওস্তাদি সহ্য করা চলে, কারন নাটকটি শেষ করার দরকার ছিল। কিন্তু আমার ওপর আপনার একি মর্মান্তিক পীড়ন বলুন তো?

—কিন্তু আমার অন্য কোনও পথ ছিল না। ভয় আমারও কিছুমাত্র কম ছিল না সেদিন। নাটকের পেছনে একজন বউ বাজারের শেকস্‌পীয়ারের যে অদৃশ্য হাত আছে সেকথা আমি বিশ্বাস করিনি সেদিন। আত্মপক্ষ সমর্থনের সুর অমলিনা রয়ের কণ্ঠে।

—আসলে আপনি খুব দুর্বল চিত্তের মানুষ। সেটি আড়াল করবার খাতিরে নিজেকে জোর ক'রে কিছুটা উদ্ধত করবার চেষ্টা করেন। ভয় দেখিয়ে জিতে নেবার অপচেষ্টা নিতান্তই পুরনো, একেবারে সেকেলে কায়দা।

—আপনার অবস্থা দেখে আমি সেদিন কিন্তু খুবই হেসেছিলাম। এমন বেচারা বেচারা লাগছিলো!

কথা কেড়ে নিয়ে বলি: আপনি খুব হেসেছিলেন, কিন্তু সেই

মুহূর্তে পূর্ব বার্লিনে পালিয়ে আশ্রয় নেবার কথা আমার মনে হ'য়েছিল।

খিল খিল ক'রে হেসে ভেঙে পড়লেন আমার কথায়। বললেন: এতটা বাড়াবাড়ি আপনি না ক'রলেই পারতেন।

—অহেতুক আপনার বাড় দেখে ভয় পেলাম। তাই আমাকে কিছু বাড়তে হ'লো।

অমলিনা রয় বললেন: সে বাড়ের দরকার ছিল। বাড়াবাড়ির'ও প্রয়োজন ছিলো।

বাধা দিয়ে বললাম: হয়তো এক্ষেত্রে ছিল না। ফ্যাল ফ্যাল ক'রে তাকিয়ে থাকবার পক্ষে এমনিতেই আপনি যথেষ্ট ছিলেন। বিধাতা তবু থুতনীর পাশে কালো ঐ তিলটির এক কনট্রাষ্ট্ বসিয়ে অতিরিক্ত বাড়াবাড়ির চূড়ান্ত এক প্রদর্শনী খুলে বসলেন। এতটা ভালো আপনাকে না দেখালেও আপনাকে অনেক ভালো দেখাতো।

একটা ঝিলিক বয়ে গেল যেন সারা দেহে। মাথা নত ক'রে বললেন: আপনার মুখে যা আসে আপনি তাই বলেন। এটাই কি আপনার কম বাড়াবাড়ি?

—বাড়াবাড়ি কিছুর বর্ণনা ক'রতে ব'সলে কিছুটা বেহিসাবী হ'তে হবে বৈকি। তাতে দোষ নেই! হাটখোলায় গিয়ে পোস্টকার্ড লেখা চলে, কিন্তু আগ্রার মেঠো প্রবন্ধ বরদাস্ত করা যায় না।

—তাজমহল আপনার ভালো লেগেছে? বিস্ময়ের সুরে অমলিনা রয় বলেন।

—অপূর্ব! দিল্লীর বাদশাহ্'র ওপর আপনার হয়তো রাগ আছে, তাই তাজমহল সম্পর্কে আপনি বায়াসড্। ম্যাথিয়ে, লেফেভ্‌র ছেড়ে আনাতোলা ফ্রাঁসের বই আপনার পড়া দরকার। মনের চেয়ে মান আপনাকে পেয়ে ব'সেছে। জীবনকে আমি অনেক বেশী সত্যি ব'লে জানি।

মাথা হেলিয়ে অমলিনা রয় বলেন: আমার কিন্তু তাজমহলকে যথেষ্ট বাড়াবাড়ি ব'লে মনে হ'য়েছে।

বাধা দিয়ে বলি: আপনি যে যুক্তি দিয়ে তাজমহল দেখতে চান। বাড়াবাড়ি মানুষ বড় জোর বাঙ্গলা সিনেমার নায়িকা পর্যন্ত বরদাস্ত করে। তাজমহল যদি বাড়াবাড়ি হ'তো গাইকোয়াড়ের সুয়োরাণী থেকে আরম্ভ ক'রে ম্যাঙ্গো লেনের কেরাণী কোজাগরী পূর্ণিমাতে ব'লতে পারেন কি দেখতে যায় আগ্রাতে? গোলাম আলির খেয়াল ও ঠুংরীর শেষে রবিশঙ্করের রামকেলি'র আলাপ সুরু হ'লে, যোগীনবাবুর স্ত্রীর বেনারসীর তলার মানতাশার ঝিলিকের কথা মনে পড়ে না, বরং বিয়ে বাড়ীর সুন্দর ভূরি ভোজনের পর দোতালার সিঁড়ির বাঁকে ধুতি পাঞ্জাবী পরা সুন্দর এক চঞ্চল কিশোরের হাতের রূপোর থালায় রাখা সুগন্ধি পাত্তির সঙ্গে দু'খিলি মঘাই পানের কথা মনে পড়ে। মানতাশাটি আদিম অনুকরণ, উগাণ্ডা বা মোম্বাসার বন্য মেয়ের কানে বা গলায় মানাতো ভালো, যোগীনবাবুর স্ত্রীর হাতে হাস্যকর রকম বাড়াবাড়ি আর কিশোরের হাতের মঘাই পান সমগ্র অনুষ্ঠানের অতি সুন্দর পরিপূরক। ওটা অনুরণন।

অমলিনা রয় বলেন: আপনি খুব সুন্দর ক'রে কথা বলতে পারেন, এই ধারণাটি আপনার মাথায় ঢুকিয়েছে কে?

হেসে বলি: অতি অল্প সময়ে সে ধারণা কিন্তু আপনার মাথায় পাকা হ'য়ে গেছে

কপট রোষ প্রকাশ করেন অমলিনা রয়। বলেন: তর্ক রাখুন! বার্লিন দেখলেন, কেমন লাগছে জর্মনি।

—ভয়ে ব'লবো না নির্ভয়ে বললো?

—আপনি নতুন কিছু বলবেন নিশ্চয়ই। স্মিত হেসে অমলিনা রয় বলেন।

কিছুটা সহজ সুরে বলি: ইয়োরোপের অন্যত্র কি হাল আমি অবহিত নই। কিন্তু এদেশের খুব একটা আকর্ষণ আছে ব'লে মনে হয়

না। আসলে এরা বড়লোক, প্রাচুর্যের ঝিলিকের চোটে বাইরে থেকে এসে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। প্রাণ ধারণ করা আমাদের দেশের মানুষের প্রাণান্ত ব্যাপার। এখানে অভাব আছে হয়তো, কিন্তু প্রাণ ধারণের দুর্বিষহ জ্বালা নেই। গোটা পরিবেশটি সম্পূর্ণ অন্য ঢঙের, তাই আমাদের অনভ্যস্ত চোখ বিভ্রান্ত হয়। রঙ চঙ আর গ্লামারে দিশেহারা হ'তে হয়। এদেশের কারখানায়, য়্যুনিভার্সিটিতে অনেক কিছু জানবার আছে সত্যি, কিন্তু অন্য কিছু বিশেষ সংগ্রহ করবার আছে ব'লে আমার মনে হয় না। এই রকম আমার ধারণা। আপনার মন কি বলে ?

স্বচ্ছ হেসে অমলিনা রয় বলেন : আপনার সঙ্গে আমি একমত। এ শুধু জর্মনির নয়, সারা ইয়োরোপের এই অবস্থা। দারিদ্র্যের অভিশাপে আমরা অপ্রস্তুত হ'য়ে আছি। আপনি ঠিকই বলেছেন, প্রাচুর্যের মাঝখানে এসে আমাদের দীনতা আমাদের আরও সঙ্কুচিত করে। ইয়োরোপের কি দেখে কলকাতায় ফিরে গিয়ে অনেকে লাফালাফি করে আমি বুঝি না। ট্রাউজারর্স পরা সুবিধের জন্যে, ধুতিকে হেয় করবার খাতিরে নয়। সময় বাঁচাতে হবে, তাই রসুইখানায় প্রেশার কুকারের প্রয়োজন মেনে নিতে হবেই। আমার মনে হয় আর বেশী কিছু সংগ্রহ করবার প্রয়োজন নেই এদেশ থেকে।

হাততালি দিয়ে উঠি। বলি : আমি কিন্তু আপনাকে একদম উল্টো জেনেছিলাম। হাতে পায়ে দুরন্ত এক মেমসাহেব ঠাউরেছিলাম।

অচঞ্চল দৃষ্টি মেলে বললেন : অপরের সম্পর্কে তাড়াহুড়ো ক'রে কিছু ঠাওরালে ঠকতে হয়। আপনার প্রতি এখনও আমি কোনও ধারণাই পোষণ করি না।

বিস্ময়ের সুরে বলি : কেন, আপনার নোট বুকে প্রতারকদের তালিকায় আমার নাম এখনও তোলেন নি ?

অপর প্রান্ত থেকে কোনও জবাব এলো না। চোখ নামিয়ে নিলেন। বেশ কিছুক্ষণ গেল। কিছুটা সঙ্কোচ ও অপ্রস্তুতের ভাব চোখে মুখে

ফুটে ওঠে। ম্লান এক টুকরো হেসে বললেন: আপনার নামটাই এখনও আমার জানা হয় নি। আপনার নাম কি মিঃ সেন?

হেসে বলি: একটা কিছু ব'লে ডাকলেই হ'লো। ও একটা হ'লেই হ'লো।

চোখে হেসে অমলিনা রয় বলেন: তাই বলে আপনাকে কালিকা-প্রসাদ ব'লে ডাকলে নিশ্চয়ই ভালো লাগবে না।

মাথা নেড়ে হেসে বলি: আপনি ডাকতে পারলে আমার আপত্তি নেই। তবে টানা মুস্কিল হবে। খাগড়াই বাসনের ফেরিওয়ালা ছোট থালা বাজাতে বাজাতে আগে আগে যায়, পেছনে তার বাসনের পাহাড় মাথায় নিয়ে তাকে অনুসরণ করে মজুরে। আমাকে ডাকার খাতিরে শেষে ঐরকম একজন লোকের প্রয়োজন পড়বে। কল্কে নিয়ে চলা সোজা, কিন্তু গড়গড়া বহনের জ্বালা আপনাকে ভেবে দেখতে হবে।

নড়েচড়ে বসেন অমলিনা রয়। বলেন: ধূমপানের নেশা আমার নেই। হুঁকো-কল্কের প্রয়োজনই নেই আমার। আপনার নামটি জানতে পারি কি?

সোফায় সোজা হয়ে বসে বলি: অক্লেশে। তবে আমার নামের পেছনে সামান্য একটু ইতিহাস আছে। আমার বাবার নাম পুলকেশ চন্দ্র সেন! জ্যাঠা খুড়ো মিলিয়ে বাবারা সাত ভাই। তাঁদের নামের আদ্যাক্ষরে গরমিল থাকলেও নামের শেষ বর্ণ সাতজনেরই তালব্য শ'তে শেষ। কিন্তু এই নিয়ম জ্যাঠা-খুড়োদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকলো না, তাঁদের পুত্রদের নামকরণের বেলাতেও ঠিক একই নিয়ম বহাল রইলো। তালব্য শ'কে শ্রীখণ্ডি ক'রে ধ্বনিগত মিল রেখে, তাদের মর্মান্তিক নামকরণ অব্যাহত র'য়ে গেল। কিন্তু এদেশে যে পরিমান নতুন শিশুদের তালব্য শ মার্কা নামের প্রয়োজন, বেচারী বাঙ্গলাভাষা তার যোগান দেবে কেমন ক'রে? আমার পালা যখন এলো তখন বড় দুর্দিন। ভাঁড়ারে তালব্য শ বড় বাড়ন্ত। আমার নাম বাছতে হিমসিম খেয়ে গেলেন জ্যাঠামশাই।

আমার জ্যাঠামশাই দ্বারকেশ চন্দ্র সেন ছিলেন ফরিদপুরের ঝাঁজালো উকীল। নিতান্তই কড়া ধাতের মানুষ। মনটাও তার মান্ধাতার। আমরা যাকে কাক বলে জানি, তিনি তাকে বলতেন 'বায়স'!

আমার নাম নিয়ে নাকি অনেক কিছুই হ'য়েছিলো। আমার মা বিদ্রোহী, তালব্য শ বর্জিত নাম তাঁর পছন্দ। বাবা ভয় পেলেন। কারণ জ্যাঠামশাইকে উপেক্ষা করা তিনি স্বপ্নেও ভাবতে পারতেন না। তবু শুনেছি, মায়ের তাড়নায় নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও একদিন কথা প্রসঙ্গে আমার নাম 'অজয়' হ'লে কেমন হয় জিজ্ঞাসা ক'রলেন। এ কথায় স্থির দৃষ্টিতে জ্যাঠামশাই কিছুক্ষণ বাবার চোখে মুখে কিসের যেন অনুসন্ধান ক'রলেন। তারপর বললেনঃ ছাই হয়।

দু'দিন পর আমার দোলনার দিকে তর্জনী তুলে আমার মাকে শুনিয়ে শুনিয়ে জ্যাঠামশাই এসে জ্যাঠাইমাকে বললেনঃ ওর নাম কুমারেশ! পুলকেশকে একথা আমি চিঠিতে জানিয়ে দিলাম। দ্বারদেশে নিজেকে আড়াল ক'রে মা মরমে মরেছেন, কিন্তু তিলমাত্র প্রতিবাদ করবার সাহস হয়নি। আর দোলনায় আমার তখন আস্ফালনই সার।

কুমারেশ নামই বহাল হ'লো। এই নাম নিয়েই স্কুলে এসে ভর্তি হ'লাম কলকাতাতে। ছেলেরা এমনিতেই 'বাঙ্গাল', 'বাঙ্গাল' ক'রে অস্থির করে তুলতো। ইংরেজীর মাষ্টার একদিন 'আই হ্যাড'-এর অর্থ জানতে চাইলেন। আমি হেঁকে জবাব দিয়েছিলাম—'আমার আছিলোতো'। শুধু ছাত্রেরা নয়, মাষ্টারও হেসে খুন। তারপর স্কুলের সিঁড়িতে, পথে-ঘাটে, ক্লাসের পেছনের বেঞ্চ থেকে অহরহ আমাকে ডাকতো সবাই—'আছিলোতো'।

সৌভাগ্যক্রমে সামনে লম্বা ছুটি পাওয়া গেল। কিন্তু দুর্দিনের দিনগুলো যেন শিং বেঁকিয়ে দ্রুততালে আসে। ছুটির পর নিতান্ত অনিচ্ছা ও দুঃসহ বেদনা দিয়ে স্কুলে গেলাম। সবই ঠিক ছিল, শুধু মর্মান্তিক 'আছিলো' নিয়ে আমাকে পীড়ন করবার জন্যে কেউ আর আগের মত সাড়া পেলো না দেখলাম।

এমন সময় ভূগোলের নতুন মাষ্টার এলেন। পরে শুনলাম উনি নতুন নন। দীর্ঘ রোগভোগের পর কাজে যোগ দিলেন। শীর্ণ দেহ, খয়েরী দাঁত, বর্তুলাকার নিরেট মাথাটির মধ্যে ভূগোলে কতটা কাণ্ডজ্ঞান ছিল জানি না কিন্তু অগোছালো ফোঁড়ায় ও মায়ের বিক্ষিপ্ত কাঁচি চালনায় আমার চাঁদির ঊষরতা দেখে ওনার কাব্যপ্রতিভা যেন তাড়া করে এলো। নাম ডাকতে ব'সে আমার নামের ডগায় এসে থামলেন। আপাদ-মস্তক একবার দেখে নিয়ে বললেন ঃ তোমার নাম কুমারেশ ? মানিয়েছে বেশ ! মাঝখানে টাক কেন ? শুধু চারিপাশে কেশ !!

কাব্যের প্রয়োজন সম্পর্কে আমার কিছু বলবার নেই, কিন্তু ভূগোল মাষ্টারের প্রানান্ত কবিতায় আমার হৃদয়ে যে মর্মান্তিক হাহাকার টেনে আনলো তা অবর্ণনীয়। ছুটির পর লক্ষ্য করলাম গোটা স্কুলের ছাত্রেরা কবিতাটি সম্পূর্ণ রপ্ত ক'রেছে। বিস্মৃতির গহ্বর থেকে 'আছিলো'ও টেনে তোলা হ'য়েছে। তছনছ হ'তে হ'তে বাড়ি ফিরে আসি।

স্কুলে যাওয়া বন্ধ ক'রলাম। ভরসাস্থল মা। স্কুল পাল্টানোতে বাবার খুব অমত দেখলাম না। কিন্তু মা জিদ ধরলেন তার আগে আমার নাম পাল্টানো দরকার। দিন পনেরো পর নতুন স্কুলে ভর্তি হ'লাম। নামটাও পাল্টে এলাম সেই সঙ্গে। আমার নাম কুণাল সেন। আপনি আমাকে কুণাল বলে ডাকতে পারেন।

অমলিনা রয় বলেন ঃ আপনার মর্মান্তিক জ্যাঠামশাইয়ের হাত থেকে রক্ষা পেলেন কি কোরে ?

—তাঁর হাত থেকে রক্ষা আগেই পেয়েছিলাম। নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁর দেহ রাখতে হ'য়েছিলো। কিন্তু আপনার তরফেও কি কাঁটাওয়ালা জ্যাঠামশাই ছিলেন নাকি ?

কৌতুকের হাসি খেলে গেল অমলিনা রয়ের চোখে মুখে। বলেন ঃ না, আমার তরফে কারো জ্যাঠামো করবার সুযোগ ছিল না। আমার বাবা ছিলেন একমাত্র, একেবারে অদ্বিতীয় পুত্র।

—তবে আপনার নামের ও হাল হ'লো কেন ? ক্যানিং'য়ের ভাঙা হাটে মাছ বাছাবাছির শেষ বেলাতে এ যেন অনেকটা ভাগা দেওয়া সস্তা সওদা। মন্দোদরী নাম শুনে আপনি চোখ পাকিয়ে এলেন, কিন্তু অমলিনা নামটি নিয়েই বা এত লাফালাফি করবার কি আছে। ডাকার পক্ষে ওজনে ভারী না হ'লেও আয়তনে কালিকাপ্রসাদের কাছাকাছি। লোহা আর সোলার ফারাকের মত। আর্কিমিডিস-এর স্পেসিফিক্ গ্র্যাভিটির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার যেন হিসেব মিলছে। তবে আপনি যদি ভরসা দেন তবে আগার দিকটা সামান্য বদলে নিয়ে 'না' টুকু আমি অ্যামপিউটেট্ ক'রতে চাইবো !

কৃত্রিম ক্রোধে ফেটে পড়েন অমলিনা রয়। বলেন : এ আপনার অনধিকার চর্চা। রবাহূত'র অধিকার বড় জোর মাটির খুরি-গেলাসে, আপনার দেখছি অন্দর মহলের পালং পর্যন্ত হাত পেঁৗছোয় !

আমি বাধা দিয়ে বলি : অধিকার অর্জন ক'রতে হয়। অভিধানে অধিকারীভেদ কথাটা আছে কেন ?

ম্লান হেসে বলেন : সামান্য সময়ে আপনার এত কি অধিকার বর্তালো ?

—আপনি জোর ক'রে এ রকম খাড়াই প্রশ্ন করবেন না ! অধিকার অর্জন করবার দিক থেকে কয়েক মুহূর্তই যথেষ্ট। বহু কথা, ও বহু আলাপ ক্লান্তিকর। সারারাত্রি ধ'রে যাত্রাগান শোনার মত। প্যাসেঞ্জার ট্রেনে নাগপুর যাওয়ার মত। জীবনে মাত্র দু'একবার বিয়াত্রিচের সঙ্গে দান্তের দেখা হ'য়েছে। কিন্তু বলতে পারেন কি অধিকারে, কি প্রেরনায় তিনি 'নবজীবন' লিখবার ক্ষমতা অর্জন করলেন ? আমি জানি না আজ রাত্রে আমি আর একটি 'ভিটা নুওভা' সৃষ্টি করবার তাগিদে কলম খুলে বসবো কিনা । আপনি দেখছি বই শুধু পড়েছেনই, বোঝেননি কিছুই।

অমলিনা রয় মাথা নত ক'রে রইলেন কিছুক্ষণ। পশমের চটির ওপর জরির কাজ মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগলেন। কয়েক মুহূর্ত

পর মুখটি তুললেন ধীরে ধীরে। আলতো ক'রে বললেনঃ বার্লিনে আপনি আছেন ক'দিন ?

মাথা নেড়ে বলিঃ এখানে থাকবার আর আদৌ ইচ্ছে নেই। তবে আপনি ভরসা দিলে আমার হোটেলের কামরা আরও কিছুদিন দখলে রাখতে পারি।

কেমন যেন চমকে উঠলেন অমলিনা রয়। নিস্তরঙ্গ জলরাশিতে আচমকা এক বিক্ষেপ যেমন বৃত্তাকার শান্ত ঢেউ সারা জলাশয়ের শীতল গা বেয়ে পাড়ের সবুজ ভেজা ঘাসের মধ্যে হারিয়ে যায়, অমলিনা রয়ের মুখশ্রী ঘিরে চমকের রেশটুকু তেমনই যেন র'য়ে র'য়ে খসে প'ড়তে বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগলো।

কয়েক মুহূর্ত পর অমলিনা রয় বলেনঃ কাল দুপুরে আমি মিউনিক যাবো। বার্লিন আমি কালই ছেড়ে চলে যাবো।

—প্রোগ্রাম কিছু অদলবদল করা চলে না।

—হয়তো যায়। কিন্তু তাতে কি লাভ ?

অমলিনা রয়ের মাথা নত। জানালা দিয়ে এক ফালি মিঠে রোদ এসে প'ড়েছে পায়ের কাছে। দৃষ্টি সেখানে রাখা। চোখের পাতায় ক্লান্তির স্তূপ। ওষ্ঠাগ্রে ম্লান ক্ষীণ হাসির রেখা। হিমেল মৃদু বাতাস শিশুর মত অস্থির হ'য়ে ভেঙে পড়েছে গেরুয়া রঙের শাড়ীর আঁচলে আর কপালের চূর্ণ কুন্তলে।

সিগারেট ছাইদানে ডুবিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম।

কথা জড়ানো। কিছুটা কাঁপা কণ্ঠ অমলিনা রয়ের ঃ চ'লে যাচ্ছেন ?

অচঞ্চল দৃষ্টি মেলে শুধু কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকি। পর্দ্দা সরিয়ে কামরা ছেড়ে বেরিয়ে আসি তারপর।

অমলিনা রয় সঙ্গে আসেন। অনেকগুলি বাঁক, অনেক সিঁড়ি। সময়ও লাগে অনেকটা। আমি চুপচাপ। অমলিনা রয় নীরব। সৌজন্যসূচক কোনও কথা নয়। কোনও ভঙ্গি নয়। হাঁটু ভাঙ্গা বা মাথা নত করা নয়। শেষ হ'লো না একটি নমস্কারে।

কপালের জ্বলজ্বলে খয়েরী টিপটির নীচে ম্লান দৃষ্টিটুকু নবোদিত সূর্যের গায়ে দূর থেকে ভেসে আসা এক খণ্ড জলভরা মেঘের মত মনে হ'লো। চকিত ভ্রূলতায় এক বলাকা যেন উধাও হয়ে গেছে কোনও সুদূরে। চরণে শ্রান্তির জড়িমা। ক্লান্তি নেমেছে চলনে।

ধীর পদক্ষেপে আমার পথে নেমে আসা। একটি ট্যাক্সি নেওয়া। ঘাড় ফেরানো জিজ্ঞাসু দৃষ্টির ওপর আমার ধীর জবাব ঃ- কুডাম!

অতি সুন্দর কুডাম অসহ্য মনে হলো। কাফে-টেরাসে মন শাসনে এলো না। মানুষের ভিড় আর ব্যস্ততায় কেমন যেন হাঁপিয়ে পড়ি। ঘুরতে ঘুরতে হোটেলেই ফিরে এলাম।

টিকতে পারলাম না বিছানাতেও। বই খুলে বসি। পড়িও। কিন্তু এক বর্ণও মাথাতে নিলো না। কাগজ কলম নিয়ে লিখতে বসলাম মাকে। বহুক্ষণ পরে খেয়াল হ'লো আমি তো ছবি আঁকতে জানি না।

রাত গেল। পরদিন সকালে রুডল্‌ফ্‌ তাড়াহুড়ো ক'রে কোথায় যেন বেরিয়ে গেল। আর এক দুর্নিবার আকর্ষণে অমলিনা রয়ের হোটেলে কে যেন টেনে নিয়ে চললো।

অনেকটা পথ এসেছিলাম। হেঁটে হেঁটেই। প্রবল ঠাণ্ডা। বাতাসের গায়ে কাঁটা বেরিয়েছে যেন। কি ভেবে এক কফির দোকানে ঢুকে পড়ি। কফি পান করি অনেক সময় নিয়ে। কফি শেষ ক'রে বসে রইলামও অনেকক্ষণ। এক কথা থেকে আর এক কথায়, এক চিন্তা থেকে অন্য চিন্তা, কিছুমাত্র যোগসূত্র না রেখে ভিড় ক'রে আসছে। কাফে ছেড়ে পথে নামি। ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ এক সময় আবিষ্কার করলাম আমি নিজের হোটেলেই ফিরে এসেছি।

বিছানাতেই প'ড়ে রইলাম অনেকক্ষণ। পূর্বদিকের জানালা দিয়ে অনেকটা আকাশ নজরে আসে। আকাশের গায়ে হেলান দিয়ে অপরপ্রান্তের উঁচু উঁচু বাড়ীগুলোর কাচের সার্সিতে বৈকালিক পাতলা রোদ এসে প'ড়েছে। নীল আকাশের গায়ে সাদা মেঘের গা ভাসানো শ্লথ গতিকে পেছনে ফেলে এক ঝাঁক বন্য পাখি উড়ে চ'লেছে। হয়তো শীতে নাড়া খেয়ে বরফের দেশ ছেড়ে চ'লেছে ভিন দেশে। কোন্‌ দেশে এদের ঘর? তুষারের কোন্‌ গিরি গহ্বরে এদের বাসা কে

জানে। ডন নদী পেছনে ফেলে, রাইন আর দানাউ পেরিয়ে এদের যাত্রা কোথায় গিয়ে শেষ হবে ?

পাক খেয়ে একটি বিমান আকাশের গায়ে ভেসে উঠলো। অস্পষ্ট আওয়াজ শোনা যায়। ধীরে ধীরে অনেক ওপরে, বহু দূরে একটি বিন্দুতে মিলিয়ে গেল তারপর।

দরজাতে আওয়াজ পেয়ে ঘুরে তাকাই। একতলার লম্বা নাকওয়ালা হোটেলের কর্মচারীটি জানান দিয়ে ঘরে আসে। টেলিফোনটি বার কয়েক নাড়াচাড়া ক'রে বলেঃ ফোনটি আপনার কাজ ক'রছে না দেখছি। তাই আপনার কোনও সাড়া পেলাম না। এক ভদ্রমহিলা দেখা ক'রতে এসেছেন। বারান্দায় তিনি অপেক্ষা করছেন। ফোনটি আমি ঠিক ক'রে দেবার ব্যবস্থা করছি এখনই।

পর্দ্দা সরিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসি। পূব দিকের কাচের সার্সির মধ্যে দিয়ে অমলিনা রয় বাইরের উঁচুনীচু বাড়ীগুলোর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন। বাইরের আলো এসে প'ড়েছে কপালে আর চুলে। সাদা শাড়ীর জরির রশ্মি ঝলমল ক'রে উঠছে।

চোখাচোখি হতেই মিষ্টি এক টুকরো হাসলেন। এগিয়ে এসে ভারি ওভারকোটটি আমার হাতে তুলে দিয়ে বললেনঃ আপনি দেখছি হোটেলেই আছেন।

—আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম।

—আমার জন্যে অপেক্ষা করছিলেন! তার মানে ?

—জানতাম আপনি আসবেন।

ঘরে ঢুকে এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে দৃষ্টি বুলিয়ে নিলেন। সোফায় এসে বসলেন। হেঙ্গারে ওভারকোটটি ঝুলিয়ে রেখে সামনের আসনটি দখল করি।

কিছুটা জবাবদিহির সুরে অমলিনা রয় বলেনঃ একটা কাজে এদিকে এসেছিলাম। সামান্য কিছু প্রয়োজন ছিল এদিকে। তাছাড়া

আমার ওখানে কাল আপনি সিগারেট কেসটা ভুলে রেখে এসেছেন, ওটি তাই পৌঁছোতে এলাম।

কৃত্রিম বিস্ময়ের সুরে ধীরে বলি: কেসটি তো কাল আপনার ওখানে আমি ইচ্ছে ক'রেই ফেলে এসেছি।

—কেসটি ইচ্ছে করেই ফেলে এসেছি! চতুর হাসি অমলিনা রয়ের চোখে ছড়িয়ে পড়ে।

হেসে বললাম: এমনিতেই আপনার আজ আমার এখানে আসা উচিত ছিল। আপনি আসতেনও। তবে আপনি কিছুটা জেদি ধরনের মানুষ, তাই ভয় পেয়েছিলাম। সহজ এক অজুহাত তাই কাল রেখে এসেছিলাম।

কপট রোষ প্রকাশ ক'রে বলেন: আপনি এমন কি মহাপুরুষ যাঁর দর্শনলাভের জন্যে অজুহাত হাতড়াতে হবে?

—মহাপুরুষের দর্শন মেলে যত্রতত্র। কয়েক আনা কবুল ক'রলে সোয়া পাঁচ ঘণ্টা কালিঘাটের উঠোন জাপটে পড়ে থাকা চলে। স্থূল সিগারেট কেসের অজুহাত বরং সেখানে অবান্তর। অতি সাধারণ মানুষের সাক্ষাৎ, অতি সাধারণ মনই আজকাল পাওয়া দুষ্কর। প্রেস্টিজ, কমপ্লেক্স, এটিকেট আর কুলটুরের বেড়া ডিঙিয়ে মানুষের নাগাল পাওয়া প্রানান্ত ব্যাপার।

কথা কেড়ে নিয়ে অমলিনা রয় বলেন: আপনি অতিশয় দাম্ভিক প্রকৃতির মানুষ। নিজেকে তুচ্ছ ক'রে, কিছুটা আড়াল থেকে আপনি আপনার অহমিকার পরিচয়ই দিয়েছেন শুধু। এ এক ধরণের বিলাস।

—আপনি চটলে কিন্তু বড় এলোমেলো কথা বলেন। আপনাকে আজ এত সুন্দর দেখাচ্ছে যে আপনার সঙ্গে তর্ক ক'রে রাগিয়ে দিতে ইচ্ছে ক'রছে না।

যেন হাল ছেড়ে দিলেন অমলিনা রয়। বললেন: আপনার সঙ্গে আমি পারবো না। আপনার যা খুশী তাই বলেন আপনি।

প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে কিছুটা সহজ করবার খাতিরে বলি : আজ সন্ধ্যেতে মিউনিক যাচ্ছেন ? বার্লিন কি সত্যিই আজ ছেড়ে যাচ্ছেন ?

—নিশ্চয়ই ! দ্রুত জবাব এলো।

—নিশ্চয় করে বলা মুস্কিল !

—তার মানে ?

—মানে সব কিছুই এত অনিশ্চিত। তাছাড়া জরুরী কাজে আটকে পড়া কি খুব অসম্ভব।

—আপনি কি পরিমান বক বক ক'রতে পারেন। সারাদিন করলেন কি আজ ?

মাথা নেড়ে বলি : কিছু না ! হোটেলেই প্রায় আছি সারাদিন। সকালে আপনার হোটেলের দিকে গিয়েছিলাম শুধু।

বিস্ময় ভরা কণ্ঠে অমলিনা রয় বলেন : আমার হোটেলে গেলেন কখন ?

—গেলে হয়তো ঠেকাতে পারতেন না। কিন্তু মাঝ রাস্তা থেকে ফিরে এলাম যে।

—ফিরে এলেন কেন ! দর বাড়ালেন ?

—কেমন যেন মরাল্ সাপোর্ট পেলাম না।

হেসে কুটি কুটি হন অমলিনা রয়। বলেন : ওসব আপনার আছে ? শুনে আশ্বস্ত হ'লাম। গেলে কিন্তু ভালোই ক'রতেন। হোটেলেই ছিলাম সারা সকাল। হাতেও কোন কাজ ছিল না। আর প্রচলিত নিয়মকানুন আপনি আজ থেকে মেনে চলতে সুরু ক'রলেন কেন ? এসব কায়দা কানুন মেলে চলা আপনি তো বেহিসাবী বাজে খরচ ব'লে জানেন। হুড়মুড় ক'রে এসে পড়াই তো আপনার চরিত্রের এক ব্যসন জানি। আপনার নৌকোর দেখছি বেগ ক'মেছে। কোথা থেকে চোরাই বাতাস পালের ওপর অন্যায় ক'রে আবেগের লহরা তুলছে। আসলে আপনার ভেতরের মানুষের সন্ধান আমি পেয়েছি সেদিন থেকেই। প্রথম দিনই আপনাকে

আমি কিছুমাত্র ভুল চিনিনি। সাজানো বানানো কথার ফানুসে আপনি অপরকে বিভ্রান্ত ক'রে দেন। অপরকে দিশেহারা ক'রে নিজে হাততালি দেন দূরে ব'সে। বলুন, কিছু ভুল বলছি আমি ?

দুপাশে মাথা নাড়িয়ে হেসে বলি : আপনাকে আমি আমার চেয়েও নিরেট ব'লে মনে করেছিলাম। শুধু বিদ্যে নয়, বুদ্ধিও আপনার আছে বিস্তর। আপনি আমাকে চিনেছেন তো ঠিক !

—ওত্তুটোর অকুলান নেই আপনার আমি জানি, কবিতা টবিতাও লিখেন নাকি ? অমলিনা রয় উল্টো প্রশ্ন ক'রলেন।

—লিখি না। চেষ্টা ক'রেছিলাম এককালে। কলেজের ল্যাবরে-টারীতে প্রেমের কবিতার রসাল ছন্দ ভাবতে বসে তীব্র এক রাসায়নিক চোলাইয়ের বেরসিক বোতল উল্টে দিয়েছিলাম। বাঁ হাতটা পুড়ে গিয়েছিল অনেকটা।

—কবিতা লেখা ছাড়লেন শুধু বেরসিক বোতলের চোট খেয়েই ?

হেসে বললাম : ওসব আমার ধাতে ঠিক আসে না। জোর ক'রে ওসব হবারও নয়। তাই কাব্য জগতে অনুপ্রবেশ বন্ধ ক'রে, প্রচুর উলু আর শঙ্খধ্বনির মধ্যে কারখানার ঘরে গৃহপ্রবেশই অনেক বেশী সোজা হ'লো। পশ্চিম দিগন্তের রক্তিম সূর্যরশ্মির শোভার চেয়ে রঞ্জন রশ্মির মগজের সূক্ষ্ম একটি বেআড়া তারের হদিশ অনেক আগে ধাতস্থ করা গেল।

অমলিনা রয় বললেন : চর্চা যখন ছিল এককালে ছাড়াটা ঠিক হয়নি।

—মুস্কিলে ফেললেন দেখছি। এককালে তো অনেক কিছুরই চর্চা ছিল। নানান কিছু করেছি তো সেকালে। ভালো ক্রিকেট খেলতাম। ফার্স্ট বোলার হিসাবে সুনামই ছিল আমার। টেনিসে আপনার কেমন হাত জানিনা, কিন্তু শীতকালে ছাতের ওপর এক্কা দোক্কা খেলেন নি ? মিথ্যে রান্না করেন নি ? তাই ব'লে এই হোটেলে আজ আপনি বউ বউ খেলতে ব'সলে ব্যাপারটা কি রকম দাঁড়াবে বলুন তো।

ক্ষিপ্রতার সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে অপ্রস্তুতের সুরে বলেন : আপনি একেবারে যাচ্ছেতাই!

জানালায় গিয়ে দাঁড়ালেন অমলিনা রয়। বাইরের আলো কাঁধের কাছে এসে প'ড়েছে। স্বর্ণাভ ক'রে তুলেছে মাথার চুল।

দেখলাম টেবিলে কি যেন নিরীক্ষণ ক'রছেন। আমার ওপর চোখ তুলে বলেন : আপনার ঘড়িটা বন্ধ হ'য়ে গেছে।

হেসে বললাম : মালিকেরই দম ফুরোতে ব'সেছে, ঘড়ির আর দোষ কি? আপনার হোটেলের কামরায় হাজির হবার জন্যে আমার কোনও অজুহাতের দরকার হবে না। সিগারেট কেসটি স্বচ্ছন্দে ফেরৎ দিতে পারেন।

অপ্রস্তুতের হাসি হেসে অমলিনা রয় বলেন : ভুলেই গিয়েছিলাম একেবারে। এতক্ষণ খেয়ালই হয়নি আমার।

সিগারেট কেসটি হাতে তুলে নিলাম। একটি সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে সোফায় এসে বসলাম। পূর্বের আসনে ফিরে এলেন অমলিনা রয়।

হেসে হেসেই বললাম : মানুষের ভুল সময় বিশেষে তার মস্ত হাতিয়ার। অঙ্কের খাতায় সেটি মর্মান্তিক হ'লেও আমাদের মত ইতরজনে ঐ ভুলের দোহাই পেড়ে অনেক সময়ই ক'রে খায়।

অমলিনা রয় শূন্য দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকেন কিছুক্ষণ।

চুপচাপ বসে রইলাম। ধীরে নীচু পর্দ্দায় প্রশ্ন করি : মিউনিকে আপনি উঠবেন কোথায়?

কয়েক মুহূর্ত পর কাঁপা গলায় উত্তর এলো : সে হদিশ আপনার জেনে আর কি লাভ?

তুচ্ছ হেসে বলি : জানলে হয়তো আমার ভালো লাগতো।

এক লহমা আমার চোখে দৃষ্টি তুলে মাথা নত ক'রে নিলেন অমলিনা রয়। আনত মুখে ম্লান হাসির রেখা। বললেন : আপনি কাজের মানুষ। প্রয়োজনীয় ঠিক ঠিকানার ভিড়ে আমার অবান্তর

হদিশ আপনাকে হয়তো শুধু বিব্রতই ক'রবে। তুনিয়ার সব মানুষের ঠিকানা বহন করবার জায়গা কোথায় আপনার নোটবুকে?

—আপনি ভয় পেয়েছেন? আমার কেমন জানতে ইচ্ছে হ'লো, জোর অবশ্য করবো না আমি।

অমলিনা রয়ের সঙ্কোচের সুর কণ্ঠে। বললেন ঃ জোর করবার মানুষ আপনি নন। আপনার শুধু ইচ্ছে হয়, কৌতূহলই হয় শুধু। আগ্রহ নেই কিছুতেই। দায়িত্বহীনের সঙ্গে পরিচয় চলে, বন্ধুত্ব চলে না।

অবিমিশ্র এক বেদনা যেন নাড়া খেয়ে সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ে। অলস আঁখিতে সংশয়ের এক ঝালর নেমে আসে আলগোছে।

আমার সহজ কথার মধ্যেও এক বিভ্রান্ত সুর যেন নেমে আসে। বললাম ঃ দোষ আপনার নয়, আমারই। তামাশার খাতিরে দায়িত্বহীন কথায় আপনাকে বিব্রতই ক'রেছি হামেশাই। দৈবাৎ আপনার সঙ্গে দেখা হ'লো এখানে। তাতে অবশ্য কিছু ক্ষতি হয়নি। কিন্তু আপনার হোটেলের দোরগোড়া থেকে কাল আমাকে ফিরিয়ে দিলেই ভালো করতেন! বিশ্বাস করুন আমার তাতে খারাপ লাগতো না। কোনও অভিযোগই থাকতো না আমার হাতে। যে কথা বলতে আমার ভালো লেগেছে, বিন্দু মাত্র চিন্তা না ক'রে বলে ফেলেছি। আমার চরিত্রের অবাধ্য এই ভালোলাগাটি আমি শাসনে আনতে পারিনি। আপনাকে বিব্রত করেছি, একলা ঘরে ফিরে এসে অপ্রস্তুতই হয়েছি শেষে। আপনার সম্পর্কে আমার এত কৌতূহলের কোনো অর্থই হয় না। আপনার হদিশ জেনে আমার কি লাভ। আমার সঙ্গে আপনার যেটুকু পরিচয়, তার চেয়ে হোটেলের পাওনাদারদের সঙ্গে আপনাকে অনেক বেশী হেসে কথা ব'লতে হয়েছে।

অপরদিকে থেকে কোনো কথা ভেসে এলো না। সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন অমলিনা রয়। ছোট্ট প্রশ্ন এলো অল্পক্ষণ পর ঃ আপনি বার্লিন ছাড়ছেন কবে? নিউরেমবার্গে শীঘ্রই তো ফিরে যাচ্ছেন। আপনি কি ভাবছেন বলুন তো?

—কই কিছু না! কিছু ভাবিনি তো আমি!

—আপনার ঘড়ির দম ফুরিয়েছে কিন্তু আমাকে থামলে চলবে না। ট্যাক্সি অনেকক্ষণ দাঁড় করিয়ে রেখেছি। ঘরে বসে কি করবেন? এয়ার অফিস পর্যন্ত আসুন না আমার সঙ্গে।

—ভেবেছিলাম মিউনিকে আজ যাওয়া আপনি স্থগিত রাখবেন।

—সম্ভব নয়! টিকিটপত্তর সব তৈরী। তাছাড়া এমনিতেই আমার অনেক দেরী হয়ে গেল বার্লিনে।

আশ্চর্য, অমলিনা রয় হাসছেন।

হোটেল ছেড়ে পথে নেমে দেখি সন্ধ্যা নেমেছে চারদিকে। সুন্দর সাজানো দোকান, আলোতে আলোময়। মানুষের ভিড়ে পরিপূর্ণ কাফে-টেরাসে। উঁচু উঁচু বাড়ীর দেওয়ালে নীয়নের বিজ্ঞাপনগুলো থরথর ক'রে শীতে কাঁপছে। আলোকে ঘিরে এলোমেলো পোকার ঘূর্ণি।

অমলিনা রয়ের দুই চোখে গভীর ভাবগর্ভ টলটলে ছলছলে চাউনী। ইচ্ছে ক'রছিলো, আজকের এই হিমেল সুরেলা পথ যেন শেষ না হয়ে যায়।

অনেকটা পথ এসে খেয়াল হলো অনেক প্রশ্ন আরও অনেক কথার স্তূপ যে সঙ্গে এনেছিলাম, অফুরন্ত এক শূন্যতা রেখে তারা যেন কোথায় হারিয়ে গেল।

এয়ার অফিসের সামনে ব্রেক্ কষে দাঁড়িয়ে গেল ট্যাক্সি। সারা পথ অমলিনা রয় নীরব। আমি নির্বাক।

অপর প্রান্তে এয়ার অফিসের বিরাট গাড়ি যাত্রী আর মাল পত্তরে ভরে উঠছে। গাড়ি ছাড়বার সময় হয়ে আসছে।

ট্যাক্সির গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে এক 'ওপেল-কাপিটেন'। ষ্টিয়ারিং হুইলে মোমের মত আঙুল ঘষে কালো পোষাকের এক সুন্দরী ললনা পাশের এক যুবাকে অনর্গল কি যেন বোঝাতে চেষ্টা করছে। যুবা সুন্দরীকে থামিয়ে দিয়ে বার বার ঝুকে পড়ে বলছে: কুস্ কুস্!

কিন্তু কার চুমু কে খায়? চুম্বনের দিকে নজরই নেই সুন্দরীর। সোনালী একমাথা খাটো চুল দুলিয়ে নিজের অতি প্রয়োজনীয় বক্তব্য শেষ করতে ব্যস্ত।

গাড়ির মধ্যেকার নীরবতা ভেঙ্গে টাক্সি ড্রাইভার জানান দিল, টেম্পেল-হোফের বাস তৈরী। ট্যাক্সি থেকে নামা দরকার।

অমলিনা রয়ের দিকে চোখ পড়তেই মাথা আমার নত হয়ে এলো।

কিন্তু আশ্চর্য অমলিনা রয়। সেই পূর্বের এক টুকরো ঠোঁটে লেগে থাকা হাসি। আয়ত নয়নে কৌতূহলী এক চাউনী। ধীরে একটি হাত আমার দিকে বাড়িয়ে দিলেন।

মর্মান্তিক সৌজন্য বোধ।

হাতে সামান্য একটু চাপ দিয়ে কাঁপা গলায় বলেন: আউফ ভিডারজেহেন!

একি শুধু বলার খাতিরে বলা। শুধু কি খাতিরের খাতিরে খাতির? আবার কি কখনও দেখা হবে? সে দেখার প্রয়োজনই বা কতটা!

নরম হাতটি তখনও আমার মুঠিতে ধরা। আলো আঁধারীর মধ্যে অমলিনা রয়ের টসটসে সুন্দর মুখশ্রীতে এক টুকরো হাসি মধুর আবেশে ভরে ওঠে।

বাহুবন্ধন শিথিল হয়ে আসে। ড্রাইভার অধৈর্য্য হয়ে ওঠে। এয়ার ওয়েজের গাড়ি এবার ছেড়ে দেবার সময় হলো। পর মুহূর্তে এক রকম চেঁচিয়ে উঠলো ড্রাইভার: কুস্, কুস্! কুস্, কুস্!!

অমলিনা রয় যেন চমকে উঠলো ড্রাইভারের কথায়। বাষ্পার্দ্র কণ্ঠের এক টুকরো কথা নেমে এলো। আমার কানে পৌছোল না। আরও কাছে, আরও নিকটে আসে অমলিনা।

—অমলিনা!

—কুণাল!

—অমলিনা।

—বল কুণাল!

—অমলিনা আজ আমি তোমাকে যেতে দেব না। তুমি থাক। আমার অনেক কথা আছে। আজ আমি তোমাকে যেতে দেব না অমলিনা।

ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙ্গে পড়েছে ড্রাইভারের। আবার সেই কথাঃ কুস্ কুস্। টেম্পেল-হোফের গাড়ি ছেড়ে দিল যে!

আমার বুকের মধ্যে থেকে মুখটা সামান্য তুলে অমলিনা বলেঃ ড্রাইভারকে হোটেলে ফিরে যেতে বল কুণাল।

আঁধার রজনী নেমেছে অনেক আগেই। কিন্তু 'সন্ধ্যা আকাশে স্বর্ণ আলোক' কিছুমাত্র ঢাকা পড়েনি। বার্লিনের গায়ে আলোর মালা ঝুলছে। শুধু নীয়ন আলোতে কুয়াশার ছানি প'ড়ছে। সারা শহরের বুকে তুষারের মিহি সাদা ওড়না নেমে আসছে। উল্টো মুখো গাড়ির আলোতে অমলিনা মাঝে মাঝে ঝলমল ক'রে উঠছে। তার কপালের দুই প্রান্ত ঘেঁষে আঁটো ক'রে বাঁধা মাথার চুল হীমেল হাওয়ায় এলোমেলো হয়ে আমার মুখে চোখে জড়িয়ে গেছে।

অমলিনার ঠোঁটের সলজ্জ এক টুকরো খুশীর হাসি ছড়িয়ে পড়েছে। চকিত ভ্রূলতায় ·চরিষ্ণু এক ক্লান্ত বলাকা যেন পাহাড় পেরিয়ে সমুদ্রের শেষে অন্য কোনো দেশের সবুজ ঘাসের হাতছানি দেখে। দুরন্ত পাগলাঝোরার বর্ষণ আমার হৃদয়ে আত্মহারা। ঊষর বেলাভূমিকে যেন প্লাবিত ক'রে গেল অন্য কোনো খানের চঞ্চল জলরাশিতে।

ক্লান্ত বার্লিন। আমারও এসেছে শ্রান্তি। বার্লিনে ঘুম নামছে।